বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

চতুর্থ সেমেস্টার

পত্র : বি-কোর – ৪১১

নন্দনতত্ত্ব

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া–৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Prof. (Dr.) Tapati Chakrabarty,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক তাপস বসু — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

ড. রাজশেখর নন্দী — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান — প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৪

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self-Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from **Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of the PG-BoS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self-Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self-Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

পাঠক্রম

পত্র: বি-কোর–৪১১

শিরোনাম নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ: ১ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১. ভামহ

একক ২. দণ্ডী

একক ৩. বামন

একক ৪. কুন্তক

পর্যায় গ্রন্থ: ২ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ৫. বঙ্কিমচন্দ্র

একক ৬. রবীন্দ্রনাথ

একক ৭. অবনীন্দ্রনাথ

একক ৮. শ্রীঅরবিন্দ

পর্যায় গ্রন্থ: ৩ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. প্লেটো

একক ১০. অ্যারিস্টটল

একক ১১. শিলার

একক ১২. হোরেস

পর্যায় গ্রন্থ: ৪ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. টলস্টয়

একক ১৪. জাঁ-পল সার্ত্র

একক ১৫. কডওয়েল

একক ১৬. ক্রোচে

সূচিপত্র

পত্র : বি-কোর–৪১১

পত্র : বি-কোর ৪১১	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১.	ভামহ	ড. শ্রাবন্তী পান	১-১০
	২.	দণ্ডী	ড. শ্রাবন্তী পান	১১-১৪
	৩.	বামন	ড. শ্রাবন্তী পান	১৫-২০
	৪.	কুন্তক	ড. রাজশেখর নন্দী	২১-২৪
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫.	বঙ্কিমচন্দ্র	ড. রাজশেখর নন্দী	২৫-৩২
	৬.	রবীন্দ্রনাথ	অধ্যাপক তাপস বসু	৩৩-৪৪
	৭.	অবনীন্দ্রনাথ	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৪৫-৫৫
	৮.	শ্রীঅরবিন্দ	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৫৬-৬৮
পর্যায় গ্রন্থ : ৩	৯.	প্লেটো	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৬৯-৭৩
	১০.	অ্যারিস্টটল	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৭৪-৭৭
	১১.	শিলার	ড. শ্রাবন্তী পান	৭৮-৯৮
	১২.	হোরেস	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৯৯-১০৫
পর্যায় গ্রন্থ : ৪	১৩.	টলস্টয়	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১০৬-১১২
	১৪.	জাঁ-পল সার্ত্র	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১১৩-১১৯
	১৫.	কডওয়েল	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১২০-১২৯
	১৬.	ক্রোচে	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১৩০-১৪০

পত্র : বি-কোর – ৪১১

শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ১

ভামহ

বিন্যাসক্রম

৪১১.১.১.১ নন্দনতত্ত্ব কী?

৪১১.১.১.২ ধ্রুপদী কাব্যতত্ত্ব

৪১১.১.১.৩ ভারতীয় আলংকারিকগণ

৪১১.১.১.৪ ভামহ

৪১১.১.১.৪.১ 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'

৪১১.১.১.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪১১.১.১.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.১.১.১ নন্দনতত্ত্ব কী?

নন্দনতত্ত্ব এক সুগভীর চেতনা। অনন্য উপলব্ধি নন্দনতত্ত্বের অন্তরাত্মায় সুন্দরের রূপময় উপস্থিতি, ভাবের সুগভীর পরিপূর্ণতা। আবার প্রকাশের তীব্র আকুতি। নন্দনতত্ত্ব কোন কোন পণ্ডিতের মতে, অনির্বচনীয় হলেও তার স্বরূপ অনাস্বাদিত নয়। কেউ কেউ বলেন 'Aesthetics' কেউ বলেন সৌন্দর্য শাস্ত্র কেউ বলেন ভিক্ষা শাস্ত্র নন্দনতত্ত্ব। কিন্তু নামের সীমার বাইরে 'নন্দনতত্ত্ব' বৃহত্তর এক উপলব্ধি। পশুর মধ্যে অনুভূতির এই সূক্ষ্মতা নেই— "The live animal does not have to project emotions into the objects experienced...but those who are intellectually specialized, a moral and emotional connotation. The dictionary will inform any one who consults it that the early use of words like sweet and bitter not to denote qualities of scense as such but to discriminate was and hostile. How could it be otherwise? Direct experience come from nature and man interacting with each other. In this interaction human energy gathers, is released dammed up, frustrated and victorious. Rhythmic beats of want and fulfillment, pulses of doing and being withheld from doing'

এই চেতনা কাব্য শিল্পের জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। এর উৎপত্তি শিল্প সৃষ্টির প্রথম তৎপরতার সমসাময়িক। শিল্প, মানবমনের আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ এবং সেই শিল্পকে সৌন্দর্যের নানান দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় তার নাম নন্দনতত্ত্ব। আনন্দিত উপলব্ধি? আমাদের মনে প্রশ্ন আসে নন্দনতত্ত্বের যাত্রা কি কেবল

সুন্দরের পথে। সুন্দর কি ভালো সমার্থক! যা আমাদের পক্ষে হিতকর, তাই কি সুন্দর। দয়া করুণা শ্রদ্ধা এগুলি কেবল সুন্দর হলে সুন্দরের অব্যাপ্তি হয় নন্দনতত্ত্ব নীতিগ্রন্থে পরিণত হয়। কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়েও তো সুন্দর সম্ভব নয়। সৌন্দর্যের সাথে মঙ্গল ভাবনা সম্পৃক্ত না হলে মানবীয় গুণগুলি না থাকলে সুন্দর পরম পরমসুন্দর হয়ে ওঠে না। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, প্রকৃতি সুন্দর। কোন কোন পণ্ডিত মানব প্রকৃতির ভেতর মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক অপূর্ব রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন (Imagery)। আবার অনেকে জড়জগতের উর্ধ্বে এক পরম সত্তাকে অনুভব করেছেন। কেউ সৌন্দর্য বিচারে ভাববাদী, কেউবা বস্তুবাদী। কোন পণ্ডিত প্রকাশনা উপলক্ষে সৌন্দর্য বলেছেন। কখনো আবার ছন্দ অলংকার ধনী ব্যক্তি তাদের ব্যবহারে সৌন্দর্যময় হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখব, আনন্দ মৃত রস আস্বাদনে সকল বিরোধের অবসান।

আর তার বহু যুগ আগে উপনিষদের ঋষি বললেন ‘‘আনন্দরুপম অমৃতং যত বিভাত’’

কবি কি জানতেন না পৃথিবীর সর্বত্র কেবল আনন্দ নেই, আছে ক্ষুধার হাহাকার, মৃত্যু, লোভ, স্বার্থপরতা সবই আছে এখানে। তব চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে পৃথিবী সুন্দর। সেই সুন্দরের প্রকাশ এবং দুঃখ উপভোগ্য। আসলে বেদনা থেকে কি শিল্পের জন্ম নেয় না? নেয়। কিন্তু সে বেদনার প্রকাশ এক ধরনের আনন্দ থাকে। যন্ত্রণা থেকে এক ধরনের মুক্তি নন্দনতত্ত্বের তত্ত্ব শব্দটিতে প্রচলিত অর্থে তার আভাস থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একজন নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পকে কোন বাঁধাধরা নিয়মে যাচাই করতে পারেন না। শিল্পের প্রধান পরিচয় একটি সৃষ্টি এবং শিল্প মাত্রই এক অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত। নিয়ম শৃংখলার নিগড়ে আবদ্ধ করলে শিল্পের চরিত্র ক্ষুণ্ন হয়। নন্দনতত্ত্বের ও সূত্রসমূহ শিল্পসৃষ্টির পথনির্দেশক নয়। এসব সূত্রের সাহায্যে শিষল্পকে ও তার অন্তর্গত সৌন্দর্য চেতনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। তলিয়ে দেখা যায়। শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় যেহেতু দুরূহ ব্যাপার, সেজন্য নন্দনতত্ত্বের পরিধিও ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রাচীন গুহাচিত্র থেকে জয়নাল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবি, আদিম দেবতার পূজা উৎসবের নৃত্য অর্ঘ্য থেকে আধুনিক কোন নৃত্য দলের পরিবেশিত বেলে, অর্ফিউস এর মোহন বাঁশি থেকে পাঙ্ক -রক, সবই শিল্পের পর্যায়ভুক্ত। এখানেই শেষ নয়। জীবনবাদী ও সমাজাশ্রয়ী শিল্প সমালোচনা অনুযায়ী শ্রমিকের রক্তে ঘামে তৈরি। একটি রাস্তাও শিল্প, গুন টানা মাঝিরাও শিল্পী। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে এসব শিল্প হলে এখানে আনন্দের স্থান কোথায়? উত্তর: শিল্পের আনন্দ প্রয়োজন সিদ্ধ নয়, এবং এর কোনো নির্দিষ্টি রোগ নেই। গুনটানা মাঝির বিষণ্ন শরীরে বা ক্লান্ত শ্রমিকের পরিশ্রমী অবয়বে বাহ্যিক সৌন্দর্য নেই; চোখকে বা মনকে তা তৃপ্ত করে না। কিন্তু এদের উপস্থিতি এক ধরনের মহত্ত্বের দাবিদার, পরিপার্শ্বকে তারা সহজেই ক্ষুদ্র করে ফেলে, শ্রমের সম সমোন্নতিতে নিজেদের অস্তিত্বকে করে বিশাল। এই মহত্বের অনুভবি সৌন্দর্য। শিল্পের অন্বিষ্ট হল জীবন। তাই এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করে যে, জীবনধারণের গরুর তাগিদই শিল্প। যে তাগিদ জীবনকে পরিচালিত করে তাই সৃষ্টি করে শিল্প।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত না হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিল্প মানবিক সৃষ্টি বলে কোন না কোন ভাবে এতে জীবনের প্রসঙ্গ থাকবেই। এবং জীবন জটিল ও বহু বিচিত্র। এজন্য নন্দনতত্ত্বের বিষয়বস্তুর কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। নন্দনতত্ত্বের সীমানায় শিল্পকলার বিভিন্ন অনুষঙ্গ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সূত্র ও সমস্যা, নীতিশাস্ত্র, মূল্য বিচার এবং সামগ্রিকভাবে দর্শনের নানান উপাদান অন্তর্ভুক্ত। এবং যেহেতু শিল্পের একটি বড় অংশ সচেতন বা অবচেতন মনের সৃষ্টি, নন্দনতত্ত্বের প্রধান বিচার তর্ক ভিত্তিক নয়, অনুভব এবং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক।

যদিও আমাদের দেশে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্য শাস্ত্র বা এস্থেটিকস বলে পৃথক কোন শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দময়তার অভিসারী আমাদের সাহিত্যের এই যাত্রা বহু প্রাচীন। যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ সভ্যতায়

তমসাচ্ছন্ন রাত্রি কাটেনি। তখন ভারতের হৃদয় উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রভাতী ঊষার গান। এক অপূর্ব ধ্বনিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল হৃদয়পুর—'ধ্বনিল রে', সেই জ্ঞান রূপ পেল বিশ্বজনীন শান্তি সঙ্গীতে। (সং জ্ঞান সুক্ত ঋগ্বেদ সংহিতা ১০/১৯১)।

নন্দনতত্ত্ব বিষয়টি সামগ্রিকভাবে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত— পাশ্চাত্য, আধুনিক প্রাচ্য নন্দনতত্ত্ব এবং ধ্রুপদী সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব। যদিও আমাদের দেশে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যশাস্ত্র বা Aesthetics বলে পৃথক কোনো শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দময়তার অভিসারে আমাদের সাহিত্যের এই যাত্রা বহু প্রাচীন। যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ সভ্যতায় তমসাচ্ছন্ন রাত্রি কাটেনি। তখন ভারতের ঋষির হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রভাতী ঊষার গান। এক অপূর্ব ধ্বনিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল হৃদয়পুরে — 'ধ্বনিল রে', সেই জ্ঞান রূপ পেল বিশ্বজনীন শান্তি সঙ্গীতে।

৪১১.১.১.২ ধ্রুপদী কাব্যতত্ত্ব

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য সৌন্দর্যশাস্ত্র বলে পৃথক কোনো শাস্ত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আর 'নন্দনতত্ত্ব' তো আধুনিক যুগের শব্দ। সাহিত্যকলার পীঠস্থান এই দেশে সৌন্দর্যবোধ ভারতাত্মার অন্তঃস্থলে একাত্ম হয়েছিল। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র রমণীয়তা, সৌন্দর্যময়তার কথা বলে। ভারতীয় সাহিত্যে কবিকে সৃষ্টিকর্তার সাথে উপমিত করা হয়েছে। এই উপমায় কাব্যের দৈবী উৎপত্তির সাথে সাথে কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়—

"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
তথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে।"

কবির এই দৈব অনুপ্রেরণা আলংকারিক ভামহের রচনায় স্বীকৃতি লাভ করেছে এভাবে— 'কাব্যং জায়তে জাতু কস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ'। যাকে দণ্ডী বলেছেন— 'নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহু নির্মলম্'।

পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক বেনেদেত্তো ক্রোচে (Benedetto Croce) এর মতে প্রকাশতত্ত্ব। অনুভূতি তো হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়ে যায় কিন্তু তাকে প্রকাশ করার জন্য চাই 'নৈসর্গিক প্রতিভা'। তবেই অনাদিনিধনা বাক্ উদ্ভাসিত হবে কাব্যে। আর ঋকবেদ সংহিতায় উচ্চারিত হয়েছে—

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমনস্মিদেবাঅধি।"

বাণীরূপে ব্রহ্ম মহাশূন্যে নিষণ্ণ। তাকে কেবল রসজ্ঞ ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারেন।

আচার্য মম্মটভট্ট 'শক্তিনিপুণতা'র কথা বলেছেন, কাব্যপ্রকাশের প্রথম উল্লাসে তিনি বলেছেন—

"শক্তিনিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাত্।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে।"

কাব্য রচনায় যেমন শক্তি বা কবি প্রতিভা থাকতে হবে তেমনি শাস্ত্রাদি পাঠ, অভ্যাস প্রভৃতিও কাব্যরচনার হেতু। পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক হোরেস (Horace) বলেছেন—

"The question has been asked whether a fine poem is the product of art of nature. I myself cannot see the value of application without a strong natural aptitude, or on the other hand, of native genious unless it is cultivated — so true is it that each requires the help of the other, and that they enter into a friendly compact with each other"

রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় বলেছেন— ‘‘যা শব্দগ্রামমর্থসার্থমলংকারতন্ত্রমুক্তিমার্গমন্যদপি তথাবিধি হৃদয়ং প্রতিভাসয়তি সা প্রতিভা।’’ যার দ্বারা শব্দ, অর্থ, অলংকার প্রভৃতি হৃদয়ে প্রতিভাসিত হয়। তাকে ঋকবেদে ঋষি বলেছেন যে কাব্যের দেবী সবার কাছে প্রকাশিত নন। আলংকারিক রাজশেখর অবশ্য অনেক পর্যালোচনার পর বলেছেন প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি উভয়ের মিলনেই সার্থক কাব্যের জন্ম। লাবণ্যহীনভাবে যেমন দেহসৌষ্ঠব শোভা বর্ধন করে না তেমনি আবার দেহের সৌষ্ঠব ছাড়া লাবণ্য সৌন্দর্যহীন।

পণ্ডিত জগন্নাথ তাঁর ‘রসগঙ্গাধর’ গ্রন্থে কাব্য লক্ষণ নিরূপণ করেছেন— ‘রমণীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।’’ অর্থাৎ কাব্যের লক্ষণে যে রমণীয়তার প্রকাশ তা যেন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের প্রাণ। রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দ হলো কাব্য। রমণীয়তার অর্থ করেছেন— ‘‘লোকত্তরহলাদজনকজ্ঞানগোচরতা’’ যে জ্ঞানের দ্বারা লোকত্তর আনন্দ জাত হয়, তাই ‘রমণীয়তা’। এই রমণীয়তার সাথে অ্যারিস্টটলের 'Pure and elevated pleasure' এর প্রভেদ নেই। ‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।’ যে আনন্দের বিশ্বসাহিত্যের হৃদয়ে, সেই একই প্লাবনে আমাদের ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যেও নিষ্ণাত।

আলংকারিক কুন্তক তাঁর বক্রোক্তিজীবিতে বলেছেন—

‘‘অর্থঃ সহৃদয়াহলাদকারিস্বস্পন্দসুন্দরঃ।’’ কাব্যের অর্থ সহৃদয়ের হৃদয়ের আহ্লাদ জন্মায় এবং স্বভাবত সুন্দর হয়ে থাকে। আলংকারিক আনন্দবর্ধন ‘ধ্বন্যালোক’ এ বলেন—

‘‘সহৃদয়হৃদয়াহলাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্’’

শব্দের সাথে অর্থের এই সম্বন্ধিত সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন মহাকবি কালিদাস তাঁর ‘রঘুবংশম্’ কাব্যে—

‘‘বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতপরমেশ্বরৌ।।’’

ভামহ বলেন— ‘‘শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্’— এই সহিতই উত্তরকালে সাহিত্য শব্দে রূপায়িত হয়। শব্দ ও অর্থের সুহৃদ্ভাবেই সাহিত্যদেহ শোভন হয়ে ওঠে।

আলংকারিক রাজশেখর তাঁর ‘কাব্যমীমাংসা’ গ্রন্থে কাব্যপুরুষের রূপ বর্ণনা করেছেন—

‘‘শব্দ ও অর্থ তোমার শরীর। সংস্কৃত তোমার বাহুদ্বয়, অপভ্রংশ জঘনদেশ, পৈশাচী চরণযুগল এবং মিশ্রভাষা বক্ষঃস্থল হবে। তুমি নিরপেক্ষ, প্রসন্ন, মধুর, উদার ও ওজস্বী হবে। ভাবপ্রকাশক সার্থক বাক্য তোমার বাণী রূপ আত্মা, ছন্দঃসমূহ তোমার রোমরাজি, অনুপ্রাস উপমাদি তোমার অলঙ্কার।’’

তারপর সাহিত্যবিদ্যাবধূর নির্মাণেও আলংকারিক রাজশেখর যথেষ্ট চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন।

ভারতীয় কাব্যের এই শব্দার্থময় শরীর রূপায়িত হলেও তাঁর রূপময় আত্মা কে। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সৌন্দর্য আছে বলেই কাব্য সহৃদয়হৃদয়হারী। কারো মতে এই সৌন্দর্যের উপাদান হলো অলংকার, কারো মতে ধ্বনি, কেউ আবার রসকেই কাব্যের আত্মা বলে নির্বাচন করেছেন। এই নিয়েই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের নানা প্রস্থান (School) গড়ে উঠেছে। যেমন— ‘অলঙ্কৃতি অলঙ্কারঃ’। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অলংকার স্বয়ং সৌন্দর্য। অন্যদিকে ‘অলংক্রিয়তে শোভা সাধ্যতেহনেন’। এইরূপ করণবাচ্যে ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন অলংকার শব্দের অর্থ যা শোভা সম্পন্ন করে। প্রথম অর্থে স্বয়ং সৌন্দর্য। দ্বিতীয় অর্থে তা কাব্য শোভাসাধক। ‘কাব্যংগ্রাহ্যমলনঙ্কারাৎ। সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ।’ ভামহের উত্তরকালে আচার্য বামন অলঙ্কারকে কেবলমাত্র শোভাজনক

না বলে অতিশয় শোভা উৎপাদক বলে বর্ণনা করেছেন—

"কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ। তদতিশয়- হেতবস্ত্বলঙ্কারাঃ'। আবার ধ্বনিবাদীরা বলেছেন—

'কাব্যসাত্মা ধ্বনিরিতিবুধৈর্যঃ সমাম্নতপূর্ব্ব।' কেউ বা রীতিকে কাব্যের প্রাণ বলে বর্ণনা করেছেন— 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টপদরচনারীতিঃ'। আবার বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা কুন্তকের মতে, বৈদগ্ধপূর্ণ উক্তিই বক্রোক্তি। এই বক্রোক্তি কাব্যের প্রাণ— "বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গী ভণিতিরুচ্যতে।"

'ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সামগ্রিক পরিসর আলোচনা করে দেখব বিভিন্ন প্রস্থানের প্রবক্তাদের মধ্যে মতবাদগত প্রভেদ থাকলেও এদের যাত্রাপথের মূল গন্তব্য সৌন্দর্য। তেমনি সহিষ্ণুরূপে পারস্পরিক মতাদর্শগুলিকে উল্লেখও করেছেন। সেদিক থেকে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র একটি গৌরবময় অধ্যায়। ভারতীয় সাহিত্যের এই গৌরবময় অধ্যায়ের সাথে পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক ধারার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ড: সুধীরকুমার দাশগুপ্ত এ বিষয়ে 'কাব্যালোক' গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন— "ভারতীয় গ্রন্থেও যেমন গ্রন্থবিচার দেখা যায়, গ্রীক গ্রন্থেও সেই প্রকার আমরা যাহাকে ভাব ও রস বলিয়া বুঝি, তাহার অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। সেই আলোচনা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব আচার্য অভিনব গুপ্ত নাট্যরস বা কাব্যরস বুঝাইতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রায় সকল অংশই অ্যারিস্টটলের কাব্যসূত্রে অথবা বুচারকৃত তাহার ব্যাখ্যানে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান কেবলমাত্র ভাবের রস-নিষ্পত্তি ব্যাপারটির যথাস্বরূপ তাঁহার অংশতঃ মাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন দেখা যায়। সত্যদর্শী মনীষিগণ দেশ ও কাল নির্বিচারে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, ইহাই আর একবার এই ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইল।"

ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের রস অ্যারিস্টটলের একই পথের অভসারী। ভরত বললেন—

> "যথা বীজাদ্ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
> তথা মূলং রসাঃ সর্বেতেতোভাবা ব্যবস্থিতাঃ।"

তিনি আরও বলেছেন—

> "শৃঙ্গার হাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়নকাঃ।
> বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃস্মৃতাঃ।।"

অর্থাৎ ভরত নাটকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এই আটটি রসকে স্বীকার করেছেন। যদিও পরে শান্ত রসকে, নবরস বলে উল্লেখ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সে প্রসঙ্গান্তর।

আমাদের কাব্যে করুণ আদিরস। কারুণ্যের বশে রামায়ণের জন্ম। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন তো শোক থেকে শ্লোকের সৃষ্টি একথা বলেছেন। নিবিড় দুঃখেও কাব্যে আস্বাদ্যমান হয়ে আনন্দে পর্যবসিত হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্শনের উল্লেখ করেছেন—

> "করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্ সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।
> কিঞ্চ তেষু সদা দুঃখং ন কেপিস্যাৎ তদুন্মুখঃ তথা রামায়ণদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা।।"

করুণাদি রসে যে সুখ বা আনন্দ সঞ্জাত হয়, তা সহৃদয়ের অনুভবই তার প্রমাণ। তাতে দুঃখ থাকলে তা সবাই লাভ করার জন্য উন্মুখ হত না। রামায়ণাদি কাব্য দুঃখের হেতু আর শেলী (Shelley) বলেছেন— আমাদের ভাবনাগুলি আমাদের কাছে সবচেয়ে মধুর সঙ্গীত হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক অ্যারিস্টটলও (Aristotle) 'Catharsis' মাধ্যমে ভাবমোক্ষণের কথা বলেছেন তাই

'pity' ও 'fear' কাব্যে আনন্দে রূপায়িত হয়, ট্রাজেডিও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সেই আস্বাদ্যমান রসকে সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর'।

ভারতীয় সাহিত্য এই গভীরতার অনুসারী। 'কাব্যালোক' গ্রন্থে বলা হয়েছে— 'এই বিচিত্র বস্তুরাশিই কাব্যজগতে শব্দে সমর্পিত হইয়া যায়, অলৌকিক বিভাব এবং ক্রমে তাহারা চিত্তে জাগায় ভাব ও রস। 'আস্বাদাঙ্কুরকন্দ' এইভাব স্থায়ী হইয়া পরিণত হয় শুদ্ধ রসে; তাহা শ্রান্ত, অবিশ্রান্ত, প্রসন্ন প্রকাশময়, দেশকালহীন এক অখণ্ড আনন্দদ্যুতি।'

এই আনন্দের ধারাটি ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিটি পর্বেই নিষণ্ণ হয়ে আছে। অলঙ্কারবিচারেও সংস্কৃত আলংকারিকের এই ধারাটি লক্ষ্যণীয়। সংস্কৃত 'অলম্' শব্দের অর্থ ভূষণ। ভামহ বলেছেন— 'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাসুখম্' অর্থাৎ অলংকারবিহীন রমণীর মুখ শোভনীয় হয় না। আবার বামন কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে লিখেছেন— কাব্য অলঙ্কারযুক্ত হওয়ায় উপাদেয়, তাই সৌন্দর্যই অলঙ্কার। আবার বৃত্তিতে লিখেছেন 'অলঙ্কৃতিঃ অলঙ্কারঃ।' আবার অলঙ্কার অর্থে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারাদিকেও বোঝায়। অর্থাৎ একদিকে অলঙ্কার স্বয়ং সৌন্দর্য, অন্যদিকে তা সৌন্দর্যের কারণ।

কাব্য শোভাকর ধর্ম হল গুণ আর অলংকার হল সেই শোভার অতিশয় হেতু। অলঙ্কারই হোক রসই হোক, গুণাদির প্রসঙ্গই হোক ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকরা কাব্য শোভার কথাটি কখনও বিস্মৃত হননি। কাব্যের সূচনায় যে সৌন্দর্যের পথ কবির যাত্রা পরিশেষে সেই সৌন্দর্যই কাব্যের পরিপূর্ণতা।

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে কাব্যহেতু বা কাব্য রচনার কারণ আলোচনা করতে গেলেও সেই আনন্দের কথাই প্রকাশিত হয়। মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে কাব্য রচনার কারণ রূপে কারিকা নির্ণয় করেছেন—

> ''কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
> সদ্যঃ পরনির্বৃত্তয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।।''

অর্থাৎ কাব্য রচনার কারণ যেরূপ অর্থলাভ, যশলাভ তেমনি কাব্যরচনার কারণরূপে মঙ্গল প্রভৃতিও বর্তমান। তিনি সদ্যঃপরিনিবৃত্তয়ে পদে অর্থ করেছেন সকল প্রয়োজন মৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূত্যং বিগলিতবেদ্যান্ত্রমানন্দংম'। অর্থাৎ কাব্য রসাস্বাদনের ফলে যে দিব্য আনন্দ লাভ হয় সে সম্পর্কে মম্মটভট্টের কারিকাটিতে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এই অনির্বচনীয় আনন্দই ভারতীয় কাব্যের উদ্দেশ্য। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে শুভকাব্য সম্পর্কে লিখেছেন— যার মধ্যে দুর্বোধ্য অর্থ নেই, সহজবোধ্য বুদ্ধিদীপ্ত সর্বসাধারণের হৃদয়ে যা সুখ উৎপাদন করে। অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্রে কাব্যে কবির সাথে সাথে সহৃদয়ের আনন্দ উৎপাদন ও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে প্রতিভা দ্বিবিধ রূপে স্বীকৃত। কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী। কবি যখন রচনা করেন তখন তাঁর থাকে কারয়িত্রী প্রতিভা এবং দর্শক বা শ্রোতার মনোমুকুরে বিম্বিত হলে তা ভাবয়িত্রী প্রতিভা। এই দুই এর সম্মিলন না হলে কাব্য সুন্দর হয় না। ভামহ বলেন— 'প্রীতিং করোতি কীর্তিং চ সাধুকাব্যনিবন্ধনম্'। আলংকারিক বামনও কীর্তি ও প্রীতিকে কাব্য হেতুরূপে উল্লেখ করেছেন।

মম্মটভট্ট তাই কবির সৃষ্টিকে নিয়মের বাঁধনে আবদ্ধ করতে চাননি। কবির সৃষ্টি মুক্ত ও চির আনন্দময়—

> নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদেকময়ীমনন্যপরন্ত্রাম্।
> নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি।।

এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে এই সৌন্দর্যময়তার উপাখ্যান বহুপ্রাচীন। ঋকবেদে সংহিতার উষা সূক্তগুলি সৌন্দর্যময়তার প্রতিরূপে। সূক্তগুলি পাঠ করলে মনে হয় তা যেন সরল অনাড়ম্বর কবিতা, সুমধুর সঙ্গীতের সুর। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইন্টারনিটস্ (M. Winternitz) এই সূক্তগুলিকে গীতিকাব্য বলতে দ্বিধা করেননি। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অর্থালঙ্কার এবং অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের শোভায় এই সংহিতা সুশোভিত। উপনিষদ সাহিত্যে যে আনন্দময়তার চরম প্রকাশ ঘটেছে সেই আনন্দরসের উৎস ঋকবেদ সংহিতা। এখানে মানবজীবন এবং প্রকৃতির সম্মিলনে এক অপূর্ব নান্দনিক চেতনা নির্মিত হয়েছে। তাই ধ্রুপদী ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব এবং কাব্য অনেক বেশি সুবিন্যস্ত হলেও ঋগ্বেদ সংহিতা তথা বৈদিক সাহিত্যকে দূরে রেখে ভারতের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনা অন্বেষণ করা প্রায় অসম্ভব।

৪১১.১.১.৩ ভারতীয় আলংকারিকগণ

রামায়ণকার আদিকবি বাল্মীকির মনে অলংকার শাস্ত্রের প্রথম জিজ্ঞাসা— সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে সমাধান অন্বেষণ। অলংকার শাস্ত্রের জন্ম সেই থেকেই। মানুষের মনে নিয়ত যে ভাবসমূহের সঞ্চার দেখা যায়, তারই অনুভূতি স্বরূপের বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে শ্লোকের ছন্দে— সাহিত্যের ভাষায়। এই ভাবের স্বরূপ কী, অনুভূতির লক্ষণ কীরূপ, ভাষার স্বরূপ কী— তার অবলম্বন কী, কোথায় তার সার্থকতা— এই সকল প্রশ্নের উত্তরে অলংকার শাস্ত্রের আলোচনা। এঁদের আলোচনাই ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের মৌল কাঠামোটি প্রস্তুত করেছে। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের মূল প্রবক্তাগণ হলেন, যেমন— ভরত (নাট্যশাস্ত্র), আচার্য দণ্ডী (কাব্যাদর্শ), ভামহ (কাব্যালংকার), বামন (কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি), আনন্দবর্ধন (ধ্বন্যালোক), রাজশেখর (কাব্যমীমাংসা), ধনঞ্জয় (দশরূপক), রুদ্রট (কাব্যালংকার), কুন্তক (বক্রোক্তিজীবিত), ক্ষেমেন্দ্র (ঔচিত্যবিচারচর্চা), মম্মটভট্ট (কাব্যপ্রকাশ), রুদ্রভট্ট (শৃঙ্গারতিলক), বিশ্বনাথ কবিরাজ (সাহিত্যদর্পণ), শ্রীরূপ গোস্বামী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু), জীব গোস্বামী (প্রীতিসন্দর্ভ, ষটসন্দর্ভ), কৃষ্ণদাস কবিরাজ (চৈতন্যচরিতামৃত), জগন্নাথ (রসগঙ্গাধর)। একালের কয়েকজন তাত্ত্বিক হলেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্য), অতুলচন্দ্র গুপ্ত (কাব্যজিজ্ঞাসা), শ্যামাপদ চক্রবর্তী (অলংকার চন্দ্রিকা), প্রবোধচন্দ্র সেন (বাংলা ছন্দ) প্রভৃতি।

৪১১.১.১.৪ ভামহ

কাব্যালংকার রচয়িতা ভামহ সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন। 'কাব্যালংকার' গ্রন্থটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'বস্তুপঞ্চকম্' (কাব্যশরীর, অলঙ্কৃতি, দোষ, ন্যায়-নির্ণয়, শব্দশুদ্ধি)। ভামহ ৩২টি অর্থালংকার ও ৩টি শব্দালংকার এর কথা বলেছেন। ভামহ ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) এর ধারণার সঙ্গে 'মোক্ষ'র ধারণাটি যুক্ত করেছেন এবং মোক্ষ বিধায়ক 'শান্ত' রসও স্বীকৃত হয়েছে তাঁর কাব্যতত্ত্বে। ভরত বর্ণিত অষ্টরস র সঙ্গে এই শান্ত রস যোগ করার ফলে একটা বিতর্ক এই সময় শুরু হয়। ভামহের দুটি বিখ্যাত উক্তি:

ক) ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্

খ) শব্দার্থৌ সহিতম্ কাব্যম্।

মূলত অলংকার প্রস্থানের আচার্য হিসাবে ভামহ খ্যাতিমান হলেও, তাঁর মতাদর্শ উত্তরকালে রাজশেখর, ভোজরাজ এবং বক্রোক্তি প্রস্থানের প্রবক্তা কুন্তকের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছিল।

আচার্য ভরতের মতে রসই কাব্যের মূলীভূত তত্ত্ব। কিন্তু কালক্রমে ভরতের এই মতবাদ যেন আলংকারিক সমাজে বিস্মৃতপ্রায় হতে লাগল। ভরত এবং ভামহের মধ্যবর্তী আমাদের সেরকম কোনো আলংকারিক গ্রন্থ চোখে পড়ে না। তবে নিঃসন্দেহে এইসময় কোনো মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল কিন্তু প্রসার লাভ করেনি। সেখানে আমরা দেখব ভরতমুনি যেখানে তাঁর নাট্যশাস্ত্রে একটি শব্দালংকার (যমক) এবং তিনটি অর্থালংকার (উপমা, রূপক, দীপক) উল্লেখ করেছেন, সেখানে অলংকারবাদী ভামহ তিনটি শব্দালংকার ও বত্রিশটি অর্থালংকারের নির্দেশ করেছেন। এইভাবে অলংকারসমূহ কাব্য ক্রমে প্রাধান্য লাভ করল এবং অলংকারনিবেশই কবিগণের কাব্যক্রিয়ার চরম লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হল। ভামহ বিরচিত 'কাব্যালংকার' এই অলংকার প্রাধান্যের নিদর্শনস্থানীয় গ্রন্থ। ভামহ তাঁর গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদে বলেছেন—

'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্'— কাব্যালংকার

অর্থাৎ বনিতার মুখ মনোহর হলেও অলংকারহীন হয়ে কখনও শোভা পায় না। ভামহ অলংকারকে সুন্দরী রমণী দেহের সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ বলে মনে করেন; অলংকার ব্যতিরেকে কাব্যের দেহ আস্বাদযোগ্য রমণীয়তা লাভ করতে পারে না। ভামহের মতে প্রত্যেক অলংকারই 'বক্রোক্তি' (Crooked speech) থেকে উদ্ভূত। 'বক্রোক্তি' এবং 'অতিশয়োক্তি' (hyperbolic statement) ভামহের মতে তুল্যরূপ। সেই জন্যই যে সকল অলংকারে অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তির কোনো লেশ মাত্র নেই সেগুলি ভামহের মতে প্রকৃতপক্ষে অলংকার নয়। অতএব 'হেতু', 'সূক্ষ্ম' এবং 'লেশ' ভামহের মতে অলংকারই নয়— যেহেতু এরা 'বক্রোক্তিশূন্য'।

'স্বভাবোক্তি'ও ভামহের মতে অলংকারগোষ্ঠীর বহির্ভূত— যেহেতু এটি বক্রোক্তিগন্ধশূন্য— ''স্বভাবোক্তিরলংকার ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে' — কাব্যালংকার

ভামহ প্রমুখ রস, ভাব প্রভৃতিকে স্বীকার করেছেন, তবে সেগুলিকে অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতির মতো কাব্যের অলংকারমাত্র বলে মনে করেছেন, আলংকার্য্য নয়। তাঁর মতে অলংকার সর্বদাই গৌণ বা অপ্রধান, আলংকার্য্যই প্রধান। আলংকার্য্য যদি কোনো বস্তুতে না থাকে, তবে অলংকারের কোনো সার্থকতা নেই। এখন প্রশ্ন, 'আলংকার্য্য' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'রসপ্রস্থানে'র আচার্যগণের মতে রসই আলংকার্য্য, রসই কাব্যের আত্মা, কেন না রস থেকেই কাব্যের উৎপত্তি এবং রসেই কাব্যের পরিণতি। অলংকারবাদীগণ কাব্যের বীজস্থানীয় 'রসে' পৌঁছাতে না পেরে রসবীজের প্রকাশস্বরূপ কাব্যমহীরূহ হল কাব্যের দেহ বা শরীর। দেহ ব্যতিরেকে যেহেতু প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই কাব্যের দেহকেই তারা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪১১.১.১.৪.১ 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'

মানুষের দেহ বা শরীর প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই প্রত্যক্ষবাদীগণ আত্মা অপেক্ষা শরীরের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আলংকারিকগণ কাব্যের আত্মা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধ্বনি, রস প্রভৃতির কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা কাব্যের দেহ বা শরীরকে উপেক্ষা করতে পারেননি। 'ধ্বন্যালোক' এর একটি কারিকায় সুন্দরভাবে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। 'লোকে আলো চায়, তাকে জ্বালাতে হয় দীপশিখা। কবির লক্ষ্য রস, কিন্তু তাকে জ্বালাতে হয় দীপশিখা। কবির লক্ষ্য রস, কিন্তু তাকে সৃষ্টি করতে হয় কাব্যের শব্দার্থময়

কথাবস্তু'। আলংকারিকরা তাই বলেছেন 'তস্য শব্দার্থৌ শরীর' অর্থাৎ শব্দার্থটি তাহার শরীর। আলোচনাসূত্রে আলংকারিকগণ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন এবং কাব্যের কাব্যত্ব বিচারে ও কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণে অগ্রসর হয়েছেন। রাজশেখরের একটি সূত্র অবলম্বনে এই বিষয়ের আলোচনার উৎপত্তি— 'শব্দার্থয়োর্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্য বিদ্যা' — অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের যথাযথ সহভাবে যে বিদ্যা তাহাই সাহিত্যবিদ্যা। 'সহভাব' কথাটির অর্থই সাহিত্য অর্থাৎ সহিতত্ত্ব। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকেই সাহিত্য বলে অভিহিত করতে চান কোনো কোনো বিজ্ঞ আলংকারিক।

আলংকারিক আচার্য ভামহ তাঁর 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ সহিতত্ত্ব বা মিলনসাধনে কাব্য হয়। শব্দ বলতে ধ্বনি বা Sound বোঝায় প্রতিটি শব্দে এক একটি ধ্বনি প্রকাশিত হয়। আবার এই ধ্বনি একটি অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থ ব্যতীত ধ্বনির তাৎপর্য হয় না। আলংকারিকগণ 'শব্দ' বলতে কী বুঝিয়েছেন তা আলোচনা করা যায়। আলংকারিক কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে বলেছেন—

'শব্দ বিক্ষিপ্তার্থৈকবাচকোহ্ন্যেষু সৎস্বপি।
অর্থঃ সহৃদয়াহ্লাদকারি স্বস্পন্দ সুন্দরঃ।'

অর্থাৎ অন্য কয়েকটি বাচক থাকলেও যা বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থেক বাচক হয়, তাকেই 'শব্দ' বলা যায়। আবার সহৃদয় হৃদয়বান ব্যক্তির মনে আনন্দ সৃষ্টি করে স্বভাবে যা সুন্দর হয়, তাকেই 'অর্থ' বলা যায়। কবির অভিপ্রেত অর্থকে বিশেষভাবে প্রকাশ করার জন্য শব্দের প্রয়োজন হয় এবং ভাবের দ্বারা অভিপ্রায়কে প্রকাশ করার জন্যই অর্থের প্রয়োজন হয়। শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধের কথা আলংকারিকগণ সকল সময়েই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই নিত্য সম্বন্ধ পাবর্তী-পরমেশ্বরের নিত্যসম্বন্ধ।

পার্বতীর এক নাম 'বাণী'; আবার পরমেশ্বর শিবের আর এক নাম 'অর্থ'। পার্বতী-পরমেশ্বর যেন সাক্ষাৎ বাগর্থ। পার্বতী শব্দ রূপে ব্যক্ত; মহেশ্বর অর্থ রূপে অব্যক্ত। বাক্যে শব্দ ও অর্থ থাকেই; কাব্য হতে গেলে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের বিশিষ্ট রূপ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে। ''যখন একটি বাক্য অপর বাক্যের সঙ্গে বিচিত্র বিন্যাসে বিন্যস্ত হয় তখন বর্ণের সহিত বর্ণ মিলিয়া সে যেমন একদিকে ছন্দ ও ধ্বনির সাহায্যে স্বর ও ধ্বনি লহরীর রমণীয় মাধুর্য সৃষ্টি করিবে, অপরদিকে তেমনি তদ্গর্ভিত অর্থ ও তাহার সহিত তুল্যযোগিতা করিয়া পরস্পরের অর্থের দিক দিয়া নতুন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবে। এমনি করিয়া ধ্বনির সহিত ধ্বনির মিলনে অর্থের সহিত অর্থের মিলনে যে পরস্পর স্পর্ধী চারুতাদ্বয় উৎপন্ন হইবে, তাহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্যই 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ।

শব্দ ও অর্থের সহিতত্ত্ব ও মিলনের ফলেই সাহিত্যের উদ্ভব— এ বিষয় বা চিন্তাকে অবলম্বন করে অলংকার শাস্ত্রে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কাব্যের আত্মা যাই হোক কাব্যের দেহ হল তার শব্দার্থ। শব্দ ও অর্থকে সাজিয়ে চারুত্ব সম্পাদন করলেই তা কাব্য হয়ে ওঠে। কোনো বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য আমরা যখন কোনো শব্দের কথা চিন্তা করি, তখন সেই শব্দের সঙ্গে তার অর্থের সম্পর্কের কথাটিও প্রধান হয়ে ওঠে। আবার যখন কোনো অর্থের কথা চিন্তা করা যায়, তখন অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করেই কবি কালিদাস শ্লোক রচনা করে লিখেছেন—

বাগর্থমিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।।

অর্থাৎ বাগর্থের ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত জগতের মাতাপিতা পার্বতী পরমেশ্বরকে বাগর্থলাভের জন্য বন্দনা করি।

৪১১.১.১.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. নন্দনতত্ত্ব কী?

২. নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

৩. নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় অলংকারতত্ত্বের সম্পর্ক বুঝিয়ে দাও।

৪. নন্দনতত্ত্বের মধ্যে ভারতীয় আলংকারিক ভামহের মতামতগুলি আলোচনা কর।

৫. ভামহের মতে কাব্য কী?

৪১১.১.১.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. কাব্যালংকার — ভামহ

২. সাহিত্যদর্পণ — বিশ্বনাথ কবিরাজ

৩. কাব্যজিজ্ঞাসা — অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৪. অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব — সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৫. সৌন্দর্যতত্ত্ব — সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পত্র : বি-কোর – ৪১১

শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ২

দণ্ডী

বিন্যাসক্রম

৪১১.১.২.১ উপক্রমণিকা

৪১১.১.২.২ গুণপ্রস্থান

৪১১.১.২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪১১.১.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.১.২.১ উপক্রমণিকা

আলংকারিক দণ্ডীর গ্রন্থটির নাম 'কাব্যাদর্শ'। এটিতে মোট তিনটি পরিচ্ছেদ, ৩৬৮টি কারিকায় ৩৬টি অর্থালংকারের আলোচনা আছে। দণ্ডী ভামহের অব্যবহিত পরবর্তী নাকি পূর্ববর্তী এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মনে করেছেন দণ্ডী বাণভট্টের (৬০৬-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্ববর্তী লেখক। দণ্ডী মনে করতেন 'ইষ্টার্থ সংবলিত পদাবলীই কাব্য'। তাঁর মতে অলঙ্কার দুই প্রকার— স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। নিরলঙ্কার রচনা, রসশূন্য বা বক্রোক্তিশূন্য নিছক বর্ণনা যে কাব্য হতে পারে, একথা সাধারণ আলংকারিকেরা মানতেন না। কিন্তু নিজে কবি হওয়ায় অনুভব করেছিলেন স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠ তন্ময় বর্ণনার মধ্যেও চমৎকারিত্ব আছে। তাই স্বভাবোক্তি তাঁর কাছে আদি অলংকার। অলংকারবাদীদের সমালোচনায় অন্য আলংকারিকেরা বাক্য অনলংকৃত অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্য এর উদাহরণে সাহিত্যদর্পণকার কুমারসম্ভবের 'অকালবসন্ত' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—

> মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
> শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ।।

এখানে অনুপ্রাসের একটু আধটু ঝোঁক থাকলেও এর অর্থ একেবারে নিরলঙ্কার। অকালবসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনস্থলীতে রতিদ্বিতীয় মদনের সমাগমে তির্যকপ্রাণীদের অনুরাগের লীলাটি মাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোনো অলংকারে সাজানো হয়নি। অথচ এর মনোমুগ্ধ বর্ণনা আমাদের আনন্দ দেয়। যারা অলংকারবাদী তাঁরা বলবেন এখানে অলংকার আছে তা হল স্বভাবোক্তি অলংকার। এরকম নিরলংকৃত অপর একজন কবির রমণীয় অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হল—

> হে অচল, তব আঁখিতে আমার
> আঁখি কারে পায় খুঁজি

যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
আঁধারে লুকানো বুঝি।

(লেখন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কোনো অলংকারের সাজসজ্জা নেই, অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাবের বন্যা। এই ভাবের জন্যই অনুভূতির বিশিষ্টতার জন্যই এগুলির কাব্যত্বগুণ যে মনকে আকষর্ণ করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অলংকাববাদীদের এইসব উদাহরণগুলিতে খুঁজে ফেরেন স্বভাবোক্তি ও সমাসোক্তি অলংকার। 'স্বভাবোক্তি' এই নামটি অবশ্য প্রমাণ করে কাব্যত্বের জন্য বাইরের প্রসাধন না হলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'আমার গান ছেড়েছে আজ
সকল অলংকার।'

'A coat' শিরোনামে লেখা W. B. Yeats এর একটি কবিতাও প্রায় একই কথা বলে—

I MADE my song a coat
Covered with embroideries
From heel to throat;
But the fools caught it,
Wore it in the world's eyes
As through they'd wrought it.
Song, let them take it,
For there's more enterprise
In walking naked.

অর্থাৎ যে অলংকার কেবল বাইরের আভরণ হয়ে থাকে তা কখনোই কাব্যের প্রাণভ্রমরা হয় না। বৈষ্ণব কবি যখন লেখেন—

দুখিনীর দিন দুখেতে গেলো।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভালো।।

বিস্ময়াপ্লুত দৃষ্টি নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের কবি যখন লেখেন—

'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু'

যুগের বন্ধ্যাভূমির উপর দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্যের কবি যখন লেখেন—

'ভারী ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে।'

তখন বাইরের অলংকার না থাকা সত্ত্বেও শব্দগুলির কাব্যত্বের মুকুট পেতে অসুবিধা হয় না। আনন্দবধর্ন তাই 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে বলেছেন—

'রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বত্যঃ সোহলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ।।

এই 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বত্যঃ' বুঝিয়ে দেয় যে অলংকারকে কাব্যরসের প্রেরণা উৎস হয়ে উঠতে হবে। ভারতীয় আলংকারিকরা তাই 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' বলেই থেমে যেতে পারলেন না। কাব্যের আত্মার অন্বেষায় তাঁরা যাত্রা করলেন আরও গভীরে।

৪১১.১.২.২ গুণপ্রস্থান

প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের মতে শব্দ, অর্থ, রস, ধ্বনি অলংকার প্রভৃতির মতো গুণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যোপকরণ। গুণ হল কাব্যের উৎকর্ষবিধায়ক ধর্ম— 'রসস্যউৎকর্ষকাগুণাঃ'। রসের উপকারক হয়ে রস ধর্ম রূপে কাব্যগুণগুলি কাব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে গুণগুলিকে দোষের বিপর্যয়রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু দোষের বিপর্যয়ই গুণ, তাই দোষ দশ প্রকার হওয়ায় গুণও দশ প্রকার— শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, ওজঃ, সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা ও কান্তি। তিনি কোনো গুণকেই স্পষ্টতঃ শব্দ, অর্থ অথবা রসাদির সাথে সংযুক্ত করেননি। অগ্নিপুরাণের মতে কাব্যে যা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাই গুণ। আচার্য ভামহ 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে গুণ শব্দটির স্পষ্টতঃ উল্লেখমাত্র একবারই পাওয়া যায়— ভাবিক অলংকার প্রসঙ্গে। মাধুর্য, প্রসাদ ও ওজঃ এই তিনটি গুণই স্পষ্টতঃ ভামহ স্বীকার করেছেন। ভামহের পর কাব্যাদর্শকার আচার্য দণ্ডী দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন—

> শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্যং সকুমারতা।
> অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিসমাধয়ঃ।।

যদিও তিনি গুণের কোনো লক্ষণ দেননি, তবু ভরতের মতোই দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন। এই দশটি গুণকে বৈদর্ভমার্গের প্রাণস্বরূপ বলেছেন— 'ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণাঃ স্মৃতাঃ।' আচার্য বামন কিন্তু 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ' গ্রন্থে গুণের লক্ষণ নির্ধারণ করে বলেছেন 'কাব্য শোভার জনক ধর্মগুলি হচ্ছে গুণ।' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে ধর্মগুলি কাব্যের শোভা সৃষ্টি করে সেগুলিই গুণ। তিনি দশটি শব্দগুণ ও দশটি অর্থগুণের আলোচনা করেছেন। বামন বৈদর্ভী, গৌড়ীয় ও পাঞ্চালী এই তিনটি রীতির উল্লেখ করেছেন এবং বৈদর্ভী রীতির লক্ষণ বলেছেন 'সমস্তগুণোপেতা বৈদর্ভী'। তিনি ভরত ও দণ্ডী স্বীকৃত গুণগুলিকেই স্বীকার করেছেন। ধ্বনিবাদীরাও বামনের মতো গুণকে নিত্য ধর্ম বলেছেন, তবে রসের নিত্যধর্ম বা রসের অব্যভিচারী ধর্মরূপেই তাঁরা গুণকে দেখেছেন। বস্তুতঃ ধ্বনিবাদীরা মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ এই গুণত্রয়কেই স্বীকার করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন যে, কাব্যাত্মভূত রসেরই প্রকৃতপক্ষে মাধুর্যাদি গুণ থাকে। আনন্দবর্ধন এবং অভিনবগুপ্ত উভয় আচার্যই বলেছেন যে, শৌর্যাদি যেমন আত্মার ধর্ম, শরীরের বা দেহের ধর্ম নয়, ঠিক তেমনই এই মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ নামক তিনটি কাব্যগুণও কাব্যাত্মারূপ রসেরই ধর্ম, শব্দ ও অর্থের ধর্ম নয়। ধ্বন্যালোক গ্রন্থে দ্বিতীয় উদ্যতে বলা হয়েছে—

> 'তমর্থমবলম্বন্তে সেহনিঙ্গং তে গুণা স্মৃতাঃ।'

আচার্য মম্মট বলেছেন—

> 'যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মাঃ শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ।
> উৎকর্ষহেতবন্তে স্যুৎরচনাস্থিতয়ো গুণাঃ।।'

মানুষের শৌর্যাদির গুণ যেমন আত্মার উৎকর্ষের হেতু মাধুর্য, ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি গুণ তেমনি অঙ্গীরসের ধর্ম এবং উৎকর্ষের কারণ। তিনি নিজেই এখানে আত্মার সঙ্গে রসের উপমা দিয়েছেন। সাহিত্যদর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

‘রসস্যঙ্গিত্বথাপ্তস্য ধর্মাঃ শৌর্যাদয়ো যথা গুণাঃ।’

জীবদেহের শৌর্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি দেহীরূপে আত্মার গৌরব সাধন করে বলে তাকে গুণ বলা হয়। কাব্যের শব্দার্থ হল শরীর এবং রস হল আত্মা। সুতরাং এগুলি যখন রসের উৎকর্ষ সাধন করে তখন শব্দার্থগুলির ব্যবহার কাব্যের সহায় হয়ে থাকে। গুণ দিয়ে যদি রসের ধর্ম হয়, তাহলে গুণ থাকলে রস অবশ্যই থাকবে, কারণ রসযুক্ত বাক্যই কাব্য। প্রাকৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের বিষয়ে প্রেম কবিতা প্রথম হালের ‘গাথাসপ্তশতী’ কাব্যেই পাওয়া যায়। এগুলিতে শৃঙ্গার রস ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে এবং গুণের মাধ্যমেই স্পষ্ট রস প্রতীতি ঘটেছে এবং তা পাঠকবর্গের সহজবোধ্য হয়েছে।

৪১১.১.২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. দণ্ডীর রচিত অলংকারশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থটির নাম কী?

২. প্রাচ্য আলংকারিক হিসাবে দণ্ডীর নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনার পরিচয় দাও।

৩. ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে ‘গুণপ্রস্থান’ বিষয়ে দণ্ডীর মতামত আলোচনা করো।

৪. দণ্ডীর মতে ‘গুণ’ কয়প্রকার?

৫. গুণপ্রস্থান কী? অলংকারশাস্ত্রে ‘গুণপ্রস্থান’ এর ভূমিকা কতটা বলে তুমি মনে করো।

৪১১.১.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. কাব্যাদর্শ — দণ্ডী

২. সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — গৌরীনাথ শাস্ত্রী

৩. কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা — অচিন্ত্য বিশ্বাস

৪. রসসমীক্ষা — রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ৩
বামন

বিন্যাসক্রম

৪১১.১.৩.১ প্রস্তাবনা
৪১১.১.৩.২ সূত্রব্যাখ্যা : 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' ও 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'
৪১১.১.৩.২.১ বামনের সূত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা
৪১১.১.৩.৩ সূত্রব্যাখ্যা : 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'
৪১১.১.৩.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৪১১.১.৩.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.১.৩.১ প্রস্তাবনা

'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ', 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ' এবং 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'— এই তিন প্রবাদপ্রতিম উক্তির জনক আচার্য বামন। সম্ভবত নবম শতক তাঁর আবির্ভাবকাল এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কাব্যালঙ্কার সূত্র ও তার বৃত্তি। দণ্ডী, ভামহ, কুন্তক রীতি নিয়ে আলোচনা করলেও বামনের মতো গুরুত্ব আরোপ করেননি বলেই রীতিবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই বামন স্মরণীয় হয়েছেন। তিনি রসকে কাব্যের আত্মা হিসেবে মানতে চাননি। অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী বামনের রীতিপ্রস্থানকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন— 'কাব্যের আত্মা রীতি, রীতির আত্মা গুণ, অতএব প্রকারান্তরে কাব্যের আত্মা গুণ... উপমাদি পারিভাষিক অলংকার তার শোভা বাড়িয়ে দেয় মাত্র।'

বামনের গ্রন্থটি সূত্রাকারে লেখা— এর মধ্যে পাঁচটি অধিকরণ আছে (শরীর, দোষ-দর্শন, গুণবিচার, আলঙ্কারিক, প্রয়োগিকা); শেষ পরিচ্ছেদে কাব্যশুদ্ধি বিচার করা হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ৩৬টি অলঙ্কার ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বামনের 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ' সূত্রটির 'কামধেনু' নামক ব্যাখ্যায় গোপেন্দ্র ত্রিপুরহর ভূপাল বলেছেন এই সৌন্দর্যার্থক অলংকার কাব্যকে উপাদেয় করে তোলে এবং কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় ও বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা কাব্যশাস্ত্রে করা হয় বলেই কাব্যশাস্ত্রের অপর নাম অলংকারশাস্ত্র।

বামনকে উদ্ভটের সমসাময়িক বলে মনে হয় এবং রাজতরঙ্গিণী অনুসরণে জানা যায় তিনি কাশ্মীর রাজ জয়াপীড়ের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। আলংকারিক উদ্ভট ছিলেন ঐ রাজসভার সভাপতি। জয়াপীড়ের রাজত্বকাল ৭৭৯-৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। উদ্ভটের প্রাত্যহিক বেতন ছিল নাকি একলক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ)। বামন, উদ্ভট ঐ প্রমুখ মন্ত্রিগণ আপন মনোরথের দ্বারা ঐ রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।

৪১১.১.৩.২ সূত্রব্যাখ্যা : 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' ও 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'

আচার্য বামনই প্রথম সূত্রাকারে অলংকারশাস্ত্র রচনা করেন এবং নিজের সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা (বৃত্তি) করে সূত্রার্থ পরিস্ফুট করেন। এইকারণে তাঁর গ্রন্থের নাম 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'। এই গ্রন্থের দুটি মূল্যবান সূত্র হল— 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' ও 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'।

অলংকারের জন্য কাব্য উপাদেয় হয় (কাব্যং খলু গ্রাহ্যম্ উপাদেয়ং ভবতি অলংকারাৎ) এবং সৌন্দর্যই অলংকার। অর্থাৎ কিনা সৌন্দর্যই কাব্যের শব্দার্থশরীরকে রমণীয় করে তোলে। অলংকার ছাড়া শব্দার্থ নিতান্ত কেজো কথার ফিরিস্তি বৈ নয়।

প্রসঙ্গত কাব্য শব্দটির একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বামনের টীকাকার গোপেন্দ্রত্রিপুরহর ভূপাল তাঁর কাব্যালঙ্কারাকমধেনু টীকায় (১/১) এ প্রসঙ্গে প্রচলিত নানা মত সংকলন করেছেন। ক) করণীয়াং কাব্যম্ ইতি লোচনকারঃ। খ) কবয়তীতি কবিঃ, তস্য কর্ম কাব্যম্ ইতি বিদ্যাধরঃ। গ) কৌতি শব্দায়তে বিমৃশয়তি রসভাবান্ ইতি কবিঃ। তস্য কর্ম কাব্যম্ ইতি ভট্টগোপালঃ। লোকোত্তরবর্ণনানিপুণ কবিকর্ম কাব্যম্ ইতি কাব্যপ্রকাশকারঃ। ভামহোপি প্রজ্ঞা নবনবোন্মোষশালিনী প্রতিভা মতা। তদনুপ্রাণনাজীবদ্ বর্ণনানিপুণঃ কবিঃ।। তস্য কর্ম স্মৃতং কাব্যম্ ইতি। 'কু' ধাতু (শব্দ করা অর্থে) —নিষ্পন্ন কাব্যশব্দের যৌগিক অর্থ নিশ্চয় শব্দ দিয়ে ভাবপ্রকাশ। ভামহ কাব্যপ্রকাশকার মম্মট প্রমুখ আচার্যেরা তাই কবিপ্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত শব্দময় ভাবপ্রকাশকে কাব্য বলেছেন। বামন বলেছেন সুশোভন শব্দার্থযুগলই তাঁর মতে কাব্যপদবাচ্য।

অলঙ্কার শব্দটির মূলে দুটি শব্দ অলম্ এবং কার। অলম্ – কৃ+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে) এবং অলম্ – কৃ+ঘঞ্ (করণবাচ্যে) এই ব্যুৎপত্তির মাধ্যমে অলংকার শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'অলংকৃতিরলংকারঃ সৌন্দযম্' (ভাববাচ্যে)। আলংকারিক বামন তাঁর কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি গ্রন্থে সৌন্দর্য অর্থেই অলংকার শব্দটিকে প্রথমে ব্যবহার করেছেন। 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ' আবার করণ বাচ্যে বলা হয় 'অলংক্রিয়তে অনেনেতি লংকারঃ' অর্থাৎ যার দ্বারা অলংকৃত করা হয়। ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন সৌন্দর্য রূপ অর্থটি হল অলংকার শব্দের ব্যাপক অর্থ বা সাধারণ অর্থ। এর দ্বারা কাব্যের যে কোনো প্রকার শোভাকর ধর্মকে বোঝায়। কিন্তু করণবাচ্যে নিষ্পন্ন অর্থটি প্রথম অর্থের তুলনায় সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থ। এর দ্বারা উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি বিশেষ অলংকারগুলিকে বোঝায়। অবশ্য এগুলি দ্বারাও কাব্যশোভা প্রাপ্তি হয় বলে এগুলিও কাব্যশোভাকর ধর্মের মধ্যে পরিগণিত হয়। দণ্ডী প্রভৃতি আলংকারিকগণ গুণাদি কাব্যোপাদানকেও কাব্যশোভাকর ধর্ম রূপে পরিগণিত করেছেন। দণ্ডী 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন— 'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলংকরান্ প্রচক্ষতে'— এখানে অলংকার শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে। অনুপ্রাস উপমাদির ক্ষেত্রে সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থেই অলংকার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গুণ ও অলংকারের পার্থক্য করতে গিয়ে আচার্য বামন বলেছেন—

'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ।' আবার 'তদতিশয়হেতব স্তলংকারাঃ।' অর্থাৎ গুণসমূহ কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বিশেষ অলংকারগুলি অর্থাৎ উপমা রূপকাদি অলংকারসমূহ সৃষ্ট কাব্যশোভাকে বর্ধিত করতে পারে মাত্র। আচার্য দণ্ডী তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্লেষাদি দশ প্রকার গুণকে সাধারণ অলংকার বলেছেন, উপমাদি অলংকারগুলিকে সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থে কাব্যশোভাবর্ধক রূপে স্বীকার করেছেন। আচার্য বামন কিন্তু পরিষ্কারভাবেই সাধারণ অলংকার ও বিশেষ অলংকারের পার্থক্য বুঝিয়েছেন। গুণ বা কর্তৃবাচ্য নিষ্পন্ন অলংকার হল— নিত্য, এটি সমবায় সম্বন্ধে থাকে, কিন্তু উপমাদি অলংকার হল অনিত্য অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধে থাকে।

অলংকারশাস্ত্রকে ভূষণ শাস্ত্রও বলা হয়। অলংকারের সংজ্ঞায় আচার্য ভরত বলেছেন—

অলংকারৈর্গুণৈশ্চৈব বহুভিং সমলংকৃতম্।
ভূষনৈরিব চিত্রার্থৈস্তদ্ভূষণসিতি স্মৃতম্।।

ভরতের এই উক্তি থেকে জানা যায় যে অলংকারও গুণ উভয়ই ভূষণ শব্দ দ্বারা ভূষিত। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, যমক, দীপক প্রভৃতি অলংকার এবং প্রসাদ, ওজঃ ও মাধুর্য গুণের মিলনেই কাব্য ভূষিত হয়। এই জন্যই অলংকারশাস্ত্রের অপর নাম ভূষণশাস্ত্র।

স্বর্ণাদি অলংকারের দ্বারা সজ্জিত হলে যেমন মানুষের দৈহিক শোভা বৃদ্ধি পায় তেমনি উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, যমক প্রভৃতি অর্থালংকারও শব্দালংকার যুক্ত কাব্যদেহও শোভাযুক্ত হয়। শব্দ বা অর্থের মধ্যে বিদ্যমান থেকে অলংকার কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসের উৎকর্ষ সাধন করে ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। সুতরাং অলম্ বা বিভূষণ করা হয় যার দ্বারা তাকে অলংকার বলে। অলংকারের সাধারণ অর্থ হল সৌন্দর্য।

অলংকার কবিদের অজ্ঞাতসারেই কাব্য বা সাহিত্যে আপনি আত্মপ্রকাশ করে। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে বলেছেন— 'অপৃথগ্ যত্ননির্বত্য সোহ্লংকারঃ ধ্বনৌমতঃ'। হাল বিরচিত গাথাসপ্তশতীতে হয়তো বা কবির অজান্তেই বিভিন্ন অলংকারের প্রকাশ ঘটেছে।

অলম্ শব্দটির বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হল— 'সৌন্দর্য', আরেকটি অর্থ হল গহনাদি অলংকার। বেদে অলম্ শব্দের মত একটি শব্দ পাওয়া গেছে সেটি হল অরম্। এর অর্থও অলংকার। বেদের এই 'অরম্' শব্দের সাথে লাতিন 'aurum' শব্দের মিল আছে। লাতিনে এই শব্দের অর্থ হল সোনা। সোনা থেকেই আসে সৌন্দর্য।

সৌন্দর্য অর্থে অরম্ শব্দটি যেমন পাওয়া যায় তেমনি বৈদিক সাহিত্যে অলংকারের উপাদানও লক্ষিত হয়। কিন্তু অলংকারশাস্ত্র তখন রচিত হয়নি। বৈদিক সাহিত্য হতে অলংকারের উপাদান সংগ্রহ করে পরবর্তী সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে অলংকারের অনেক আলোচনা ও বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। আলংকারিক ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্রে সংস্কৃত অলংকারের আলোচনা লক্ষিত হয়। ভরতের পর আচার্য ভামহ, দণ্ডী, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন প্রমুখ আলংকারিকগণ তাঁদের রচিত অলংকার শাস্ত্রসমূহে অলংকারাদির বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাকৃত ভাষায় রচিত এখনো পর্যন্ত একটি অলংকারগ্রন্থ পাওয়া যায়, যদিও লেখকের নাম জানা যায়নি, গ্রন্থটি হল 'অলংকারদপ্পণ'।

কাব্যশাস্ত্রে বর্তমানকালে রসতত্ত্বের পরই অলংকারতত্ত্বের স্থান। পূর্বাচার্যগণের নিকট অলংকারতত্ত্বই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়, কাব্যশাস্ত্র বা 'Poetics' ও তাই অলংকারশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। কাব্যমীমাংসাকার আচার্য রাজশেখর অলংকার শাস্ত্রকে সপ্তম বেদাঙ্গ বলেছেন। এই শাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া বেদার্থেরও সম্যকজ্ঞান হয় না একথাও তিনি বলেছেন—

উপকারকত্বাদ্ অলংকারঃ সপ্তমম্ অঙ্গম ইতি যাযাবরীয়ঃ।
ঋতে চ তৎস্বরূপবিজ্ঞানাদ্ বেদার্থানবগতিঃ।।

অর্থাৎ অলংকার শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ সৌন্দর্যশাস্ত্র বা কাব্যসৌন্দর্য বিজ্ঞান, ইংরাজিতে বলা যেতে পারে 'Aesthetic of Poetry' প্রাচীন আচার্যগণ অলংকার শব্দটি সৌন্দর্য অর্থে গ্রহণ করে কাব্যশাস্ত্র বা Poetics এর তদ্রূপ সার্থক নামকরণ করেছিলেন।

পরবর্তীরা অলংকারকে সৌন্দর্য শব্দ না বলে রস বলেছেন এবং পরে জগন্নাথ আবার সৌন্দর্যবাচক 'রমণীয়তা' শব্দই ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের রসের যে মূল্য ও স্থান হচ্ছে সৌন্দর্যের। অলংকারশাস্ত্র এক সময়ে যথার্থই 'a treatise on beauty' বুঝাবো বামনের আলোচনা থেকে এ তথ্যই প্রমাণিত।

৪১১.১.৩.২.১ বামনের সূত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা

'কাব্যং গ্রাহ্যং অলংকারাৎ' সূত্রটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে অতুল গুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে। এরূপ মত পোষণ করেন অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী। অতুলবাবু কাব্যজিজ্ঞাসায় বলেছেন 'শব্দকে অলঙ্কারে, যেমন অনুপ্রাসে সাজিয়ে সুন্দর করা যায়; অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলংকারে চরুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয় সে এই অলংকারের জন্য 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ'— (বামন)। এ মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে 'অলংকারশাস্ত্র'। কিন্তু একটু বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখব উক্ত মতটি সম্পূর্ণ সত্যের বিপরীত। আসলে 'কাব্যং গ্রাহম্ অলংকারাৎ'–এর অলংকারকে অনুপ্রাস উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা বলে পাছে কেউ ভুল করে এই আশঙ্কায় বামন স্বয়ংই পরবর্তী সূত্রে জানিয়ে দিয়েছেন 'সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ' (১/১/২)। এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্য কবিকে চলতে হয় দোষ-পরিহার, গুণ-গ্রহণ এবং (অনুপ্রাস উপমাদি) অলংকার গ্রহণ এই ত্রয়ীর পথ ধরে ('স খলু অলঙ্কারঃ দোষহানাৎ গুণালঙ্কারাদানাৎ চ সম্পাদ্যঃ কবেঃ'— ১/১/৩ বামন বৃত্তি)। ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম: অলঙ্কার (সৌন্দর্য) = অশ্লীলতাদি দোষ বর্জ্জন + মাধুর্য্যাদি গুণ যোগ + অনুপ্রাস উপমাদি যোগ। অন্যভাবে বলা যায়, 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' এর অলঙ্কার Beauty এবং উপমাদি হল অন্যতম Beautifying Instrument ('করণব্যুৎপত্ত্যা'—বামন)। যতটুকু দেখলাম তাতে মনে হতে পারে যে বামনের মতে উপমাদি অলঙ্কার কাব্যে থাকতেই হবে। কিন্তু এরূপ মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ বামন বলেছেন কাব্যের নিত্যধর্ম হচ্ছে 'গুণ' (৩/১/৩), অলঙ্কার অনিত্য। 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' (১/২/৬)— কাব্যের আত্মা রীতি। রীতি মানে 'বিশিষ্টা পদরচনা' (১/২/৭)। পদ রচনার বৈশিষ্ট্য কোথায়? মাধুর্যাদি গুণে। যার নাম রীতি, সেই পদরচনার আত্মা হল গুণ— 'বিশেষোগুণাত্মা' (১/২/৮)। সহজ কথায় কাব্যের আত্মা রীতি, রীতির আত্মা গুণ; অতএব প্রকারান্তরে কাব্যের আত্মা গুণ অর্থাৎ রীতাত্মক কাব্যগুণময় গুণেই তার শোভা। উপমাদি পারিভাষিক তথাকথিত লঙ্কার এই শোভা বাড়িয়ে দেয় মাত্র। এইকারণে কাব্যে গুণ নিত্য, উপমাদি অনিত্য। যেখানে গুণ নাই, উপমাদি অলঙ্কার আছে, সেখানে কাব্যই নাই। একা পারিভাষিক অনুপ্রাস উপমাদির অলঙ্কারের কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতাও নাই অধিকারও নাই। এই চমৎকার কবিতার সাহায্যে বামন এই তত্ত্বটি বুঝিয়েছেন। 'তার সারার্থ এই যুবতীর রূপলাবণ্যই আস্বাদন করেন রসিক; বাছাই করা দুচারখানা অলঙ্কারের রচনায় সে রূপ আরও উপাদেয় হয়। কিন্তু রূপলাবণ্য যখন খসে পড়ে, তখন লোকের লোচনরোচন নানা অলঙ্কার অঙ্গে চড়ালেও অঙ্গনাটির পান কেউ ফিরেও চায় না। বলাবাহুল্য তরুণীর রূপলাবণ্য কাব্যের প্রসাদ-মাধুর্য্যাদি গুণ; তার অলঙ্কার কাব্যের অনুপ্রাস উপমা ইত্যাদি। মোটামুটি এইভাবেই বামনের 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' সূত্রের সত্যলোক দর্শন করিয়েছেন শ্যামাপদ বাবু।

এছাড়া আরও একটা বিষয় তিনি যোগ করেছেন, তা হল অনুপ্রাস উপমা রূপক ইত্যাদির আলোচনা থাকার জন্য 'কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম অলঙ্কারশাস্ত্র' হয় নাই। সাধারণভাবে সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যের অর্থাৎ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন অলঙ্কারের তত্ত্বকথা আলোচিত হওয়ায় কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্র'। বামনের 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ' সূত্রটির কামধেনু নামক ব্যাখ্যায় গোপেন্দ্র ত্রিপুরহর ভূপাল বলেছেন, এই যে সৌন্দর্যার্থক অলঙ্কার,

যা কাব্যকে গ্রাহ্য অর্থাৎ উপাদেয় করে তোলে, এরই স্বরূপনির্ণয় আর বৈচিত্র্যব্যাখ্যান কাব্যশাস্ত্রে করা হয় বলে কাব্যশাস্ত্রও অলঙ্কারশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

৪১১.১.৩.৩ সূত্রব্যাখ্যা : 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'

অলংকারবাদীগণ কাব্যের প্রধান ভূষণ হিসেবে অলংকারকে নির্দিষ্ট করলেও অলংকারকেই কাব্যের আত্মা বলে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা দেখিয়েছেন যে অলংকার যুক্ত করলেই তা কাব্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। আবার এও দেখিয়েছেন যে অলংকার নেই তথাপি তা কাব্য ধর্মী হয়ে উঠেছে। আলংকারিক বামন প্রথম স্পষ্টভাবে জানালেন যে রীতি বা বিশিষ্ট পদ রচনাভঙ্গির জন্যই বাক্য অলংকৃত না হয়েও কাব্য পদবাচ্য হতে পারে। তাঁর মতে কাব্যের আত্মা হল 'রীতি'—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। 'রীতি' বলতে বামন 'বিশিষ্টা পদরচনা' অর্থে বুঝেছেন। বামন তাঁর 'কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র মতবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি যদিও ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি আচার্যদেরই মতকে অনুসরণ করেছেন, তথাপি তাঁর চিন্তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

বামনের মতে 'বিশিষ্টা পদরচনারীতি' অর্থাৎ বিশিষ্ট রচনাই হচ্ছে রীতির প্রধান প্রতিপাদ্য। তিনি গুণ সমন্বিত পদ রচনাকেই 'বিশিষ্টা' শব্দের দ্বারা বিশেষিত করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি দশটি শব্দগুণ ও অর্থগুণ স্বীকার করেছেন এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করেই তিনি রীতিবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শব্দার্থের সহায়তা ব্যতিরেকে কোনো রচনার আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয় কারণ শব্দ ও অর্থ রচনার দেহ ও সৌন্দর্য। তেমনি গুণাশ্রিত বিশেষ কোনো রীতিকে অবলম্বন করে;

বামন তিন প্রকার রীতির কথা বলেছেন— বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী এবং ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য প্রভৃতি কুড়ি প্রকার গুণের কথা বলেছেন। তিনি ওজঃ এবং কান্তিগুণ সমৃদ্ধ রচনাকে গৌড়ী; মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণসমৃদ্ধ রচনাকে 'পাঞ্চালী' এবং সর্বগুণসমৃদ্ধ রচনাকে 'বৈদর্ভী' রীতি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, তিনি এই তিন প্রকার রীতির মধ্যে বৈদর্ভী রীতিকেই সবথেকে মর্যাদা দিয়েছেন।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসা গ্রন্থে আলোচনা সূত্রে রীতিবাদের যুক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন— কাব্যের আত্মা হল 'স্টাইল'। স্টাইল গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়। আর তার অভাবে বক্তব্য বিষয়ের স্মতা থাকলেও অন্য বাক্য কাব্য হয় না। পাশ্চাত্য আলংকারিকগণ 'রীতি'র বিষয়টিকে 'Style' কথাটির দ্বারা বুঝতে চেয়েছেন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে— 'Style is the man'। এক একজন কবি ও শিল্পীর রচনার নিজস্ব একটি ভঙ্গী থাকে; সেই ভঙ্গীর জন্য তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হয়ে থাকবেন। ভঙ্গী বা form বিষয়টিই মুখ্য উপজীব্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায় সেখানে। তবে বামন যাকে 'রীতি' বলে উল্লেখ করেছেন, তা কেবল form নয় form এর অতিরিক্ত কিছু। এই অতিরিক্ত বিষয় বোঝাতে গুণের প্রসঙ্গ তিনি আলোচনা করেছেন। গুণ ব্যতিরেকে রীতির কথা বামন চিন্তা করেননি। 'রীতিই কাব্যের আত্মা' বলতে গিয়ে তিনি আরও গভীরে প্রবেশ করে বলতে চেয়েছেন 'বিশেষ গুণ রীতিরই আত্মা'।

৪১১.১.৩.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. বামন আনুমানিক কোন শতকের আলংকারিক ছিলেন?

২. বামন কোথাকার মন্ত্রী ছিলেন?

৩. বামনের রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থটির নাম কী?

৪. বামনের মতানুসারে কাব্যসৌন্দর্যের পরিচয় দাও।

৫. সূত্র ব্যাখ্যা করো: 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' ও 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ'

৬. সূত্র ব্যাখ্যা করো: 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'

৪১১.১.৩.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি — বামন

২. সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — গৌরীনাথ শাস্ত্রী

৩. কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা — অচিন্ত্য বিশ্বাস

৪. রসসমীক্ষা — রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক ৪
কুন্তক

বিন্যাসক্রম

৪১১.১.৪.১ প্রস্তাবনা

৪১১.১.৪.২ কুন্তক

৪১১.১.৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪১১.১.৪.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.১.৪.১ প্রস্তাবনা

বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা ছিলেন আচার্য কুন্তক। তিনি কাশ্মীরীয় আলংকারিক ছিলেন। আনুমানিক ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজানক কুন্তক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আচার্য কুন্তকের প্রসিদ্ধ 'বক্রোক্তিজীবিতম্' গ্রন্থটি ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। তিনি বক্রোক্তিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন। বক্রোক্তি হচ্ছে বক্তার কথা সঠিক অর্থে গ্রহণ না করে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা। শ্রোতা অন্য অর্থ মনে করে সে অনুযায়ী উত্তর দেয়। কুন্তকের মতে, শব্দার্থের এ বক্রোতার ফলেই কাব্যত্বের সৃষ্টি হয় এবং তা পাঠককে আনন্দ দেয়। এখন আমরা ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের কয়েকজন আলঙ্কারিকের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করব। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র'। অনুমান করা হয় গ্রন্থটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ের রচনা। তিনি প্রধানত নাট্যশাস্ত্রকার হলেও বাক্য, বাক্যবিন্যাস, বাক্যের দোষ, গুণ, অলঙ্কার, লক্ষণ ইত্যাদি এবং শৃঙ্গারাদি আট প্রকার রসের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। এর পরবর্তীকালে আলঙ্কারিক কাব্যদর্শন প্রণেতা দণ্ডী (৬ষ্ঠ শতক)। তিনি মনে করেন— ''অলঙ্কারই হচ্ছে সৌন্দর্য বিধায়ক ধর্ম।'' তাঁর মতে— ''কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।'' কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডীর পর কাব্যালঙ্কার প্রণেতা ভামহ (৭ম-৮ম শতক) কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন—''শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্''। কেননা শব্দ ও অর্থের সমন্বয়েই কাব্য লেখা হয়। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নবম শতাব্দীর প্রথম দিকের আচার্য বামন সূত্রাকারে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেন। তিনি নিজেই এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা (বৃত্তি) দেন। এজন্য তাঁর গ্রন্থের নাম হয়—''কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি''। আচার্য্য বামনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি সূত্র— ''কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ'' (কাব্য যে মানুষের উপাদেয় সে এই অলঙ্কারের জন্য) আর ''রীতিরাত্মা কাব্যস্য'' (কাব্যের আত্মা রীতি)।

অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসে এরপর আচার্য উদ্ভট এর নাম স্মরণীয়। তিনি 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ' গ্রন্থটি রচনা করেন। 'অলঙ্কার চন্দ্রিকা' গ্রন্থে, অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—''তাঁর যে গ্রন্থখানি (১৮৭৩-৭৪)

খ্রিস্টাব্দে জার্মান মনীষী ডক্টর বুহ্লার (Dr. G. Buhler) কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হয়, তার নাম 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ'। এখানি ভামহ রচিত কাব্যালঙ্কারের অলঙ্কার অংশ; উদ্ভট এতে নূতন অনেক তত্ত্ব (স্বকৃত) যোগ দিয়েছেন, সংশোধনও করেছেন অনেক। বইখানিতে উদাহরণ আছে পঁচানব্বইটি; তার মধ্যে চুরানব্বইটি উদ্ভট নিয়েছেন স্বরচিত 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে। বলা বাহুল্য, কাব্যখানি মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুকরণ।" (পৃ. ৩০১)

আচার্য উদ্ভট এর পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক হিসেবে ধ্বন্যালোক ছন্দে রচিত 'অলঙ্কারশাস্ত্র' রচয়িতা আনন্দবর্ধন। তিনি নবম শতাব্দীর শেষের দিকেই 'ধ্বনিকারিকার' বৃত্তি রচনা করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়। অভিনবগুপ্ত লিখেছেন—"'ধ্বনিকারিকার' 'বৃত্তি'র ব্যাখ্যা। তিনি নাম দিয়েছিলেন—'লোচন'। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী, তাঁর 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা' গ্রন্থে বলেছেন—"মনে হয় মূল বইখানির নাম 'ধ্বনিকারিকা', বৃত্তির নাম 'আলোক', টীকার নাম 'লোচন'।" (পৃ. ৩০১) ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে এরপর আলঙ্কারিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন—'রুদ্রট'। ইনিও কাশ্মীরী ছিলেন। অনুমান করা হয়, নবম শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম 'কাব্যালঙ্কার'। তিনি কাব্যসংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"শব্দার্থৌ কাব্যম্"।

রুদ্রট এর পরবর্তীকালে সে সময়ের বিখ্যাত আলঙ্কারিক হচ্ছেন রাজশেখর। গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় রাজা মহেন্দ্রপালের (৮৯০-৯০৮ খ্রিঃ) তিনি ছিলেন আচার্য এবং সভাকবি। রাজশেখরের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'কাব্যমীমাংসা', গ্রন্থটি ৯৩০ খ্রিঃ কাছাকাছি সময়ে রচিত বলে ধরে নেওয়া হয়। গ্রন্থটি আঠেরটি অধিকরণে বিভক্ত ছিল। তাঁর মতে রীতি ছিল তিনটি—বৈদর্ভী, গৌড়ী আর পাঞ্চালী। রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থটি—"কতকটা বায়ু পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদির অনুসরণে এবং অনেকখানি স্বকীয় কল্পনার যোগে রাজশেখর কাব্যের জন্ম, বিকাশ প্রভৃতির এক সুন্দর কাহিনী রচনা করেছেন।" কাব্যমীমাংসা গ্রন্থটি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের একখানি বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত গ্রন্থ। রাজশেখর কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"গুণবৎ অলঙ্কৃতং বাক্যং কাব্যন্"।

৪১১.১.৪.২ কুন্তক

রাজানক কুন্তক বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা। প্রাচীন ভারতীয় তথা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বক্রোক্তিবাদ নন্দনতত্ত্বের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বক্রোক্তি হল বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গির সঙ্গে উক্তি। কুন্তক 'বক্রোক্তিজীবিতম্' গ্রন্থের প্রথম উন্মেষের দশম কারিকায় বক্রোক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন—

"উভাবেতাবলঙ্কার্যৌ তয়োঃ পুনরলঙ্কৃতিঃ।
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গী ভণিতি রুচ্যতে।"

অর্থাৎ বক্রোক্তি হল বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গির সঙ্গে উক্তি। সর্বোপরি শব্দ ও অর্থ উভয়েই অলঙ্করণযোগ্য। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে রয়েছে অলঙ্কৃতি। আর অলঙ্কৃতি হল বক্রোক্তি বা বিদগ্ধ কবির প্রতিভা থেকে উৎপন্ন বক্রোতা বা ভণিতি বৈচিত্র্য বা কবিকর্ম কৌশল। আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয় আলংকারিক আচার্য্য ভামহ "সকল অলঙ্কারকেই এক কথায় বক্রোক্তি বলেছেন এবং অতিশয়োক্তিকে বলেছেন একমাত্র বক্রোক্তি।" কাব্যের ক্ষেত্রে কবির বলার ভঙ্গি বৈচিত্র্যই হল 'বক্রোক্তি'। 'বক্র' শব্দের লক্ষিত অর্থ হল বঙ্কিমবাণী; যা ইঙ্গিতে ব্যক্ত, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মনোহর। আনুমানিক নবম শতাব্দীর আলংকারিক বামন 'কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে বক্রোক্তিকে

বলেছেন—“সাদৃশ্য লক্ষণা বক্রোক্তি।” আবার আলংকারিক ভামহের মতোই আনন্দবর্ধনও বক্রোক্তিকে বলেছেন—‘অতিশয়োক্তি’।

কুন্তকের মতে কাব্য শাস্ত্রের মূল কথা হল বক্রোক্তি। ভাষার যে বৈচিত্র্য বা চারুতা, চমৎকারিত্ব বা অভিনবত্ব কাব্যের প্রাণ, তাই হল কুন্তক কথিত বক্রোক্তির ফল। কুন্তকের মতে—“সবরকম অলঙ্কার বক্রোক্তি অন্তর্ভূত; রস কাব্যের আত্মা নয়, কাব্যাত্মা বক্রোক্তিকেই অধিকতর উপভোগ্য করে তোলে রস; কাব্যের প্রতীয়মান অর্থ ধ্বন্যালোকের ‘ধ্বনি’, কাব্যের আত্মা হতে পারে না, আত্মা বক্রোক্তি এবং প্রতীয়মান অর্থ বহুবিচিত্র বক্রোক্তিরই একটি বিচিত্র অঙ্গমাত্র।” অলংকার কেন সুন্দর, ধ্বনি কেন আনন্দ দেয়, রস কেন সহৃদয় সামাজিকের চিত্তকে তৃপ্ত করে এইসব প্রশ্নের উত্তরে কুন্তক বলেছেন— তিনেরই মূল বস্তু হল বক্রোক্তি। সুতরাং ধ্বনি বা রস বক্রোতারই প্রকারভেদ বা প্রসারণ মাত্র।

রাজানক কুন্তকের মতাদর্শ অনুযায়ী বৈদগ্ধপূর্ণ ভঙ্গীসহ—ভণিতি বা উক্তি। কুন্তক স্বরচিত বৃত্তিতে এই সংজ্ঞার্থকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বৃত্তিতে লিখেছেন—‘বৈদগ্ধ’ মানে হল ‘বিদগ্ধভাব: কবি কর্ম কৌশল’ অর্থাৎ বিদগ্ধের ভাব বা কবির রচনা কৌশল। কুন্তক ‘ভঙ্গী’ শব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন—‘বিচ্ছিত্তিঃ’। যাকে চারুত্ব বা রমণীয়ত্ব বা সৌন্দর্য বলা যায়। ‘বক্রোক্তিজীবিতম্’ গ্রন্থের ১৯ সংখ্যক কারিকায় কুন্তক বক্রোক্তির আরও পরিচয় দিয়ে তার বৃত্তিতে (টীকায়) বলেছেন—

“বক্রত্বং বক্রভাবঃ প্রসিদ্ধ প্রস্থান—ব্যতিরেকিনা বৈচিত্র্যেন উপনিবদ্ধঃ।”

আমরা জানি, শাস্ত্রে যেমন শব্দের প্রাধান্য। আর ইতিহাসে তেমন অর্থের বা বিষয়ের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে উক্তির বৈচিত্র্য প্রাধান্য পায়। সেইজন্য বক্রোতা বা উক্তি বৈচিত্র্যের জন্যই কবির বাণী যথার্থ কাব্য হয়ে ওঠে। আবার প্রসিদ্ধ প্রস্থান থেকে সরে আসলে, তা কখনই বক্রোতা নয়; কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা তদবিদ্ আহ্লাদকারী হওয়া চায়। কুন্তক বলেছেন অতি পরিচিত কথনভঙ্গী থেকে যা সম্পূর্ণ পৃথক তাই হল বক্রোতা। কেননা বক্তার কথা সঠিক অর্থে গ্রহণ না করে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে, এবং পরবর্তীকালে সেই অনুযায়ী উত্তর দেওয়া। শব্দার্থের এই কথনভঙ্গী থেকেই বা বক্রোতার জন্যেই কাব্যত্বের সৃষ্টি হয়।

কুন্তক ‘বক্রোক্তিজীবিতম্’ গ্রন্থে ছয় ধরনের বক্রোতার কথা বলেছেন। সেগুলি হল—

(ক) বর্ণবিন্যাস বক্রোতা

(খ) পদপূর্বাধ বক্রোতা

(গ) প্রত্যয় বক্রোতা

(ঘ) বাক্য বক্রোতা—যার বৈচিত্র্য অনন্ত।

(ঙ) প্রকরণ বক্রোতা (নাটকের একটা অঙ্কে)

(চ) প্রবন্ধ বক্রোতা— (সমগ্র কাব্যের বক্রোতা)

বর্ণবিন্যাস বক্রোতা নির্ভর করে বর্ণের বিন্যাসের ওপর। বর্ণবিন্যাস বক্রোতার দ্বারা শব্দালংকার অনুপ্রাস ও যমক সৃষ্টি হয়। পদ পূর্বাধ বক্রোতার দ্বারা ভাব, লিঙ্গ, ক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর প্রত্যয় বক্রোতার সাহায্যে কাল, কারক, সংখ্যা, পুরুষ, বাচ্য ও অব্যয় গঠিত হয়। এই ছয় ধরনের বক্রোতার মধ্যে বাক্য বক্রোতার মধ্যে আছে অপূর্ব চারুত্ব। প্রকরণ বক্রোতার মধ্যে দেখা যায়— কথোপকথন, প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণন, ঘটনার পরিবর্তন, সন্ধি ইত্যাদি। কিন্তু প্রবন্ধ বক্রোতায় আছে সামগ্রিক সৌন্দর্য।

বাক্য বক্রোতার সঙ্গে প্রবন্ধ বক্রোতার যোগ দেখাতে গিয়ে কুন্তক, কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যের ৫ম সর্গ থেকে বক্রোক্তির উদাহরণ স্বরূপ এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন—

"দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাম্
সমাগম প্রার্থনয়া কপালিনঃ।
কলা চ সা কান্তি মতী কলাবত
স্ত্বমস্য লোকস্যচ নেত্র কৌমুদী।।"

অর্থাৎ দুটি বস্তু কপালী বা মহাদেবের মিলন কামনা করে অতি সত্ত্বর শোচনীয় অবস্থা লাভ করেছে। একটি হল কলাযুক্ত চাঁদের এই কান্তিমতি কলা, আর একটি জগতের নয়ন জ্যোৎস্না স্বরূপিনী উমা। কথাগুলি বলেছেন বটু ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী মহাদেব। তপস্যারতা উমা বা পার্বতীর প্রেমের গভীরতা পরীক্ষার জন্য তারই আরাধ্য দেবতা মহেশ্বরের উক্তি। এখানে ভোলানাথের অনেক নাম থাকা সত্ত্বেও 'কপালী' শব্দটি প্রয়োগ করা হল কেন? এই প্রসঙ্গে আচার্য কুন্তক বলেছেন— এই কপালী শব্দটিতে রয়েছে বক্রোতা। কারণ এই শব্দটি বীভৎস রসের অবলম্বন বিভাবের জুগুপ্সার সূচক হয়ে একটি সুন্দর বাচক বক্রোতার সৃষ্টি করেছে। কুন্তক আরো বলেছেন, জগতের যত বস্তু আছে তাদের ধর্ম বিবিধ। কিন্তু কবি চিত্তে তাদের সব ধর্মের মধ্যে সেই ধর্মটি প্রধান হয়ে ওঠে, যার দ্বারা তারা সহৃদয়ের চিত্তে আনন্দ দান করতে পারে। সেই জন্যই সেই আনন্দের পরিপোষক একটি বিশিষ্ট প্রকাশ বা দ্যোতনা দান করতে হয় শব্দার্থকে যা বক্রোতায় মণ্ডিত। সর্বোপরি ভাষার বৈচিত্র্য বা চারুতাই কাব্যের প্রাণ এবং কবির ভাষা সাধারণের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য এই ভাষা সাধারণ কথার অতীত; তাই অনির্বচনীয়।

কুন্তক বলেছেন— "কবির স্বভাব নিবন্ধত্বেন কাব্য প্রস্থানভেদঃ অর্থাৎ কবির স্বভাব অনুযায়ী কাব্যের প্রস্থানভেদ বা রচনাগত পার্থক্য হয়। 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা' গ্রন্থে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেছেন—"রীতিকে কুন্তক নূতনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— কবির স্বভাবে রীতির জন্ম, তাই নামরূপের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে একে বাঁধা যায় না।" প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের গুরুত্বটি তাই বিশিষ্ট। এবং এই বিশিষ্টতা আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্য সমালোচকদের আলোচনাতেও স্বীকৃত।

৪১১.১.৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের সংজ্ঞা দাও এবং একটি যথাযথ উদাহরণ দাও।

২. কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৩. সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় আচার্য কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করো।

৪১১.১.৪.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. অলঙ্কার চন্দ্রিকা — শ্যামাপদ চক্রবর্তী

২. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা — অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

৩. নন্দনতত্ত্বে প্রাচ্য — অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস

৪. কাব্যজিজ্ঞাসা পর্যালোচনা — অধ্যাপক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক ৫
বঙ্কিমচন্দ্র

বিন্যাসক্রম

৪১১.২.৫.১ প্রস্তাবনা

৪১১.২.৫.২ বঙ্কিমচন্দ্র

৪১১.২.৫.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪১১.২.৫.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.২.৫.১ প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর এই সুনাম সর্বজনবিদিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা প্রবন্ধের কলা সৌষ্ঠব দান করেছেন। তাঁর লেখনীর গুণে বাংলা ভাষারও উন্নতি হয়েছে। আমরা জানি যুগানুগত্য সাহিত্যের পক্ষে জরুরি বিষয়। কেননা সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে জীবনের যোগ ঘনিষ্ঠ। যুগজিজ্ঞাসার সঙ্গে জীবন জিজ্ঞাসার মেলবন্ধন অত্যাবশ্যক। সেইজন্য সময় এবং সমকালীন পটভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকে সাহিত্য। এখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগে বাংলা সাহিত্যের অবস্থানটি নিয়ে আলোকপাত করব। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুধর্ম আর সমাজ ছিল নানারকম কুসংস্কারে ভরা। এই রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ছিল সেই আবদ্ধ জলাশয়ের মতো। যে জলাশয়ের জলে স্রোত থাকে না, সেখানেই জমে পলি, পাঁক আর পোকা। রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও ছিল ঐরকম। এই যখন অবস্থা তখন পাশ্চাত্যের প্রভাব এদেশে এসে পৌঁছাল। আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—"একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।" (পৃ. ১৮)

সেই সঙ্গে বলে রাখা ভালো, বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস অথবা ভাস ভবভূতি প্রমুখ প্রতিভাধর কবিরা সংস্কৃত সাহিত্য রচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য অমর বলেই অমৃত ফল স্বরূপ। "দেখিলাম বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃতফল বেঁচিতেছেন; বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম এ পাশ্চাত্য সাহিত্য।" কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মান কি ধরনের ছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। সৎ সাহিত্য যেখানে দেশ আর দশকে অনুপ্রাণিত করে, ঠিক পথের সন্ধান দেয়। সেখানে সৎগুণে বঞ্চিত এই সাহিত্য মানুষকে দেহে-মনে দুর্বল করে দেয়। বস্তুত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল সত্যিই ঐ রকম। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কমলাকান্তের দপ্তরের' 'বড়বাজার' প্রবন্ধে কমলাকান্ত দেখেছে যে সাহিত্যের বাজারের মুখটাতেই বড় বড় সব ঝলমলে সাজানো দোকান। ''এ কিসের দোকান, বালকেরা বলিল—'বাঙ্গালা সাহিত্য'। বেঁচিতেছে কে? আমরাই বেঁচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছে। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন। কিনিতেছে কে? আমরাই। বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।'' বাংলা সাহিত্য নিজেই কাঁচকলা আর অপরকে দেখায় ঐ কাঁচকলায়। আর যাঁরা প্রাক্ বঙ্কিমযুগে লিখতেন তাঁরা বোধহয় লিখতেন শুয়ে শুয়ে কেননা কাঁচকলার ঝোল খাওয়া লেখকদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে বিরাজ করতেন কেবল মা ভবানী। আর তাঁদের মূলধন বলতে তো সংবাদপত্রের সংবাদ। যে সংবাদ বাদ দেয় মনুষ্যত্বকে, যে সংবাদ সৎ সাজায় মানুষকে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে যাঁরা সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন একথা সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই সমগ্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতর রূপের সার্থক স্রষ্টা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন সাহিত্য রচনা করেছেন, তখন গোড়াতেই ভেবেছেন দেশ এবং দশের কথা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—''নবীনা প্রতিভার অধিকারী''। এমনকি বিশ্বকবি আরো বলেছিলেন— 'নির্মল শুভ্র সংযত হাসি' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বাংলা সাহিত্যে আনেন। উনিশ শতকের সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বিচার এবং মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি এবং ভারতীয় সাহিত্যের বিচার ও সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী প্রচলন করেছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) উপন্যাস রচনা করেন। সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য রচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য রচনায় তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

৪১১.২.৫.২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৩৮-১৮৯৪) বলা হয় সাহিত্যসম্রাট। তিনি ছিলেন মূলত রোমান্টিক শিল্পী। 'নবীনা প্রতিভার অধিকারী' বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নানামুখী প্রতিভার অধিকারী। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক তিনি। প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে চিরস্মরণীয়। আবার 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকার সম্পাদক রূপেও তিনি পাঠকের কাছে সমাদৃত। এই মাসিক পত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ও রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই সময়ে এক শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক মুখপত্রের খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য ভাষার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। সর্বোপরি উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাময়িক পত্রিকার প্রতিটি শাখাকে তিনি পরিপূর্ণতা দান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করেছেন, আর বাংলা পাঠকের হৃদপদ্ম সেই প্রভাতের কিরণে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। ''পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি। কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালক ভুলানো কথা— কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত। এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনি': এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ববাহিনী

পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গ ভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

আমরা এখন আলোচনা করব তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক মতামত গ্রহণে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিক মূল্যায়নের দিকেও আলোকপাত করার প্রচেষ্টা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালীন চিন্তা-চর্চার ফলে তাঁর চিন্তন পদ্ধতির বিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্যতাত্ত্বিক বক্তব্যেও ধারাবাহিকভাবে তিনি সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে ক্রমপরিণতি পেয়েছে বিবিধ প্রবন্ধের প্রবন্ধগুলিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের দিক থেকে বঙ্কিম-সাহিত্যতত্ত্বের উন্মেষ-বিকাশ-পরিণতি পর্বের পরিবর্তনে ও পরিমার্জনায় কতখানি মননশীলতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা দেখার বিষয়। আমরা জানি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। অবশ্য বঙ্কিম পূর্ব যুগে তার পরিচয় পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে তা বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগে ঈশ্বরগুপ্ত, 'সংবাদপ্রভাকর' (১৮৩১), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমা সম্ভব' (১৮৬০) কাব্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' (১ম খণ্ড, ১৮৭৫) কাব্যের ক্ষেত্রে কেউই সাহিত্যিক সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতিকে অতিক্রম করে যাননি। তবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি আধুনিক জীবনদর্শনের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের কাব্য, নাটক রচনা করেছিলেন। সমালোচক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রসঙ্গে বলেছেন— ''সাহিত্য ও সাহিত্যের নানা বিষয় স্পষ্ট করতে গিয়ে সমালোচক হিসেবে তাঁকে অনেক সাহিত্যতত্ত্বের সূত্র দিতে হয়েছে। মধুসূদনের সঙ্গে তুলনায় তার পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি। মূলত সাহিত্যতত্ত্ব চিন্তায় তিনি ছিলেন ক্লাসিকপন্থী, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে পরিবর্তনও ঘটেছে। অনুকরণতত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন— কবিদের স্বাধীনতার কথাও বলেছেন, অনুকরণতত্ত্বকে বোঝাতে গিয়ে রোমান্টিক Wordsworth এর light that never was on sea or land এর কথা মনে রেখেছেন।" পৃ. ৩৫৫ (নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা— তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— ''যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়,— স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।" সংস্কৃত নাটককে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য এবং পঞ্চমবেদ। নাটককে সাধারণভাবে মিশ্র শিল্প বলা হয়। প্রাচ্য সাহিত্যতাত্ত্বিকরা দেখা ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নাটক আবার উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক সংলাপ ধর্মী রচনা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যতত্ত্বভাবনায় দেখিয়েছেন— মানুষের কোন কোন হৃদয়ভাবেরই এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যে, কথা এবং ক্রিয়াদ্বারা তা প্রকাশ করা সম্ভব, এবং নাট্যকার সেই ধরনের ভাবই নাটকের জন্য গ্রহণ করেন। যে হৃদয়ভাব অব্যক্ত, যা কথার দ্বারা এবং ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নয়, তা যদি বিষয় হিসেবে নাট্যকার গ্রহণ করেন তাহলে কী অনর্থ ঘটে তাও বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন ভবভূতির 'উত্তরচরিত' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিবিধ প্রবন্ধের 'গীতিকাব্য' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন— "গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুর্য। ...দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনি সুগায়ক, ইহা অতি বিরল। কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপ গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূর রহিল, আগের গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" গীতিকবিতার আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃত সাহিত্যতাত্ত্বিক মতাদর্শটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই যথার্থ সাহিত্য বিচারের সূত্রপাত হয়েছে। সাহিত্য সম্রাটের সাহিত্যভাবনা ছড়িয়ে আছে নানা সৃষ্টির মধ্যে। তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথমভাগ (১৮৮৭ খ্রিঃ), 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত', 'দ্রৌপদী', 'শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসদিমোনো', বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয়ভাগে (১৮৯২ খ্রিঃ) 'ধর্ম ও সাহিত্য', 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা', 'বাঙ্গালার ভাষা'— এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মতাদর্শ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮ খ্রিঃ) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অনুশীলন অংশে মনুষ্যধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়— "সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। ... আমাদের সমুদয় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা কত ব্যাপক ও বৈচিত্রপূর্ণ, তাঁর সাহিত্য পাঠ করলেই তা বোঝা যায়। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্মকথা, দর্শন, শিল্পতত্ত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যচিন্তা কখনই নীতি বর্জিত ছিল না। তাঁর জীবনাদর্শ গোঁড়া ছিল না, বরঞ্চ তা ছিল জীবনমুখী, সমাজমুখী। আবার সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম জীবন বিমুখ রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। যদিও তাঁর লেখার মধ্যে ঐতিহাসিক রোমান্সের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বলেছেন— "চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে, সেটি কি? ... উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষসাধন চিত্ত শুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা— কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না; কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যকর্মকে শুধু আনন্দ বলে মনে করেননি। এমনকী আনন্দদানের সচেতন উদ্দেশ্য আছে কিনা তাও গ্রহণ করেননি। সর্বোপরি তিনি মনে করেন কাব্য সার্থক হলে তা চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে বাধ্য। "কাব্য মানুষের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের প্রধান সহায় এবং এই কাব্যের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।" আসলে তিনি কল্যাণ ও সুন্দর এই দুইকে একাত্ম করে পেতে চান। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন— "কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি ক্ষমতা। সেই সৃষ্টি প্রতিকৃতিমাত্র নয়।" 'সাহিত্যতত্ত্ব' এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব নির্ধারণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা পাশ্চাত্য সমালোচনা রীতির প্রয়োগ করে নতুন পথ দেখিয়েছেন। কাব্যবিচারে ভারতীয় প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতি বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সৌন্দর্য সৃষ্টিই যে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং নীতিশিক্ষা যে গৌণ এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু কল্যাণসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" (বাংলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যভাবনার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি সাহিত্য সমালোচনায় পাশ্চাত্য রীতিরও

প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি লিখেছেন— ‘‘যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর গৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে। কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ।’’ (উত্তরচরিত— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুরু করেছেন। ‘প্রকৃত এবং অতি প্রকৃত’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন— ‘‘কবিত্ব ধরিতে গেলে Paradise Lost হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চে। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষায়, কোন মহাকাব্যে আছে কিনা সন্দেহ।’’ কবি কালিদাসকে বলা হয় প্রাচ্যের শেক্সপীয়র। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়— ‘‘শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেসদিমোনা।’’ সাহিত্যমান বিচারে কালিদাসের শকুন্তলা পাশ্চাত্যের কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়রের দুই বিখ্যাত নারী চরিত্র মিরন্দা ও দেসদিমোনার সম্পূরক। শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা প্রত্যেকেই তাদের আপন গুণাবলীতে পরিপূর্ণ— ‘‘দেশভেদ বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্য হৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্য হৃদয়ই থাকে।’’ বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের এক বিশেষ অধ্যায়কে সমকাল ও উত্তরকালের পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। প্রকৃত অর্থে সমাজের প্রচলিত প্রথা, পদ্ধতি ও সংস্কার সম্পর্কে শকুন্তলা যতটা অভিজ্ঞ মিরন্দা ঠিক ততটাই অজ্ঞ এ সত্যটিই লেখক প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কালিদাসের শকুন্তলা ও কবি-নাট্যকাল শেক্সপীয়রের দুই বিখ্যাত নারী চরিত্র মিরন্দা ও দেসদিমোনার সমপর্যায়ভুক্ত।

বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের ছড়াছড়ি রয়েছে। বরঞ্চ গীতিকাব্যের প্রাধান্য বেশি। ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— ‘‘বাঙ্গালার প্রাচীন কবি জয়দেব গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আরও কতকগুলি এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য প্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্তত চারি পাঁচজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি কবি।’’ প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব সমালোচনা শক্তির স্বাক্ষর বর্তমান। লেখক বাঙালি কবি স্বভাবটিকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমন কবি জয়দেব বিদ্যাপতি সহ বাংলার গীতিকাব্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন— ‘‘সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল।’’ অতএব সাহিত্য সমালোচনার মুখ্য কর্তব্য যে রসসম্মত ভাষা দান এবং ব্যাখ্যা প্রদান এই প্রবন্ধে অনুসৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় তুলনামূলক সমালোচনার অন্যতম সাহিত্যিক প্রয়াস হিসেবে বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। অভিনব প্রচেষ্টা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দান করেছেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকুঞ্জিত কুঞ্জ, নবজলধর এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সরসীর বহুলোচন, অলসনিমেষ এই সকলের চিত্র বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে— বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়। তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে।’’

‘কমলাকান্তের দপ্তর’ (১৮৭৫) প্রবন্ধের ‘বসন্তের কোকিল’ প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন— ‘‘যে খুব সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ শরীরে

যিনি আত্মা, তাঁকেই ডাকি।" আসলে রূপের আরতি, সুন্দরের আরাধনা শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলার একমাত্র লক্ষ্য। তেমনি মানুষের জাগতিক সুখ-দুঃখ, উপভোগ, দুর্ভাগ্যের বিষয় নয়, তা কেবলমাত্র আনন্দ আর সৌন্দর্যের উৎস। যে সৌন্দর্য "প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।" (কণিকা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। আমাদের সমাজে যারা প্রকৃত মহৎ এবং উদারমনা মানবতার আলোকে আলোকিত। সূর্যের মতোই তারা মহৎ এবং বৃহৎ। ফলে তারা কাউকে ছোট মনে করে না। তাদের চোখে ছোট বড় বলে কোন ভেদাভেদ নেই। এতে করে তাদের আধিপত্য এবং সম্মান দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ছোট্ট ফুলটি থেকে পর্বতমালা সিন্ধু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তাকেই মানুষ ডেকে ডেকে ফিরেছে। যা অনাদি অনন্ত এবং অব্যয়— মানুষ তার কথায় কাব্যাদির মধ্যে জানতে চায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর কমলাকান্তও দিতে চেয়েছে শিল্প, সাহিত্য, জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর। তা হল ললিত কলার অমোঘ আহ্বান আর আমন্ত্রণ। আর যাকে ঘিরে সে হল— 'সত্যম-শিবম্-সুন্দরম্'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন প্রবন্ধ লিখেছেন, তখন গোড়াতেই ভেবেছেন দেশ ও দশের কথা। আর তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর' লেখার সময় তিনি যে গুরু বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখবেন তা তো বলাবাহুল্য। কিন্তু লেখক জানতেন যে রচনা সরস না হলে তা—

"না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল,
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।" (অন্নদামঙ্গল— ভারতচন্দ্র রায়)

ফলে কমলাকান্তের দপ্তরের প্রবন্ধগুলি লঘু বর্ণনাভঙ্গি আর গুরুতর বিষয়ের এক সার্থক যুগলবন্দী। 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে লঘু বর্ণনা গুরু বিষয়কে কতটা চিত্তাকর্ষ করতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে অধ্যাপক ব্রাহ্মণরা ধুতরা ফুল আর লেখকরা তেঁতুলের সঙ্গে যেখানে উপনীত। সস্তা বাংলা সাহিত্যকে পদী পিসির রান্নার সঙ্গে আর উন্নত বিদেশী সাহিত্যকে মুসলমান খানসামার স্বাদু রান্নার সঙ্গে তুলনা করে বঙ্কিমচন্দ্র রসবোধ আর সত্যভাষণের চরম করেছেন। আবার সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি। এই লেখকেরা অপরের বই থেকে নকল করে চড়া দামে পাঠ্য বই প্রকাশ করেন। সেই পাঠ্য বই অপাঠ্য। আর ঐসব লেখক ঢেঁকির তৈরি করা চাল অর্থাৎ 'স্কুলবুক' গিলে আজকের পড়ুয়ারা চিররুগ্ন— বদহজমের রোগী-রোগিনী। 'ঢেঁকি' প্রবন্ধে দেখা যায়— "দেখিলাম এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল।" বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্য সৃজন হয় দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে। লেখককে তাই সবুজ মন নিয়ে সদা সতর্ক হয়ে পাঠকের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সাহিত্য রচনা করতে হয়। এমনকী লেখকের রুচির উপরও নির্ভর করে সাহিত্যের গুণগত মান। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— "সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন— "সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে, কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। কিন্তু সাহিত্য যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশমাত্র।" ধর্মতত্ত্বের (১৮৮৮) ২৭ নং অধ্যায়ে উদ্ধৃত মন্তব্যটি পুনরায় দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— "কাব্যই এ বিষয়ে (চিররঞ্জিনী বৃত্তিসমূহের অনুশীলনে) মনুষ্যের প্রধান সহায়, তদ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃ প্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য কবি ধর্মের একজন প্রধান সহায়।" ঈশ্বরভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্র 'জঘন্য কোঁতপন্থী' বলে চিহ্নিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র কোঁতের মানবতার দিকটি গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরের বিমূর্ততায় বিশ্বাসী

ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে সমগ্র জগৎ সংসারে পরিব্যাপ্ত এক ব্যক্তিসত্তারূপেই গ্রহণ করেছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

> ''কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।
> তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।''

আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে কয়টি বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করেছেন লেখকের ভাষায় এইরকম।

''(ক) মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফূরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

(খ) তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

(গ) সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

(ঘ) তাহাই সুখ।''

সর্বোপরি বলা যায়, মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করে স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— ''সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।''

আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে রয়েছে লেখকের নিপুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় দক্ষ শিল্পীর মতো রং তুলির আঁচড় দিয়ে চরিত্র নির্মাণ করেছেন। চরিত্র চিত্রণে উপন্যাসিকের সাফল্য নির্ভর করে চরিত্রগুলিকে কতখানি রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র করে অঙ্কন করতে পেরেছেন। তেমনি কোনও রচনাকে কাব্যের উপযোগী করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হলে, সেখানে রস থাকতেই হবে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে— ''শাস্ত্রমতে কাব্যরস হল অমৃত।'' সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে রস অপরিহার্য বিষয়। রস ছাড়া কোন কাব্য রচনা করা অসম্ভব। রস ধাতুর মূল অর্থ হচ্ছে 'আস্বাদন করা' অর্থাৎ যা আস্বাদ্য তাই রস। সহৃদয় সামাজিক হয়ে কাব্য পাঠককে সেই রস উপলব্ধি করতে হয়। রসকে লাভ করেই মানবজীবন আনন্দিত হয়। তাই সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে হয় অন্তরের অনুভূতি দিয়ে। সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালাভাষা' প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়—''প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙালি ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারে না, এবং এতদ্দেশে অনেকদিন বাস করিয়া বাঙ্গালির সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধহয় এইরূপ প্রভেদ ছিল এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের উৎপত্তি।'' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে ভারতবাসী উজ্জীবিত হইয়াছে। তিনি সবসময়ই নিজের কলমকে সৃজনের উৎসবে ব্যস্ত রেখেছেন। মানুষকে ভালোবেসে, মনুষ্য সমাজের উন্নতির কথা ভেবে সাহিত্য রচনা করেছেন। সর্বোপরি কাব্যপাঠের উদ্দেশ্য হল আনন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রকাশকেই বলেছেন রসসৃষ্টি। সেইজন্য সব শিল্পের উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্য সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ''সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।'' তাই সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে চিত্র, স্থাপত্য, নৃত্য, সঙ্গীত ও কাব্যের আগমন। মানুষের সৌন্দর্যবোধ সুন্দরকে অনুভব করতে পারে, সুতরাং কোনো সত্তাকে সুন্দর কি অসুন্দর হবে তা নির্ভর করবে কোনো ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধের উপর। সর্বোপরি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সৌন্দর্য সৃষ্টিকে' সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য বলে মনে করলেও সাহিত্য যে 'সত্যমূলক' সে কথাও জোর দিয়ে বলেছেন।

৪১১.২.৫.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. সাহিত্যতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করো।

২. সাহিত্য ও সাহিত্যের নানা বিষয় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত ব্যক্ত করো।

৩. বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতাত্ত্বিক ভাবনায় ক্লাসিসিজম এবং রোমান্টিসিজম এর মধ্যে স্পষ্টত একটি দ্বন্দ্ব আছে, মন্তব্যটি আলোচনা করো।

৪১১.২.৫.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি বিবিধ প্রসঙ্গ — ড. রামেশ্বর শ

২. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা — অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

৩. সাহিত্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য — বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

৪. নন্দনতত্ত্বে প্রাচ্য — অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস

৫. প্রবন্ধ সঞ্চয়ণ — সম্পাদনা ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার

পত্র : বি-কোর – ৪১১

শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক ৬

রবীন্দ্রনাথ

বিন্যাসক্রম

৪১১.২.৬.১ প্রসঙ্গত

৪১১.২.৬.২ সাহিত্যের সত্য

৪১১.২.৬.৩ সাহিত্যে নবত্ব

৪১১.২.৬.৪ বাস্তব

৪১১.২.৬.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.২.৬.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৪১১.২.৬.১ প্রসঙ্গত

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নানা শাখায় অবাধ বিচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে 'সাহিত্য' রচনার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং কিভাবে তা রচিত হয়, তার ভিতরে-বাইরের নানা জিজ্ঞাসার উত্তরও খুঁজেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন; গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাগুলি আসলে সাহিত্যতত্ত্ব, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব-এর সার্বিক অন্বেষণ।

এই বিষয়ে আলোচনা চলেছে বিভিন্ন দেশে বহু যুগ ধরে। সূত্রপাত সুদূর অতীতে। পাশ্চাত্যে সক্রেটিস প্লেটো-অ্যারিস্টটল-টলস্টয়-হেগেল-মার্কস-গোর্কি-ক্রোচে-ব্রেখট-সার্ত্রে-কামু থেকে ভারতবর্ষে আচার্য ভরত-ভামহ-দণ্ডী-বামন-আনন্দবর্ধন-কুন্তক-অভিনবগুপ্ত প্রমুখ তাত্ত্বিক-আলংকারিকেরা নানা কথা বলেছেন। তবে এইসব অভিমত-ভাবনায় যে শেষ কথা বলা হয়ে গেছে তা কিন্তু নয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর মতো করে ভেবেছেন, আলোচনা করেছেন। সেই ভাবনা-আলোচনা প্রধানত 'সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনী প্রতিভা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার বিকাশে সাবলীলভাবে জটিলতাকে সরিয়ে 'তত্ত্ব'-এর তালাস করেছেন। আলোচ্য 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সৌন্দর্য-নন্দনতত্ত্বকে যেভাবে আনন্দানুভবের আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করেছেন তা নিয়েই এবার আমাদের বিশ্লেষণ পাঠ্য প্রবন্ধের অনুসরণে।

৪১১.২.৬.২ সাহিত্যের সত্য

শিল্পে-সাহিত্যে স্রষ্টা প্রকৃতিকে অনুসরণ করেন, প্রাকৃত জগতের উপাদান এমনকী প্রকৃতির সৃজন প্রক্রিয়াকেও শিল্পী তাঁর সৃষ্টি কর্মে অনুসরণ করেন— প্রকৃতি থেকে বাস্তবজগৎ ও জীবন থেকে যে উপকরণ শিল্পী আহরণ করেন শিল্পসৃষ্টির সময় তার সঙ্গে মিশে যায় তাঁর মনের মাধুরী, তাঁর কল্পনা। তাই প্রকৃতিকে অনুসরণে করেও শিল্পরূপ তাকে অতিক্রম করে যায় অনায়াসেই। শিল্প-সাহিত্য এই কারণে প্রকৃত তথ্যের হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। কবি আলোচ্য 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে বলছেন ''রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়।" এখানেই শিল্পের স্বাধীনতা—শিল্পীর স্বাধীনতা। যে-কোনো শিল্পরূপ সৃজনের ক্ষেত্রে শিল্পীর কল্পনাশক্তি বিশেষ সহায় হয় বলেই তা প্রাকৃত জগৎ থেকে গৃহীত উপাদান বা তথ্যাদিকে অতিক্রম করে যায়।

শিল্পে শিল্পী প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বিশুদ্ধ আনন্দরূপের সন্ধান দেন রসভোক্তাকে। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় বা গতানুগতিক কোনো জীবনরূপকে শিল্পী তাঁর সৃজনকর্মে অবলম্বন করেন— কিন্তু, সীমা সংহত প্রয়োজনের জগতে বিষয়কে তিনি অসীম-অনন্তের অভিমুখী করে তোলেন। কবি কীট্স গ্রীসীয় ভস্মাধারকে অবলম্বন করে যে কবিতা রচনা করেছেন— সেই ভস্মাধার প্রয়োজন সাধনেরই বিষয়, কিন্তু কবি সেই ভস্মাধারে যে শিল্পমূর্তি খোদিত দেখেছিলেন, সেই মূর্তিই যেন তাঁর মনে অসীমের দ্যোতনা এনে দিয়েছে। শিল্পীর এই যে রূপসৃষ্টির প্রবণতা এতে প্রাত্যহিকতার স্পর্শ থাকতে পারে, কিন্তু সেই প্রাত্যহিক প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়াও এই অনুপম শিল্পরূপটি মানুষের মনকে অনন্তের, অসীমের অভিমুখী করে। রবীন্দ্রনাথের কথায় শিল্প হল 'Expression of Personality' শিল্পীর Individuality জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও তাঁর যে স্রষ্টা সত্তা বা personality তা শিল্পসৃষ্টির সময় এই পার্থিব সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সেই সৃজন মুহূর্তে : 'We forget the claims of necessity' এবং "the spires of our temples try to kiss the stars and notes of our music to fathom the depth of the ineffable."

॥ তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ ॥

মানুষের মন প্রতিনিয়তই যে প্রাকৃত বিষয়াবলীর মধ্যে বিচরণ করে তার দুটি দিক— একটি দিক হচ্ছে 'তথ্য' আর একটি দিক হচ্ছে 'সত্য'। কবি বলেছেন: ''যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হল সত্য।" শিল্প-সাহিত্যের সত্য প্রাকৃত জীবনের সত্য এক নয়। ইতিহাস সত্য কারণ, ইতিহাস যা ঘটে গেছে অর্থাৎ পুরাঘটিত তার বিবরণ দেয়। দর্শনের (Philosophy) বিষয়াদিও সত্য— কেননা চিরন্তনের উপস্থাপনা থাকে দর্শনে। কিন্তু ইতিহাসের যে সত্য তা ঘটনানির্ভর এবং ব্যক্তিক, দর্শনের যে সত্য তা ঘটনানিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিক। শিল্প-সাহিত্যের সত্যতা তার মধ্যেই নিহিত। এই সত্যকেই গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর poetics গ্রন্থে বলেছেন probability বা সম্ভাব্য। যা অতীতে ঘটেছে—এবং যা বর্তমানে ঘটে চলেছে। একজন শিল্পী তাকেই গ্রহণ করেন শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে, কিন্তু যা ঘটেনি, অথচ ঘটলেও ঘটতে পারে (what may happen), ঘটা খুবই স্বাভাবিক— সেই সম্ভাব্যতাকেই গুরুত্ব দেন শিল্পী। আর তখনই শিল্পসৃষ্টির বিষয়টি প্রাকৃত হয়েও শিল্পীর মনোলোকে প্রবিষ্ট হয়ে নতুন মাত্রা লাভ করে। প্রকৃতি থেকে পাওয়া, জীবন থেকে সংগ্রহ করা শিল্পসৃষ্টির উপাদানগুলির মধ্যে যে ফাঁক থাকে শিল্পী তাকে পূর্ণ করে দেন তাঁর কল্পনা দিয়ে। যে শিল্পরূপ তিনি সৃষ্টি করেন, তা প্রকৃতি জগতের হয়েও শুধুই সেটুকুকেই অঙ্গীকার করেন না; কারণ বহির্বিশ্ব

থেকে সংগৃহীত শিল্পসৃষ্টির উপকরণগুলির অপূর্ণতা-অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে তুলছেন শিল্পী নিজের দক্ষতায়। শিল্পে কোনো বস্তু যে সত্য তা নির্ণীত হয় রসের ভূমিকায়। শিল্পীর হৃদয়লোকের স্পর্শেই কোনো বস্তু 'সত্য' হয়ে ওঠে। সে বস্তু এমন একটি রূপ-রেখা-গীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে, যাতে মানুষের মন আনন্দের মূল্যে তাকে 'সত্য' রূপে বরণ করে নেয়—এখানেই সেই শিল্পরূপটি সৃজনের সার্থকতা, 'তথ্য' রূপে সেই বস্তু বা বিষয়টি যদি একেবারে 'যথাযথ' হয়—তাহলে অরসিকের প্রশংসা লাভ করলেও প্রকৃত রসভোক্তা তাকে একেবারে বর্জন করেন। 'তথ্য' মূর্ত করে তোলে 'বিশেষ'কে। আর 'সত্য' অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যের 'সত্য' তথ্যকে অবলম্বন করে নিশ্চিতভাবেই কিন্তু; অবলম্বন করেও তাকে অতিক্রম করে যায় অনায়াস দক্ষতায় 'বিশেষ'-এর মাধ্যমে 'নির্বিশেষ'-কে রূপঋদ্ধ করেন। কবি বলেছেন— "ঘোড়ার ছবি যে ঠিক ঘোড়ার মতোই হয়েছে তা প্রমাণ করতে দেরী লাগে না। ...ছবিতে ঘোড়াকে যদি ঘোড়ামাত্রই দেখানো হয় তাহলে পুরোপুরি হিসেব মেলে। আর, ঘোড়া যদি উপলক্ষ হয়, আর ছবিই যদি সত্য হয় তাহলে হিসেবের খাতা বন্ধ করতে হয়।"

॥ রসবস্তু ও তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এক মূল্য নয়॥

রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পের রূপ সার্থক হয় রসে। রসই হল আনন্দ। সে রূপ কেবলমাত্র বহিরঙ্গ বিষয়কেই আশ্রয় করে, যথাযথের হুবহু উপস্থাপন করে যদি সেই 'রূপ'টি 'শিল্প' রূপে পরিগণিত হয় না। শিল্প হুবহু-র উপস্থাপন নয়। কোনো কিছু তৈরি করা হয় বাস্তব প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে—কিন্তু, 'সৃষ্টি'-র মাধ্যমে শিল্পী নিজেকেই প্রকাশ করেন কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের তাগিদ এতে থাকে না। শিল্পসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ তাই নির্মাণ (Constructive) বলেননি, বলেছেন 'নির্মিতি' (Creative)। যে রূপ রসসৃজনে সমর্থ নয়, তা যথার্থ শিল্পরূপ নয়— রবীন্দ্রনাথ এই রূপকারকে শিল্পীর মর্যাদায় ভূষিত করেননি, তিনি নিতান্তই craftsman। Artist-এর মতো স্বরাজ্যের অধিপতি নন তিনি। প্রাকৃত জগতের সত্য শিল্পীর কাছে প্রথমে 'মানসিক' হয়ে ওঠে, সেই মানসিক সত্যই পরে হয়ে ওঠে বিশ্বমনের। বাস্তব জগৎ ও জীবন তাই অবিকৃত রূপে শিল্পসৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে না। 'রূপদক্ষ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'প্রয়োজন এবং জ্ঞানের সম্বন্ধ ছাড়াও মানুষের সঙ্গে বিশ্বের অন্য সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধেই রূপসৃষ্টি।... এইখানেই আর্টের মূলতত্ত্ব। আর্ট মানে কেবল চিত্রকলা নয়—মানুষের বিচিত্র রসসৃষ্টির কাজ।' আর এটি সম্ভব তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি পেলেই। 'রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়।' রবীন্দ্রনাথের মতে, জগতের উপর বসে মনের কারখানা, মনের কারখানার উপরেও আছে বিশ্বমনের কারখানা। সাহিত্যের-শিল্পের সৃজন সেই উপরতলা থেকে। যে তথ্য মাত্র ছিল 'বিশেষ' তাই হয়ে ওঠে 'নির্বিশেষ'। শিল্পরূপে অভিযাত্রা তাই রসলোকে। এই যে রূপকে আশ্রয় করে রসে নিমজ্জনে শিল্পরূপের সার্থকতা, সত্যে উপনীত হওয়া। এ থেকে সহজেই উপলব্ধ হয় যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সত্য বলতে তথ্যের সত্য থেকে উন্নীত বিষয়কে বুঝিয়েছেন—তথ্যের উপর সত্যের প্রাধান্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন;—

"তথ্য জগতের যে আলোকরশ্মি দেওয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতের সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না।"

শিল্প-সাহিত্য উপলব্ধির জন্য চাই সহৃদয় 'হৃদয়সংবাদী'কে। যিনি বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থের মধ্যে যে পার্থক্য তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারেন। বিদ্যাপতির 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু তবু হিয় জুড়ন ন গেল'—এ পংক্তিতে যে লাখ লাখ যুগ ধরে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগের কথা বলা হয়েছে তা তথ্যের বিচারে অসম্ভব। 'রূপের পাথারে' সত্যি সত্যি 'আঁখি' ডুবিয়ে দেওয়া যায় কী না বা 'যৌবনের বনে'র মধ্যে মন

হারানো প্রকৃতই সম্ভব কী না, এ বিচার যাদের দৃষ্টি কেবল তথ্যপুঞ্জের মধ্যে সীমাসংহত তাদের। আভিধানিক অর্থ বা তথ্যসীমা অতিক্রান্ত হলেই প্রকৃত রসলোকে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে, ছলে-বলে-কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে। দুর্গের পাথরের গাঁথুনি দেখাবার কাজ তো কবির নয়।' শিল্পরূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাই ব্যঞ্জনা বা suggestion খুবই জরুরি। স্রষ্টা তার রূপসৃজনে যতটা বলেন তার থেকেও বেশি বলিয়ে নেন রসিককে দিয়ে। শিল্পের ভাষা তো সংবাদ পরিবেশনের ভাষা নয়—'যে কোনো শিল্পরূপের যা বক্তব্য তা শুধু দর্শক-পঠককে জানিয়েই সার্থক হতে পারে না—একইসঙ্গে তাদের হৃদয়কে বহির্বিশ্বের তুচ্ছতা থেকে উর্ধ্বে উন্নীত করে—রসগ্রহীতাকে প্রাণিত করে। তাই, শিল্পের ভাষাকে হতে হয় ভাবগর্ভ-ব্যঞ্জনাবাহী-ইঙ্গিতধর্মী। তখনই তথ্যের অপলাপ ঘটলেও সত্যের দাবি প্রধান হয়ে ওঠে। তাই তথাকথিত অবাস্তব বিষয়গুলি যেমন—'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু' বা 'Ten thousand daffodils saw I at a glance' বা 'যব গোধূলিসময় বেলি/ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,/নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্বপসারি গেলি' ইত্যাদি ছন্দবন্ধে, বাক্য বিন্যাসে, উপমা-সংযোগে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে এমন একটি সমগ্রতার রূপ পরিগ্রহ করে যা মূল বিষয়ের অতীত এবং অনির্বচনীয় শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বমানবমন থেকে। পার্থিব বিষয়কেই 'মন'-শিল্পীর মন গ্রহণ করে রূপসৃষ্টির অনন্য উপকরণ রূপে—আর সেই মানসসত্যকেই এমন একটি 'বিশেষ' রূপে উপস্থাপিত করেন যখন তাকে আর বহির্বিশ্বের কোনো বিশেষ উপকরণ বা ব্যক্তিক কোনো বিষয় বলে চিহ্নিত করা যায় না—তা হয়ে ওঠে সমগ্র মানবের। সাহিত্যের সত্য তাই প্রামাণ্য নয়—"সার্ভে বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চারদিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিল্‌পে" গেঁথে সাহিত্যের সত্য, truth (fact নয়)-কে নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাই জানিয়েছেন অসাধারণ রূপে:

> "সেই সত্য যা রচিবে তুমি
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
> কবি তব মনোভূমি
> রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

৪১১.২.৬.৩ সাহিত্যে নবত্ব

'সাহিত্যের পথে'-র অন্তর্গত 'সাহিত্যে নবত্ব' (জাভা থেকে বালি যাবার পথে ৬ ভাদ্র, ১৩৩৪-এ রচিত), প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল, 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)। আধুনিক সাহিত্যিকদের গণসমর্থন লাভের মানসিকতাকে তিরস্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে। যশোপ্রার্থী সাহিত্যকারদের কারণেই যে সাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমে ঊষর হয়ে উঠছে, প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি থেকে শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল করে তুলছে সেই কথাও ব্যক্ত হয়েছে এই প্রবন্ধে। নব্যযুগের সাহিত্য-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অভিমত-দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে এই প্রবন্ধে।

সাহিত্য বা শিল্পকলার সৃষ্টি এবং উপভোগের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যিনি দিচ্ছেন অর্থাৎ সৃজন যিনি করছেন তাঁর লক্ষ্য কিন্তু রসজ্ঞ উপভোক্তা—সাহিত্য রচনায় পাঠকের যে বিশেষ একটি ভূমিকা আছে সেই চিরন্তন সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রাবন্ধিক 'সাহিত্যে নবত্ব'-শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনাতেই—

'যে লোকের অন্তরেই বিশ্বশ্রোতার আসন তিনিই বাইরের শ্রোতার কাছ থেকে নগদ বিদায়ের লোভ সামলাতে পারেন। ভিতরের মহানীরব যদি তাঁকে বরণমালা দেয় তাহলে তাঁর আর ভাবনা থাকে না, তাহলে বাইরের নিত্যমুখরতাকে তিনি দূর থেকে নমস্কার করে নিরাপদে চলে যেতে পারেন।'

শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম দেশকালের উর্ধ্বে বিরাজিত যে চিরন্তন মানবমন তার মুখাপেক্ষী। কবি বলছেন যে, সমাজে এই শ্রেণির পাঠক রসগ্রহীতা বা সমালোচকের সংখ্যা বেশি সেই সমাজে সাহিত্যকারের শক্তিও অনেক—এবং সেই শক্তি কোনো নেতিবাচক নয়। পাশ্চাত্যের যে শিল্প-সাহিত্যের বোধ তাতেও এই বিশ্বমানব হৃদয়ের চিরায়ত দাবিই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে শিল্পকলায় সমসাময়িকের সরাসরি প্রকাশকে গ্রহণ করতে পারেননি, তাই কবির মতে, লেখকের মনে যদি বিশ্বমানবমন—যে মানবমন দেশকালের অতীত—তার প্রবেশাধিকার থাকে তাহলে তিনি বাইরের শ্রোতাদের-পাঠকদের অনুরোধ উপরোধে 'নগদ-বিদায়ের লোভ' সম্বরণ করতে সক্ষম হবেন। কবির মতে, বিশুদ্ধ শিল্প-সাহিত্য উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ। শিল্প-সাহিত্যের বাহ্য উপযোগিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'গরজের ফরমাশ' বলেছেন। আর, কবির মতে, তখনই "ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেকচারার, সোসিওলজির গোল্ড মেডালিস্ট সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় করে ধর্না দিয়ে বসেন।" সাহিত্যে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব বা দেহতত্ত্বের প্রবেশাধিকার থাকবে না,—এমনটা ঠিক বলা চলে না। কারণ, কোনো সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সেই সমাজের মানবিক সম্পর্কের দিকগুলিকেও প্রভাবিত করে। কবির মতে, সাহিত্যের বিষয়ই হল মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র। এই মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র সন্দেহাতীত ভাবেই দেশ-কাল অর্থাৎ সাম্প্রতিকের দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই, সাহিত্যে জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সামাজিক বিশেষ কোনো পরিমণ্ডল, বা জৈবিক-শারীরবৃত্তীয় বিষয়াবলীর প্রসঙ্গ আসতেই পারে, কিন্তু তা যেন যথার্থ শিক্ষিত হয়েই আসে। কারণ, কোনো একটি ভালো কবিতা বা ছোটগল্পে সরাসরি 'ইকনমিক্‌স', 'সোসিওলজি' বা 'বায়োলজি'র অধ্যাপকের জ্ঞানগর্ভ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়াদি আশা করবেন না পাঠক। সাহিত্যিক প্রবহমান জীবনের যে-কোনো বিষয়কে অবলম্বন করতে পারেন এবং সাহিত্যে যখন তাকে রূপায়িত করেন তখন তা আর বর্তমানকালে সীমাবদ্ধ থাকে না। কোনো এক বিশেষ মুহূর্ত বা খণ্ডকাল থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাকে শাশ্বত কালের জন্য গড়ে তুলতে হলে সুবিশাল নিরবধি কালসীমার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান অবশ্যই প্রয়োজন। ক্ষণকালের কিংবা বর্তমানের মাপকাঠিতে তাই কাজ চলে না। অর্থনীতি, শারীরবিদ্যা বা সমাজতত্ত্বের যে-কোনো বিষয়ই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি তাকে শাশ্বত কালের উপযুক্ত করে গড়ে নিয়ে আসা হয়। তা না হলে সোসিওলজি, বায়োলজি পাঠ্যবই-এর সঙ্গে সাহিত্যের কোনো বিশেষ রূপের তফাত করা যাবে না। লেখকের বা শিল্পীর 'মানবত্ব' বা সৃজনী প্রতিভা এ সবকিছুকে আপনার করে নিয়ে ক্ষণকালের বস্তুকে চিরন্তন করে তোলে।

সাহিত্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়া তথা প্রাকৃতজগতের সঙ্গে সাহিত্যজগতের সম্বন্ধ বিচারে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতজগতের উপরে আছে মনের কারখানা—প্রকৃতি থেকে সেখানে বিভিন্ন উপকরণ বা উপাদান গৃহীত হচ্ছে। সাহিত্যিকের মন যাকে বলা হচ্ছে 'নিজত্ব' তা কেবলই সংগ্রহ করছে। পার্থিব যে-কোনো বিষয়ই এখানে প্রবেশ করতে পারে। বিশ্বমানবমন তথা 'মানবত্ব' অংশে চলে ঝাড়াই-বাছাই, গ্রহণ-বর্জন, সম্পূরণ-সংশোধন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়া। সাহিত্যের বিষয় যেহেতু মানবহৃদয়-মানবচরিত্র সেইহেতু মানুষের জীবনের মূল সমস্যা যে যে বিষয়ে কেন্দ্রীভূত—সাহিত্যকার উপেক্ষা করতে পারেন না সেই বিষয়াবলীকে। তাই, সোসিওলজি বা বায়োলজির বিষয় সাহিত্য-শিল্পের অঙ্গীভূত হতেই পারে, তবে বিচ্ছিন্নভাবে নয়—জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, জীবনের সমস্যা বা তার সমাধানের ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলির ভূমিকা কীভাবে উপস্থাপিত হতে পারে সেই দিকগুলিকে

শৈল্পিকভাবে উপস্থাপিত করলে তাও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে। কারণ, পরিবেশ-পরিপার্শ্ব পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করে গড়ে ওঠে মানবমন ও মানবচরিত্র। যা সাহিত্যিকের অন্যতম বিচার্য-বিষয়, বিশেষভাবে অবলম্বনের বিষয়। মানবিক স্তরের যে-কোনো বিষয়ই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তার বিচার তখন হওয়া উচিত শিল্পের নিরিখেই।

॥ চিরন্তনকে নতুন করে প্রকাশ করাই সাহিত্যের 'ওরিজিন্যালিটি'॥

পাশ্চাত্যে যে শিল্প আন্দোলনের প্রকাশ লক্ষিত হচ্ছে তার প্রভাব দেশীয় সাহিত্য-শিল্পকলায় পড়ছে বা সহজেই পড়তে পারে বলে তিনি সাহিত্যের প্রাঙ্গণে অর্থনীতি-সমাজনীতি বা শারীরবিদ্যার পণ্ডিতদের অবাঞ্ছিত মনে করেছিলেন। 'সাহিত্যধর্ম' নামক প্রবন্ধেও তিনি গণসমর্থন লাভের জন্য যেসব সাহিত্য স্রষ্টার বাসনা তাদের তিরস্কার করেছেন, অতিরিক্ত গণসমর্থনের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে 'হাটের হট্টগোল' সৃষ্টি হবে তা-ও জানান।

জ্ঞানের বিষয়ও সত্যবস্তু, তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, দেশকালে তার রূপ এক হৃদয়ের রঙেও তাকে রক্ষিত করে তোলার সুযোগ নেই। যেসব বিষয় অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর-রঙ-ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হয়ে উঠলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, তাই সাহিত্যের সামগ্রী সাহিত্যের বিষয়। এ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ চিরন্তনকে নতুন করে প্রকাশের কথা বলেছেন। পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বজগৎ আমাদের মনোলোকে যে ছায়া ফেলে, তার সঙ্গে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে আমরা মনের মধ্যেই এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করি। সেই জগতে তাই যেমন থাকে বহির্জগতের তথা প্রাকৃত জগতের প্রতিচ্ছায়া, তেমনই থাকে আমাদের অনুভূতি দ্বারা অধিগত অথবা অভিজ্ঞতালব্ধ হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রস। ফলে, অনিবার্যভাবেই, বহির্বিশ্ব আমাদের মনের মধ্যে চিত্তবৃত্তির নানা রসে, বহু বর্ণ বিভায় নব নব রূপে রূপায়িত হচ্ছে প্রতিভাত হচ্ছে। যিনি শিল্পী তিনি মনের এই নব সৃষ্ট, নবলব্ধ জগৎটিকে যুগে যুগে বিশ্বমানবহৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন বলেই চিরপুরাতন হয়েও তা নিত্য নবীন রূপে প্রতিভাত। চিরন্তন যে মানবিক আবেগ-প্রবৃত্তি তাকে নিত্য নূতন করে উপস্থাপিত করাই সাহিত্যকার-শিল্পীর কাজ। নব নব রূপে নিত্যকালের রসজ্ঞের হৃদয়ে একে প্রবাহিত করে, সঞ্চারিত করে দেওয়াতেই সাহিত্যের-শিল্পের সার্থকতা। এই চিরন্তন ভাবকে নিজের মনের জারক রসে জারিত করে, রূপের মধ্যে রূপাতীতের ব্যঞ্জনা এনে, বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তা এনে, ভাব-ভাষা-ছন্দে অভিনবত্ব সঞ্চারিত করে, তাকে সর্বসাধারণের করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে এই বিষয়েই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, দিঘি বলতে জল এবং খনন করা—উভয়ই বোঝায়। যদিও এর মধ্যে প্রয়োজনের বিষয়টি হল জল; জলের জন্যই দিঘিটি খনন করা হয়েছে। কিন্তু, এই জলের জন্য দিঘির খননকর্তার কোনো কৃতিত্বই নেই। জল মানুষের সৃষ্টি নয়—তা চিরন্তন, কিন্তু কোনো কীর্তিমান মানুষ সর্বসাধারণের উপভোগের জন্যই দিঘিতে খনন করে, তাকে সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে দিয়ে সেই জলকে, অন্যের সহজলভ্য করে দিলেন, অর্থাৎ যে জল আগেও ছিল, খননকর্তা তাকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা হল,—বিষয় (Subject), ভাব (Idea) বা তত্ত্ব (Theory)। এটি বরাবরের— চিরন্তন, সর্বসাধারণের অধিকারভুক্ত। লেখক তাকে নূতনভাবে আবিষ্কার করে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: ''ভাব সেইরূপ মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় রচনাই লেখকের কীর্তি।'' এবং এখানেই এর অপূর্বতা বা Originality।

ভাষাকে ‘বেঁকিয়ে-চুরিয়ে’, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবকে মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে ‘ডিগবাজি খেলিয়ে’, পাঠকের মনকে ‘ঠেলা মেরে’, চমকে দেওয়াতে কোনো সাহিত্যিক উৎকর্ষ যে নেই, সেই ধারণাতে স্থিতধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। য়ুরোপীয় সাহিত্যে সমসাময়িক কালে যে সেই ঘটনাই ঘটছে এ কথাও তিনি প্রকাশ করেছেন।

মহৎ ও তুচ্ছ, ‘ভালো’ ও ‘মন্দ’-র ভেদ অস্বীকার করে কোনো কিছু না-মানাকেই, যারা বিশেষ করে মানে, তারা পৌরুষের নামে প্রশ্রয় দেয় কাপুরুষতাকে।

এই প্রসঙ্গেই ‘সাহিত্যে নবত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধে এসেছেন ডাডাইজম্-এর কথা, পাঠকের মনকে চমকে দিতেই এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্যে। জুরিখে ট্রিসট্রানৎসারা, মার্সেল ডুকাম্প, ফ্রান্সিস লিকরিয়া-রা উনিশ শতকের শেষ দশকে এই সাহিত্য ভাব-আন্দোলন গড়ে তোলেন। ডাডাবাদ মানুষের মনের অবচেতনের স্তরটিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল। পূর্বানুসরণ-পূর্বানুবর্তন থেকে সরে এসেছিল তারা—প্রত্ন ঐতিহ্য-মূল্যবোধকে নির্বাসিত করে। মানুষের সব চিন্তা, ভাবনা যেহেতু সরলরৈখিক নয়—মানুষের মন যেহেতু অজস্র বিপরীতমুখী আবেগের সমাহার—সব চিন্তা ভাবনা স্বচ্ছ-স্পষ্ট-দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ-সুসংলগ্ন নয় তাই কাব্যে-সাহিত্যে-শিল্পে যে সমস্ত ভাব (Idea)-ভাবনা (Thought)-কে সুস্পষ্ট করে তুলবে, চিন্তার জগতে পারম্পর্য থাকবে, কোনো উল্লম্ফন থাকবে না, ছন্দোবদ্ধ পদে চিন্তা করে চলবে—এমনটি তো হতে পারে না। সেই মানুষের সৃষ্ট চরিত্রেরাও তাদের স্রষ্টার একাধিপত্য স্বীকার করে নেবেন, এমনটি হতে পারে না—তাই, তাদের মতে, সাহিত্যের আঙিনায় যা ঘটে চলেছে তা মিথ্যাচার। রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় আলোচ্য প্রবন্ধে এই আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে—‘জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্য ধারায় নৌকো চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে-অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ।’ পাশ্চাত্যের এই সাহিত্যান্দোলন তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘চৈতন্যের বিকার’ এবং এদের সাহিত্য সৃষ্টিতে ‘আলাপের চেয়ে প্রলাপই অধিক’।

পাশ্চাত্য সাহিত্য যে তাদের এই বিকার থেকে উত্তরণের শক্তি খুঁজে পাবে—সেই বিশ্বাস ছিল কবির। কিন্তু, পাশ্চাত্যের অনুসরণকারী বাংলা সাহিত্যে এর যে প্রভাব দেখা দেবে তা কাটিয়ে ওঠা খুব সহজসাধ্য নয়—‘বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই বলেই সে হাল আমলের নূতনত্বের ও কতকগুলো বাঁধি বুলি’ সংগ্রহ করে রাখে। শক্তির এক নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা দুঃসহ বলে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। শক্তিহীন ‘বাঁধি বুলি’ আর ‘বাঁধা গত’-কে অবলম্বন করেই তাই প্রবহমান সাহিত্য এগোতে থাকে। স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবে তার এই এগোনোর মধ্যে বীরত্বের বীর্য প্রকাশ প্রায় থাকে না বললেই চলে—কারণ, বাহাদুরি আর সাহসের মধ্যে ভেদ অনেক।

‘ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।’

রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধটি যে সময় লিখিত হয়েছে সেই সময় বাংলা সাহিত্যে কল্লোল গোষ্ঠীর লোকেরা নিজস্ব চিন্তা ও মতাদর্শ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুজ রবীন্দ্রপ্রভাবিত লেখক-কবিদের ভাব ও ভাবনার বলয় থেকে সরে এসে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই নব্য আন্দোলন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাব আন্দোলনকে অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁরা। বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কার ও তত্ত্ব-তথ্যাদিও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল। এ সব কিছু রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেনি কখনো। কারণ তিনি সহজেই গ্রহণ করতে পারতেন নবীনকে। তাই সহজ ভাবেই বলতে পেরেছিলেন—‘তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে

সাহসিক অধ্যবসায় দেখে বিস্মিত হয়েছি। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই।... বোঝা যায় যে বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হইনে।' এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, রবীন্দ্রনাথ নূতনকে স্বাগত জানিয়েছেন অকুণ্ঠভাবেই। কিন্তু, যে কবি বা লেখক প্রকৃতপক্ষেই শক্তিহীন তাদের পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, কৃত্রিম ভাব-ভাষার-আবেগের যথেচ্ছ প্রকাশ তাঁকে পীড়িত করেছিল। গভীর কল্পনা, বলিষ্ঠ ভাব-চেতনাই তথাকথিত কবি-সাহিত্যিকদের এই পথে ঠেলে দেয় বলে কবির বিশ্বাস। বিলিতি পাকশালায় তৈরি রিয়্যালিটির কারি পাউডার দিয়ে তারা তাদের সৃষ্টির অক্ষমতাকে আড়াল করতে চাইছে। 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী'-র কাছে উপভোগ্য-আস্বাদ্য করে তুলতে চাইছে। এই মনোভাব—এই দৃষ্টিভঙ্গীই কবির কাছে 'নির্লজ্জ' বলে মনে হয়েছে। 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' ও 'লালসার অসংযম' এই দুটিই এখন সংস্থিত হচ্ছে সাহিত্যের-কাব্যের প্রাণকেন্দ্রে। কাজেই কাব্য-সাহিত্যকে স্বাভাবিক গতি প্রদান করতে গিয়ে এই শ্রেণীর লেখকেরা তাদের স্বাভাবিকত্বকেই হরণ করে নিচ্ছেন। লেখক বা শিল্পী সাহিত্যে রিয়্যালিটি বা বাস্তবতার প্রকাশ ঘটাতে সমসাময়িক সময়পর্বের অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের ছবি আঁকেন। যে জীবনের ছবি তিনি আঁকলেন সেই জীবনে অথবা পরিবারের সঙ্গে কাজে কথায় তাঁর সত্য আত্মীয়তা না থাকলে, দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনরূপ বর্ণনা করা অনেকটাই পরিণত হবে—'শৌখিন মজদুরি'তে। তা না হলে এ হয়ে উঠবে ভাবের ঘরে চুরির নামান্তর। 'লালসা'-বিষয়টিকে সাহিত্যের-শিল্পের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। খুব সহজেই মানুষের আদিমতম এই প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টায় অনেকে অধনী কিন্তু, এও কৃত্রিম সস্তা প্রয়াস বলেই তাঁর অভিমত। বাহ্যেন্দ্রিয়ে যা নেহাতই শরীরকেন্দ্রিক এবং যেখানে 'মন' নামক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের উপস্থিতি নেই সেখানে লালসাব্যঞ্জক সাহিত্য অনায়াসে ইন্দ্রিয়ে সাড়া জাগায়। কিন্তু এ হেন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে আপাতদৃষ্টিতে যে পৌরুষ, যে সাহসের প্রকাশ তাকে রবীন্দ্রনাথ নির্লজ্জতা বলেছেন।

তাই রিয়্যালিটির কারি পাউডার দিয়ে সাহিত্যকে উপভোগ্য-স্বাদু করে তোলার চেষ্টা কেউ কেউ করলেও তাকে 'সস্তা বীরত্ব' বলেই অভিহিত করেছেন লেখক। 'যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে, সাহস আছে, বাহাদুরি নেই।' একেই রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যিক কাপুরুষতা' বলেছেন, কারণ, 'দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে তাহলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিতমতো কাজ চালানো যায়।' নূতন যুগের সাহিত্যকারদের শক্তিশালী-বলিষ্ঠ-দৃপ্ত কল্পনা-প্রতিভাকে-সামর্থ্যকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিন্তু, 'তাল ঠোকা পাঁয়তাড়া মারা পালোয়ানি' বা 'বাঁধি গতের' 'বাঁধা বুলি'-র পৌনঃপুনিকতা বা 'নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রাপালা'-র সাহিত্যিক প্রকাশের প্রতি কবির বিরাগ ছিল। নব্যতন্ত্রীদের প্রতি তাই তিনি সতর্কবাদী উচ্চারণ করেছেন:

"যেখানে না মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষেই সবচেয়ে অযোগ্য।"

৪১১.২.৬.৪ বাস্তব

শিল্প-সাহিত্যের সার্থকতা রসের জগতে। রসই নিত্যবস্তু—'বাস্তব' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সত্যের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কল্লোলের কালের লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-সাহিত্যে অন্তঃসারশূন্য

ভাবলোক, রসলোক এবং জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-পঙ্কিলতার দিকটির অনুধাবনে সাহিত্যে উপস্থাপনে রবীন্দ্রনাথের অনীহা, অক্ষমতা, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যলোক, আনন্দবাদকেই ধ্রুব বলে গ্রহণ করার মানসিকতাকে আক্রমণ করেছিলেন তীব্রভাবে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকায় তার উত্তরেই কবি সবুজপত্রে লিখেছিলেন—'বাস্তব', 'কবির কৈফিয়ৎ', 'সাহিত্যধর্ম' ইত্যাদি প্রবন্ধ। 'বাস্তব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩২১-এর শ্রাবণে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিষয়রূপে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছিলেন 'ভাবের বিষয়'-কে। 'ভাব'-কে তিনি হৃদয়ধর্মী অনুভূতি জাতীয় বৃত্তি তথা প্রজ্ঞাবৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যের-শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য আনন্দ— এই ছিল তাঁর অভিমত। যা আনন্দকর—রবীন্দ্রনাথের কাছে সেটিই সুন্দর। জীবনের অপরাপর মূল্য থেকে যে সৌন্দর্য বিচ্ছিন্ন,—রবীন্দ্রনাথ তাকে তিরস্কার করেছেন। তাঁর কাছে 'আনন্দ' ও 'সত্য' যেমন অভিন্ন, তেমনি 'সত্য' ও 'সামঞ্জস্য'ও তেমনি অভিন্ন। সৌজন্য-সামঞ্জস্য—একেই তিনি বলেছেন 'সুন্দর'। আবার তাঁর কাছে এটা কল্যাণও। ''সাহিত্যের মধ্যে কোনো বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রসবস্তু।" রবীন্দ্রনাথ 'রসবস্তু'—এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করলেন যেভাবে বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ 'বাস্তব'-শব্দটির উদ্ভব বস্তু থেকেই আর সেই 'বস্তু' যাকে সাহিত্যের মধ্যে খোঁজা হয় সেটি বল রসবস্তু—কবির অভিমত এটিই। রবীন্দ্রনাথ সেই 'বস্তু'-তাকেই সাহিত্যে গ্রহণ করার কথা বলেছেন যে, বস্তুর রস সৃজনের রস সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট প্রাকৃত জগৎ বা বাস্তব জগৎকেই কবি সাহিত্যিক-শিল্পী তাঁর মনে গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাকে নিজের মনের রসে জারিত করেন, তখন সৃষ্টি হয় এক নূতন জগতের যা বাস্তব জগতের হয়েও কবির-শিল্পীর কলাকৃতিতে অনেকটাই রূপান্তরিত। পাঠক-দর্শকের কাছে তখন তা অপ্রত্যক্ষ জগতের চিত্র বলেই প্রতিভাত হয়। বাস্তব জগতের যা কিছু অপূর্ণতা-খণ্ডতা কিংবা শূন্যতা থাকে যা পাঠকের কাছে পীড়াদায়ক বলে মনে হতে পারে, তাকেই কবি অতিশয়োজিত মধ্য দিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে, অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে, তার পূর্ণতা সাধন করে, পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। বস্তুতপক্ষে, মনই প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করে নেয়; সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করে তোলে। সেই বস্তুকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'গ্রাহ্য' বলে মনে করেছেন যা পাঠকের রসানুভূতির জাগরণ ঘটায়।

'নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে, সেটা মাপকাঠির আয়ত্বাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়!' 'বস্তু' শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ একটু স্বতন্ত্র অর্থমাত্রা দিয়েছিলেন যার ফলে কল্লোলের রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর চিন্তা চেতনা ছিল বিপরীতশায়ী। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই অভিমতে প্রত্যয়ী ছিলেন যে, দেশের সমাজ-যুগধর্মকে অস্বীকার করলে বাস্তবকেই অস্বীকার করা হবে। আর এই বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস বৃথা। তিনি আরও বলেছিলেন যে, সাহিত্যের যে সাধনা এবং সৌন্দর্যের যে প্রকাশ দেশে দেশে, যুগে যুগে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বাস্তবের মধ্য দিয়ে সে সাধনা বিভিন্ন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এই মতটিকেই খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন: 'বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা-ওবেলা বদল হইতে থাকে।' আর, দেশে দেশে যুগে যুগে 'বাস্তব' বিভিন্ন হলে সাহিত্যের মূল্য বস্তুর বাজারদরের মতো এবেলা ওবেলা ওঠা নামা করত। উদাহরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণসভা এবং কায়স্থদের পৈতে গ্রহণের মতো একটি বাস্তব বিষয়কে উপস্থিত করে 'পৈতাসংহার কাব্য' নামে একটি কাল্পনিক কাব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করে বলেছেন—'তাহার বস্তুপিণ্ডটা ওজনে কম হইল না, কিন্তু হায়রে, সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাহার আসন রাখিয়াছেন না পদ্মের উপরে।' যা খাঁটি বস্তুতন্ত্র তা কখনোই সানন্দে গৃহীত হয়নি মানুষের মনে—যা মানুষকে

আনন্দ দেয়, মুক্তির আস্বাদনে উদ্বোধিত করে রসলোকে, তাকেই আমরা মনের ভিতর থেকে গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকলায়, রসকলায় তাকেই একান্তভাবে কামনা করেছিলেন যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞা নিরূপণে আমরা অসমর্থ—যাকে কেবল অনুভব করা যায়, সেই অনুভববেদ্য বিষয়টির প্রকাশ সার্থক হলেই রসলোকে নিজেকে উন্নীত করে সে। 'কল্লোল' পত্রিকা-কে কেন্দ্র করে যে রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, তারা 'বউঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ'—এই সব উপন্যাসে বস্তুতন্ত্রের অভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রূপ-রসনিরপেক্ষ নগ্নতাই যে সাহিত্যের বাস্তব এ কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তথাকথিত বাস্তববাদীরা। তাই তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসগুলির কোনো বস্তুমূল্য ছিল না। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'বাস্তব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—'আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল গোরা উপন্যাসে।' যারা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতার দিকটিকেই সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তারা এর মধ্যে সমসাময়িককালের ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। অথচ, সমসাময়িক বিষয়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বাসকে অতিক্রম করে এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র যে উপলব্ধি, যে আনন্দের স্তরে পৌঁছেছে সেই দিকটিকে সেভাবে তারা গুরুত্বই দেননি। 'ডাকঘর' এবং 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট আর্ট-এর নিদর্শন উপস্থাপিত করলেও, তাতে যে তিনি শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এ কথা জানিয়েছেন তথাকথিত বাস্তববাদীরা।

'উপরন্তু লোকশিক্ষার কী হইবে। সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।'

জীবনে বস্তুবাদী সাহিত্যের ভূমিকা বা সাহিত্যে উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গটি এখানে আসে। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'লোকহিত' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—'সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরকালই সাধারণ মানুষ আপন অন্তরের তাগিদে সাহিত্যসৃষ্টি করছে, সুতরাং আপনার উচ্চতার অভিমানে লোকের জন্য লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিতে গেলে পদে পদে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না।' 'বাস্তব' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, সমাজহিতৈষণার দায়িত্ব লেখকের নয়। প্রাকৃত জগতে যা বস্তুঘটিত, তার সত্যাসত্য নিরূপণে কোনো অসুবিধা নেই—যা কালো তা সকলের দৃষ্টিতেই কালো। কিন্তু, যা ব্যক্তিঘটিত সেখানে ঐকমত্য লাভ সুকঠিন—ভালো বা মন্দ বিষয়টি অনেকটাই আপেক্ষিক হয়ে ধরা দেয়। এই 'ভালো' বা 'মন্দ'-এর বিচারে সর্বাধিক মানুষের সাক্ষ্য আবশ্যক। কিন্তু, এটাও সত্য যে, যুগের নিরিখে, কালের বিচারে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচারবুদ্ধি, নৈতিকতা ন্যায়-অন্যায়বোধ, যুক্তি বুদ্ধিও বিবর্তিত হতে থাকে। তাই, কোনো যুগে যে বিষয়টি ভালো অন্যযুগের নৈতিক আদর্শ তাকেই ঘৃণ্য বলে মনে করতে পারে। তাই, লেখক শিল্পীকে চিরকালের মনুষ্যসমাজের মুখাপেক্ষী হতে হয়। 'পৃথ্বী বিপুলা' ও 'কাল নিরবধি'—এই বোধই লেখককে চালিত করবে সর্বকালের ভাবকে সাহিত্যে শিল্পকলায় অঙ্গীকার করতে। কাজেই লোকশিক্ষার কী হবে সে কথার জবাব দেবার দায় সাহিত্যের নয়। তাই, শিল্প-সাহিত্য থেকে যে আনন্দ লাভ করা যায় তা 'অহেতুক আনন্দ'; সাহিত্যের আনন্দের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের লাভ বা ক্ষতির কোনো সংযোগ নেই। বস্তুবাদীরা সাহিত্যের যে সামাজিক উপযোগিতার প্রশ্ন এনেছিলেন তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন দৃঢ়ভাবেই। সাহিত্য জীবনের প্রকাশ তা ঠিক প্রয়োজনের প্রকাশ নয়। সাহিত্যরূপকে আগে সাহিত্য হয়ে উঠতে হবে তারপর তার সামাজিক উপযোগিতার প্রশ্ন—এ কথাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কলাকৈবল্যবাদীদের বিপরীত মেরুতে সংস্থিত যারা ছিলেন তারাও। সেটা অবশ্য অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ।

সাহিত্য সৃজনে স্রষ্টা লাভ করেন আত্মপ্রসাদ ও পাঠক লাভ করেন আত্মতৃপ্তি। মানবমনের যে অংশকে বলা হয় 'নিজত্ব' তা, নিজের জন্য প্রাকৃতজগৎ থেকে বিভিন্ন উপাদান আহরণ করে, লেখকের 'মানবত্ব' বা সৃজনী প্রতিভা তাকে আপনার করে নিয়ে, তার খণ্ডতাকে পূর্ণায়ত করে তোলে; ক্ষণকালের বস্তুকে চিরকালীন করে তোলে। তাই শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া তথা প্রাকৃতজগতের সঙ্গে সাহিত্য জগতের সম্বন্ধ বিচারে দেখা যায় যে, প্রাকৃতজগতের উপরে বসেছে মনের কারখানা—যা প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে চলেছে। সাহিত্যিকের মন তাই নিরন্তর প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে চলেছে। এবার চলে ঝাড়াই-বাছাই, গ্রহণ-বর্জন পরিশোধনের পালা—এটি বিশ্বমানবমন তথা লেখকের 'মানবত্ব'। এটি মানব মনের সর্বোচ্চ তল—সাহিত্যকার এই তলের উপাদানেই মিলিয়ে দেন, সম্পৃক্ত করেন নিজের কল্পনা। এমন এক জগৎ তিনি সৃজন করেন যেখানে অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এক অনন্য সূত্রে ধরা পড়ে—প্রয়োজনের দৈন্য-মলিনতা সেই জগৎকে স্পর্শ করে না। শিল্প-সাহিত্য থেকে এই যে আনন্দ আমরা লাভ করি তা আত্মচেতনার অনুভূতিসঞ্জাত। সব কলাকৃতিই তাই সত্যের পথে, আনন্দের পথে প্রধাবিত। যা আগে আমাদের দৃষ্টিসীমা ও জ্ঞানের বাইরে ছিল, শিল্পসাহিত্য তাকেই আমার সামনে উপস্থিত করছে। আমরা এই আনন্দকে এক্ষেত্রে হৃদয়ে নিচ্ছি। এইভাবেই স্রষ্টা এবং রসজ্ঞ উভয়েই মেতে ওঠেন সৃষ্টির আনন্দেই, একজনের দিয়ে আনন্দ, আর অন্যজনের গ্রহণ করে আনন্দ। কারণ, রসের জগতে একজন দাতা, অন্যজন গ্রহীতা।

৪১১.২.৬.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

২. সাহিত্য বিবেক—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে জিজ্ঞাসা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. নন্দনতত্ত্ব—সুধীরকুমার নন্দী (রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গ)।

৫. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১১.২.৬.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ অবলম্বনে সাহিত্যের সত্য বিষয়ে প্রাবন্ধিক যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

২. 'রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়'—'রসের সত্য' এবং 'তথ্যের দাসখত' সম্পর্কে তোমার অভিমত জানাও।

৩. প্রাকৃত সত্য ও সাহিত্যের সত্যের যে পার্থক্য 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে অভিব্যক্ত, লেখককে অনুসরণ করে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

৪. 'চিরন্তনকে নতুন করে প্রকাশ করাই সাহিত্যের ওরিজিন্যালিটি' সাহিত্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়া তথা প্রাকৃত জগতের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ বিচার উপরের উদ্ধৃতির আলোকে আলোচনা করো।

৫. ‘বাঁধি গত’ ও ‘বাঁধা বুলি’ বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন তা ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধ অনুসরণে আলোচনা করো। সাহিত্য সৃজনে এদের ভূমিকাকে লেখক কীভাবে দেখিয়েছেন?

৬. ‘‘ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম’’—‘‘ওর মধ্যে’’ বলতে কার মধ্যে বোঝানো হয়েছে? দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম বিষয়ে প্রাবন্ধিকের অভিমত ব্যক্ত করো।

৭. রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ‘বাস্তব’ প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করো। সাহিত্যে বাস্তবতার বিষয়ে তোমার নিজস্ব অভিমত সংক্ষেপে লেখো।

৮. ‘বস্তুর দর বাজার অনুসারে এবেলা-ওবেলা বদল হইতে থাকে’—বাস্তব প্রবন্ধ অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করো।

৯. ‘রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই।’—রসের মধ্যে যে নিত্যতা আছে তা এই প্রবন্ধ অনুসরণে ব্যক্ত করো।

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক ৭
অবনীন্দ্রনাথ

বিন্যাসক্রম

৪১১.২.৭.১ অবনীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন।

৪১১.২.৭.২ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী অনুসারে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ভাবনা।

৪১১.২.৭.৩ 'সৌন্দর্যের সন্ধান'-প্রবন্ধের মূল সুর।

৪১১.২.৭.৪ 'সুন্দর' প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

৪১১.২.৭.৫ 'অসুন্দর' প্রবন্ধের মূল সুর।

৪১১.২.৭.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.২.৭.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৪১১.২.৭.১ অবনীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যিনি

"দেশকে উদ্ধার করেছিলেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন, তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।"

তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেই শিল্প সাধনার দীক্ষা পেয়েছিলেন। কারণ পিতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন আর্ট স্কুলের একজন কৃতী ছাত্র এবং পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ সে সময়ের চিত্রশিল্পে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ ১২৭৮ সালের ২৩ শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের পিতৃব্য। স্কুল ছেড়ে বাড়িতেই তিনি নানা বিষয়ে শিক্ষাচর্চা করতেন। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে এবং ইংরেজি শিক্ষার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশুনা করেন। তাঁর শিল্পসাধনা বাড়িতেই শুরু হয়। এই সময় যেহেতু তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছেন, তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব তাঁর মধ্যে পড়েছে। শিল্পসাধনার প্রথম পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ গিলাডি ও পামারের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময়ের পর থেকেই তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেন। পরে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটা মৌলিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এবং তাঁরই প্রভাবে ভারতীয় শিল্পকলা নতুনভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই অবনীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে পা রাখেন। তাঁর চেষ্টার সাহায্যেই আমরা পেয়েছি ‘‘ছবি লিখিয়ে অবনী ঠাকুর’’কে। ফলে অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে চিত্রকলা ও সাহিত্য প্রতিভার সমন্বয় সাধিত হল। অদ্ভুতভাবেই তাঁর মধ্যে ছিল মুখে মুখে গল্প বলার ক্ষমতা; তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

‘‘তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।’

‘বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী’ অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ভাবনার সুস্পষ্ট নিদর্শন। বিশ্ব সাহিত্যের অদ্বিতীয় সৃষ্টি শিল্পকলা বিষয়ক নানা বিষয় সংজ্ঞা, তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচার প্রভৃতি প্রবন্ধে রয়েছে। তিনি দুরূহ ও সূক্ষ্ম বিষয়কে সাধারণের কাছে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে তাঁর দ্বিমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদ গ্রহণ করে তিনি শুধু আমাদের শিক্ষা দান করেননি, ঋষি ও গুরুর মতোই শিল্পশাস্ত্রের দীক্ষা দিয়ে গেছেন।

এই প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁর চিত্তের প্রসারতা, তাঁর শিল্প আদর্শের সহজ সরল ব্যাখ্যার পরিচয় পাই। প্রথম দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শুধু একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। কিন্তু পরবর্তীকালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কর্মদক্ষতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে স্নাতকোত্তর বিভাগ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। পরাধীন ভারতবর্ষে এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার পঠন-পাঠনের সূচনা করেন তিনি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যাপকদের তিনি আমন্ত্রণ করেন। এমনকি ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, পারস্য, তিব্বত, সিংহল, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে জ্ঞানী, গুণী অধ্যাপকদের তিনি আমন্ত্রণ করেন। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, স্বদেশি, বিদেশি নির্বিশেষে সকলেই প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সবাইকে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিদেশি শাসকদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, স্বদেশবাসী অর্থ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। উল্লেখ্য খয়রার রাজা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিপুল সম্পত্তির অংশ দান করেন। কিন্তু সেখানেও সমস্যা তৈরি হয়। কারণ খয়রার রানি বাগীশ্বরীদেবী ও কুমার গুরুপ্রসাদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলে। অবশেষে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দানলব্ধ টাকার কিভাবে ব্যয় হবে তা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ে নির্ধারণ করবেন—

"Under the direction of and according to a scheme to be framed by Sir Asutosh Mookerjee."

এইভাবেই ১৯২১ সালে খয়রার রাজার অর্থসাহায্যে এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি নতুন অধ্যাপক পদ তৈরি হয়। তার মধ্যে ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপনা সম্পর্কে ‘রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক’ অন্যতম।

সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে বলেন—

‘‘এ দেশের অলঙ্কারের সূত্রগুলো যে ছত্রে ছত্রে আর্ট-এর ব্যাখ্যা করে চলেছে—সেটা কোনো পণ্ডিতকে তো এ পর্যন্ত বলতে শুনলাম না।’’

কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বুঝেছিলেন যে ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃত সহজ সরল ব্যাখ্যা এবং দরদী মন নিয়ে তার পর্যালোচনা অবনীন্দ্রনাথকে দিয়েই সম্ভব। এবং তিনিই তাঁকে রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক-এর পদে প্রথম অধ্যাপকরূপে বরণ করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থেকে তিনি ঊনত্রিশটি

বক্তৃতা দেন। আর সেইসব বক্তৃতা 'বঙ্গবাণী' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতাগুলি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। অনুমান করা যায় অধ্যাপক পদটির নামানুসারে গ্রন্থের ওইরূপ নামকরণ হয়েছিল।

গ্রন্থের ভূমিকায় নন্দলাল বসু বলেছিলেন এই—

''শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা, রূপকলার আলোচনার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী গ্রন্থ, এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষ সাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্গসাহিত্যে এটি এক অমূল্য সম্পদ।''

৪১১.২.৭.২ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী অনুসারে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ভাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের নবজাগরণের প্রভাবে আমাদের দেশেও নবজাগরণ ঘটে। এই নবজাগরণের দুটি দিক ছিল। তা হল যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদ। এর সঙ্গেই শুরু হল নতুন যুগের মানদণ্ডে পুনর্জাগরণ। এসবের মধ্যেই পড়ে বেদ-বেদান্ত মহাকাব্য উপনিষদ প্রভৃতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন বিদ্যার চর্চা হিসেবে রামমোহনের বেদান্তদর্শন সাহিত্য ও ধর্ম ছাড়াও প্রাচীন সাহিত্যের আর একটি ধারা ছিল—তা হল শিল্পকলা। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ ধারার পুনর্জাগরণ ঘটালেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি শুধু চিত্রশিল্পী ছিলেন না, একজন বড় মাপের শিল্পতত্ত্ববিদও ছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার বিভিন্ন দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে। যেমন—শিল্পের অধিকার, শিল্পের অনধিকার, সৌন্দর্যের সন্ধান, সুন্দর ও অসুন্দর প্রভৃতি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-ভাবনার সামগ্রিক আলোচনার চেষ্টা করা যেতে পারে।

'শিল্পের অনধিকার' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেন—মানুষের জৈবিক চাহিদা মিটে যাবার পর মনের খিদে বেড়েই চলে। এই অবস্থায় মানুষ বেঁচে থাকত কিভাবে যদি না 'শিল্প' নামক মাধ্যমটি থাকত। এই শিল্প মানুষের অন্তহীন খিদে নিবারণের জন্যই নির্মিত। শিল্পচর্চার গোড়ার কথা হল 'শিল্পবোধ'। সকলের এই শিল্পবোধ থাকে না। এই শিল্প যিনি সত্যিকারের রসিক তার কাছে পরিপূর্ণতা পায়।

অলস জীবন শিল্পীর নয়। আর সেটি নয় বলেই শিল্পের অধিকার জন্মগত নয়। শিল্প বিধাতার নিয়মের মধ্যে ধরা দিতে চায় না। নিজের নিয়মে সে চলে।

শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেরণার বিষয়টিকেও প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই প্রেরণা বহিরাগত নয়, শিল্পীর অন্তরের আবেগ থেকেই শিল্প সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রবহমানতায় যে ছন্দ স্পন্দনে যে নিত্য উৎসবের আয়োজন রয়েছে শিল্পী তাঁর সজাগ অনুভূতির দ্বারা তার থেকে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন এবং ভাবুক দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে শিল্প সৃষ্টি করেন।

এই প্রবন্ধে বাস্তবতা ও কল্পনার মিশেল সম্পর্কেও তিনি শিল্পীর সতর্কতার কথা বলেন। কেননা কল্পনা ও বাস্তবতার মিশ্রণেই তৈরি হতে পারে সার্থক শিল্প। আর বাস্তবের সার্বিক গ্রহণ-বর্জনের ওপরে নির্ভর করে শিল্পীর টেকনিক যার দ্বারা এক শিল্পী অন্যের চেয়ে পৃথক হয়ে যান।

শিল্পী কাজ হল নির্মিতি। আর কারিগরের নির্মাণের মতো হুবহু আর একটি তৈরি করা সম্ভব নয়। হলেও

রসের দিক দিয়ে পার্থক্য হয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ রসসঞ্চারে শিল্পের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করলেও, ভৌগোলিক সীমানার কারণকে মানেননি। শিল্পের পরম সৃষ্টিগুলি আমরা ভারতীয় বলেই আমাদের নয়। শিল্পের আস্বাদ দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বজনীন।

'শিল্পের অধিকার' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ প্রকৃত আর্ট বলতে বুঝিয়েছেন শিল্পীর অন্তর্নিহিত অপরিমিত এবং তার স্বাতন্ত্র্যতাকে। এদের নির্মিতি নিয়েই প্রস্তুত হয় প্রকৃত শিল্প। শিল্পের প্রধান লক্ষণ হিসাবে তিনি প্রবন্ধে আড়ম্বরশূন্যতাকে প্রধান স্থান দিয়েছেন। কিন্তু রসের তৃষ্ণা যার মধ্যে আছে সে কোনো আয়োজন, আড়ম্বরের অপেক্ষায় থাকে না। রসের প্রেরণাই তাকে চালিত করে নিয়ে যায়।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে সাধারণ কাজ এবং শিল্প সৃষ্টিকে একাত্ম করে দেখেছেন। তিনি বলেন—

"জীবিকার প্রয়োজনে কাজ সকলকেই করতে হয় এবং শিল্পী-সাহিত্যিকরা এ কাজের বাইরে নন। কর্মের মধ্যেই সন্ধান করে নিতে হবে আনন্দের ঝর্ণা ধারাকে।"

শিল্পের অধিকার নির্ণয় করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক মুক্ত জীবন চেতনার কথা বলেছেন। শিল্পীর কাছে তাঁর শিল্পই শেষ কথা, সেটাই তাঁর পরিচয়।

'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—সুন্দরকে কোনো বাঁধনে বাঁধা যায় না। সুন্দর সেটাই যেটি আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, আমাদের প্রাণে চঞ্চলতার সৃষ্টি করে।

"সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবের মনের ধারার সম্পর্ক,
অসুন্দরের সঙ্গে মনে না ধরার ঝগড়া।"

তাই সুন্দরের বিচারক হল ব্যক্তিমানুষের মন। শিল্পীকে কোনো প্রথাগত নিয়মে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। এই সত্যতা তিনি বিশ্বাস করেন। এই স্ববিরোধিতাই তাঁর সৌন্দর্য বিষয়ক প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

আবার তিনি বলেন সৌন্দর্য হল ব্যক্তি-রুচি নির্ভর। তাই রুচিভেদে দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে সৌন্দর্য সম্পর্কিত ধারণাও পাল্টে যায়। যেমন—ভারত ও গ্রীসের মধ্যে। কেননা এই পরিবর্তনশীল জগতে সুন্দর কখনও আদর্শভাবে থাকে না। রুচি ভেদে সুন্দরের আদর্শ বদলে যায়। ফলে সৌন্দর্য হয়ে ওঠে একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। সুন্দরের আদর্শ 'Artist'-দের মনেই আছে। Art-এ আমরা সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু পূর্ণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি কোনোদিন সম্ভব নয়। যেখানে স্বার্থ জড়িত সেখানে সুন্দরকে দেখা যায় না। যেখানে লোকসানের প্রসঙ্গ জড়িত সেখানে সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

"সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণ আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ তেমনি ভাব।"

স্থান-কাল-পাত্রের ভিত্তিতে সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য ঘটে। ব্যক্তিভেদে পরিবেশ ভেদে পরিস্থিতি ভেদে সুন্দর কখনও কখনও অসুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু সৌন্দর্য রসিকের কাছে সৌন্দর্য, সৌন্দর্য রূপেই ধরা দেয়। দূরত্বের উপর আবার সৌন্দর্য নির্ভর করে। দূরত্ব ঘুচে গেলেই ব্যতিক্রম ঘটে। সুন্দর আমাদের হৃদয়ের বিকাশ ঘটায়। অবনীন্দ্রনাথ পাঠক ও লেখকের হৃদয়ের মধ্যে যে মেলবন্ধন ঘটায় তাকে বললেন রস। আর এই রস থাকে শিল্পের মধ্যে যা দুটি হৃদয়কে একটি হৃদয়ে পরিণত করতে পারে। সুন্দর নিজের আলোয় আলোকিত। যার মধ্যে সুন্দরের জ্ঞান আছে তার কাছে সহজেই সুন্দর ধরা দেয়।

কল্পনা-প্রবণতা এবং রসসঞ্চার হল শিল্প সৃষ্টির মূল কথা। কিন্তু এর বাইরের আকার আকৃতি প্রসঙ্গে

সুন্দর ও অসুন্দরের একটি সমস্যা চিরকালের। কিন্তু যা চিরসুন্দর তার একদিন প্রকাশ ঘটবেই। তা সুন্দর মায়াজাল বিস্তার করলেও একদিন তার মুখোশ খুলে যাবে।

এই প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ জানান—নিছক সুন্দর বা নিছক অসুন্দর বলে কিছু নেই। ব্যক্তি অনুসারে সৌন্দর্যের ধারণা পরিবর্তনশীল। একজনের কাছে যা সুন্দর বলে মনে হতে পারে অন্যজনের কাছে তা আবার অসুন্দর।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছেন নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা। আজ যাঁরা শিল্পতত্ত্ববিদ শিল্প আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁরা শিল্পের আঙ্গিক গঠন, উপাদান প্রভৃতিকেই সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনা তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার।

৪১১.২.৭.৩ 'সৌন্দর্যের সন্ধান'—প্রবন্ধের মূল সুর

'নন্দনতত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্য তত্ত্ব' দুটি আলাদা বিষয় হলেও, অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব বলতে আমরা তাঁর সৌন্দর্য তত্ত্বই বুঝি। সৌন্দর্য তত্ত্ব বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে 'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধটি সবচেয়ে বিশদ এবং বৈচিত্র্যময় আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই দুটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। (ক) সৌন্দর্য বিষয়ে কোনো তত্ত্ব থাকা উচিত কিনা। (খ) ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর সৌন্দর্য নির্ভরশীল হওয়া উচিত কিনা। আর এ দুটি বিষয়ই অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য নির্ণয়ের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষণীয় তিনি সাধারণত ব্যক্তিগত অভিরুচিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার তত্ত্ব নির্ণয়ের দিকেও তাঁর দুর্বলতা লক্ষণীয়, কেননা সৌন্দর্যেরও একটা মানদণ্ড থাকা উচিত।

এই প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত অনুভবের মাধ্যম বলেই মনে করেছেন। কারণ সৌন্দর্য একান্তভাবেই ব্যক্তিমানুষের মনের ব্যাপার। মানুষের মন যাকে গ্রহণ করে সেটি হল সুন্দর। আবার বিপরীতভাবে মন যাকে গ্রহণ করে না সেটি অসুন্দর। অনেকে কাজকে সুন্দর মনে করেন, অনেকে আবার অকাজকে সুন্দর মনে করেন। সুতরাং ব্যক্তি মানুষের ধারণার উপরেই সৌন্দর্যবোধ নির্ভরশীল।

অবনীন্দ্রনাথ বস্তুগত সৌন্দর্য (Objective beauty)-কে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর ধারণা এই Objective beauty-র অস্তিত্ব বর্তমান। সেই কারণেই বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে সৌন্দর্যের বিভিন্ন আদর্শ গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের লোকেরা বলে—"সুন্দর গড়ো কিন্তু সুন্দর মানুষ গোড়ো না, সুন্দর করে দেবমূর্তি গড়ো সেই ভাল।" কিন্তু গ্রীসের লোকের সুন্দর আলাদা, তারা বলে—"নব মানুষকে করে তোল সুন্দর দেবতার প্রায়।"

আবার ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন শিল্পীর মনও আলাদা। অবনীন্দ্রনাথের মতে সৌন্দর্যের চরম প্রকাশ সেখানেই যেখানে ব্যক্তিগত সৌন্দর্য ও বস্তুগত সৌন্দর্য মিশে একাকার হয়ে যায়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য খুঁজে নেওয়া কঠিন কাজ। কারণ—নীতিজ্ঞানী মানুষ নৈতিকতাকেই সুন্দর বলে মনে করেন। ভক্তমানুষ আবার আধ্যাত্মিক বিষয়কেই শ্রেষ্ঠ সুন্দর বলে মনে করেন। আবার যারা সমাজসচেতন মানুষ তারা যেটি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকারী তাকেই সুন্দর বলে মনে করেন। ফলে মানুষের কাছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সন্ধান করা শক্ত হয়ে পড়ে।

প্রকৃত সুন্দরকে কখনও সুন্দর বলে প্রচার করতে হয় না। সেই নিজেই নিজের প্রকাশ মাধ্যম। সৌন্দর্যরসিকরা তাকে চিনে নিতে ভুল করে না। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যাকে সুন্দর বলে মনে

করি না, অনেক সময় মন তাকেই সুন্দর বলে গ্রহণ করে। যাকে অসুন্দর বলে মনে হয় শিল্পীরা তারও ছবি আঁকেন। প্রকৃত সৌন্দর্যরসিক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ তাঁর মন ও অনুভূতি দিয়েই প্রকৃত সৌন্দর্য চিনে নেয়।

অবনীন্দ্রনাথ সাতটি প্রধান মতবাদের পরিচয় দিয়েছেন তার সেই তত্ত্বগুলির পরিচয় বিস্তারিতভাবে দেননি।

১। যা সুখদ তাই সুন্দর।

২। কাজের বলেই তা সুন্দর।

৩। অপরিমিত বলেই তা সুন্দর।

৪। সুশৃঙ্খল বলেই তা সুন্দর।

৫। উদ্দেশ্য ও উপায় এই দুইয়ের সঙ্গতি আছে বলেই তা সুন্দর।

৬। সুসংহত বলেই তা সুন্দর।

৭। বিচিত্র-অবিচিত্র সম বিষম দুই দিক দিয়েই তা সুন্দর।

উপরিউক্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনোটি গ্রহণযোগ্য তার বিস্তারিত আলোচনা অবনীন্দ্রনাথ করেননি। তার কারণ হয়তো এর কোনোটিই গ্রহণযোগ্য বলে তাঁর কাছে মনে হয়নি। যদি এই তত্ত্বগুলিই সৌন্দর্যবোধের মানদণ্ড হয় তাহলে সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে মানুষের মনে এত দ্বিধা কেন। কেনই বা ব্যক্তি অনুযায়ী অসুন্দর হয়ে ওঠে। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের মত হল বিশেষ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বা বিশেষ দেশ কালে এগুলি আংশিকভাবে সত্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের সন্ধান করতে গেলে ব্যক্তিগত অভিরুচির উপরেই নির্ভর করতে হয়।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা দেবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ একটি সাধারণ সত্যের কথা বলেছেন। সেটি হল যা নিত্য প্রবহমান তাই সৌন্দর্যের বিষয়। যা অনিত্য তা সৌন্দর্যের বিষয় নয়। অবনীন্দ্রনাথ নিত্যকে বুঝিয়েছেন ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। আর অনিত্য বলতে বুঝিয়েছেন যা পার্থিববস্তু। এবং সৌন্দর্য একটি ধারণামাত্র।

অবনীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এ ধরনের আলোচনা খুব একটা সহায়ক নয়। তাই তিনি বলেছিলেন পার্থিব বস্তুমাত্রই যদি অনিত্য হয়। এবং সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্র থেকে যদি তাদের বাদ দিতে হয় তাহলে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে উঠবে। তাই তিনি বলেন প্রত্যেকের মধ্যেই চিরসুন্দর বলে একটি ধারণা আছে। একে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'Universality'। এই চিরসুন্দরের ধারণা নিয়েই তিনি সৌন্দর্যবিচারে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে Universality-র প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত অভিরুচি। যাকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'individuality'। ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে চিরসুন্দরের বিরোধ দেখা দিলে, সৌন্দর্যবিচারে কাকে গ্রহণ করা উচিত তার সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল—

"যেখানে individuality-কে Universality দিয়ে যদি না ভাঙতে পারা যায় তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পুরো সুরেই টান মারতে থাকলে ... যে কাণ্ডটা ঘটে, আর্টের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছার উপস্থিত হয়।"

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে চিরসুন্দরের (Universality) কাছে ব্যক্তিগত রুচি পরাজিত হওয়াই শ্রেয়। তিনি ব্যক্তিগত রুচির থেকে চিরসুন্দরের আদর্শকেই জয়ী করতে চেয়েছেন।

৪১১.২.৭.৪ 'সুন্দর' প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে দক্ষ শিল্পী এবং সেইসঙ্গে কিশোর সাহিত্যের স্রষ্টা। সুতরাং, সুন্দরের সাধনা

করেন যে শিল্পী, তাঁর অনুভূতিতে সৌন্দর্য-দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমাদের মনে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে একটি অসুবিধাও আছে। সাধারণভাবে যাঁরা তাত্ত্বিক বলে পরিচিত, তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনুভূতিগ্রাহ্য এই ব্যাখ্যার একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। প্রকৃত সৌন্দর্য তাঁর কাছে যতই পরিস্ফুট হোক, আমাদের কাছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তিনি ততটা স্পষ্ট হতে পারেন না। যদিও তার বক্তব্য আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু অসুবিধা এই যে, প্রাতিষ্ঠানিক নন্দনতত্ত্ব না হওয়ার জন্য তার সৌন্দর্যবিষয়ক মতামতকে আমরা বিশেষ একটি মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। তবে তিনি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'তে শিল্প ও সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর মতামত অতি সরল ও মনোরম ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

তাত্ত্বিক আলোচনায় সৌন্দর্য দর্শনের মোটামুটি দুটি ধারা প্রত্যক্ষ করি। তন্ময় সৌন্দর্য দর্শন (subjective) অর্থাৎ যথাক্রমে সৌন্দর্য বস্তুধর্মী এবং সৌন্দর্য ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর নির্ভর করে যথাক্রমে এই মতবাদ। অবনীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থেরই একটি দীর্ঘতম প্রবন্ধে 'সৌন্দর্যের সন্ধান'-এ সৌন্দর্যকে পুরোপুরি মন্ময় বলেও উপসংহারে চিরসুন্দরের কথা বলেছেন। শাশ্বত সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত বোধের দ্বন্দ্ব হলে শাশ্বত সৌন্দর্যকেই গ্রহণ করতে বলেছেন। কাজেই, সৌন্দর্য বিচারে তাঁকে সামঞ্জস্যবাদী বলাই ভালো।

'সুন্দর' প্রবন্ধের সূচনায় কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ মন্ময় আদর্শের প্রশংসা করেননি। বরং, এই কাজেই বলেছেন যে, সৌন্দর্যের ব্যক্তিগত ধারণা সৌন্দর্য বিচার করতে গিয়ে কিছু ভ্রান্তিকে লালন করে। তিনি বলেছেন:

"সবারই মনে একটা করে সুন্দর-অসুন্দরের হিসাব ধরা রয়েছে, সবাই পেতে চায় নিজের হিসেবে যা সুন্দর তাকেই, কাজেই অন্যের রচনার সৌন্দর্যের হিসেবে সে নানা ভুল দেখে।"

সেই কারণেই সৌন্দর্য-বিচারের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। বলেছেন—স্থান-কাল-পাত্রেই সৌন্দর্য সৃষ্টি নির্ভর করে। প্রথমে বলেছেন পাত্রের কথা। যে যে কাজের উপযুক্ত নয়, তাকে সেই কাজ করতে দিলে অসুবিধা হবেই—

"গান শুনে মনে হয় বুঝি আমিও গাইতে পারি, মন মেতে ওঠে এমন যে ভুল হয়ে যায় সুরের পাখি বুকের খাঁচায় ধরা দেয়নি একেবারেই।"

এ কথা যিনি সৌন্দর্য উপভোগ করেন তার সম্বন্ধেও সত্য:

"হরিণ সে বাঁশী শুনে ভোলে, সাপ সে বাঁশী শুনে ফণা তুলে তেড়ে আসে।"

এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সব জিনিস সব জায়গায় ভালো লাগে না। লেখক বলেছেন—

"গড়ের বাদ্যি, গড়ের মাঠে সুন্দর লাগে, মন্দিরের শাঁখ-ঘণ্টা দূরে থেকেই ভালো লাগে। সভাস্থলে বীণা-বেণু-মন্দিরা ঘরের মধ্যে সোনার চুড়ির ঝিন্‌ঝিন্ স্থান-কাল-পাত্রের হিসেবে সুন্দর অসুন্দর ঠেকে। মাঠ ছেড়ে গড়ের বাদ্যি যদি ঘরের মধ্যে ধুমধাম লাগায়, তবে সে স্থান-কাল-পাত্রের হিসেব ডিঙিয়ে চলে ও সেই কারণেই ভারি বিশ্রী ঠেকে কানে।"

কানের কথাটাও এভাবে সত্য। সন্ধ্যাবেলা শাঁখের শব্দ ভালো লাগে, কাঁসর ঘণ্টাও মন্দ লাগে না। কিন্তু দ্বিপ্রহরে এগুলোকেই মনের কাছে উৎপাত বলে মনে হয়।

আসলে সুন্দর যে আছেই, মানুষ সে কথা বোঝে। কিন্তু সৌন্দর্যের মূল ব্যাপারটি কী? তার উত্তর তার নিজের মনও দিতে পারে না। আবার পণ্ডিতদের সৌন্দর্যতত্ত্ব সঠিক উত্তরও দিতে পারে না। মানুষের

সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসার এটাই প্রধান সমস্যা। তা সত্ত্বেও মানুষ যে তত্ত্বের সন্ধান করে, তার কারণ ব্যক্তিগত বিতর্ক ও মতভেদ থেকে সে উদ্ধার পেতে চায়। তাছাড়া সৌন্দর্য বিচারের ক্ষেত্রের এমন কোনো বস্তুগত মানদণ্ড থাকা দরকার—যা স্থান-কাল-পাত্রের অতীত অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ একটি তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে। সেই জন্যই রচিত হবে সঙ্গীতশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, বর্ণশাস্ত্র। কিন্তু দেখা গেছে এতে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। কারণ তত্ত্বের সাহায্যে সৌন্দর্যকে ধরা যায়নি। মানুষ সৌন্দর্যের তত্ত্ব রচনা করে—অথচ সেই তত্ত্বগত বিদ্যাকে অতিক্রম করাই সৌন্দর্যের ধর্ম। সেই কারণেই সঙ্গীত কোনো নিয়ম না মেনেই সুন্দর হতে পারে। আবার সব রকমের নিয়ম মানা সত্ত্বেও তাকে আমাদের অসুন্দর মনে হতে পারে। ছন্দশাস্ত্র পড়ে কেউ কবিতা লিখতে শেখে না। নিয়মের ব্যতিক্রমও যে অপূর্ণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রমাণস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—কোনো কোনো শিল্পীর আঁকা কালো-রঙের চাঁদ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে বলেছেন—যতদিন তিনি পাহাড়ে বাস করেছিলেন প্রকৃতি তাকে কালো এবং নীলবর্ণের তুষারশৃঙ্গ দেখিয়েছিল; সেই চিত্র তিনি এঁকেছেন, তাতে সৌন্দর্যের কোনোরকম হানি হয়নি। সুতরাং তত্ত্ব যাই হোক, সৌন্দর্যের সৃষ্টি যে করতে পারে, তার জন্য কোনো নিয়মের প্রয়োজন হয় না। এ কথা প্রমাণের জন্য অবনীন্দ্রনাথ জাপান ও চীনের 'হাতপাখা'র কথা উল্লেখ করেছেন। জাপান সেটি আঁকে সাদার পর বিভিন্ন রং ব্যবহার করে এবং চীন আঁকে একেবারে রাত্রির মত কালো রঙে। —পাখা দুটি ভারী সুন্দর।

সুন্দরকে তত্ত্বের আলো জ্বেলে দেখতে হয় না। প্রকৃত সৌন্দর্যরসিক সুন্দরের আলোতেই তাকে দেখে নেয়। লেখক মনে করেন সুন্দরের নিজেরই এমন এক দ্যুতি আছে যাতে তাকে অনায়াসেই চিনে নেওয়া যায়। সেই কারণেই সৌন্দর্যের এত বৈচিত্র্য। সেই বৈচিত্র্য বোঝার জন্য লেখক যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাতে যেন চিত্রশিল্পীর সঙ্গে কথাশিল্পী এসে যোগ দিয়েছে। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

"মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোনো একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব নগরের বিচিত্র রঙের তারা ফুলে গাঁথা রঙিন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল, মানুষ বললে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর।"

সুন্দরকে তাই খুঁজতে হয় না, যে দেখতে জানে সে সবকিছুর মধ্যেই সুন্দরের সন্ধান পায়। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মতে সৌন্দর্য অপ্রয়োজনের সৃষ্টি অর্থাৎ সৌন্দর্য কোনো প্রয়োজন সাধন করে না। কেবল সৌন্দর্যের জন্যই সুন্দর আমাদের ভালো লাগে। কথাটা বোঝার জন্য পিঁপড়ের ছোটাছুটি এবং মৌমাছির মধু আহরণের সাথে সৌন্দর্যের তুলনা করেছেন। পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন,—"পিঁপড়ের চিনি সংগ্রহের সঙ্গে তার প্রয়োজনের যোগ—চিনি না পেলেই সে যে-কোনো জিনিসেই কাজ মিটিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মৌমাছির কাছে মধুর বিকল্প আর কিছুই নেই।" লেখক Artist-দের সম্বন্ধে বলেছেন—

"তাঁরা পিঁপড়ের মতো সুন্দর সামগ্রীকে পেটের তাড়নার সঙ্গে
জড়িয়ে নিয়ে সুন্দরের সন্ধানে বার হয় না, ফুল ফোটে
ওধারে সুন্দর হয়ে খবর আসে বাতাসে তাদের কাছে।
চলে যায় তারা সুন্দরের নিমন্ত্রণে, সন্ধানে নয়।"

এই প্রসঙ্গটি অবনীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিশদ করে বলেছেন এবং এরকম সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কোনোরকম প্রয়োজনের বন্ধনে বাধা থাকলে প্রকৃত সৌন্দর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। তিনি বলেছেন—

“তারের সর থেকে গলার সুর পর্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে
রূপদক্ষেরা রচনা করে চলেছেন, সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন।
মানুষের কাজে কতটা লাগবে, কি না লাগবে—এ ভাবনা তাদের নেই।”

শিল্পী যেমন নিজের প্রয়োজনের কথা ভাবে না, তেমনি অপরের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যও তারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না।

প্রবন্ধের শেষের দিকে, বিষয় ও আঙ্গিকের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সত্যকার সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে আঙ্গিকের কলাকৌশল আমাদের নজরে পড়ে না। তাঁর মতে—

“যে রচনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কলা-কৌশল ধরা থাকে না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে।”

একথা বোঝাতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ একটি অর্গান ও ছাপার কালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যার সমগ্র সৃষ্টি অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু বিচ্ছিন্ন অংশ সুন্দর নয়। সেই কারণেই তাঁর সিদ্ধান্ত—

“সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ, তেমনি ভাব।”

আধুনিক যুগেও একথার স্বীকৃতি পাওয়া গেছে—

"Among the moderns we find that more emphasis is laid on the idea of significance, expressiveness, the utterance of all that life contains, in general, that is to say on the conception of in characteristic."

সমগ্র প্রবন্ধ থেকে অবনীন্দ্রনাথ এই রকম ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, সৌন্দর্য দর্শনের জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। স্থানান্তরে ভ্রমণের কোনো প্রয়োজন নেই, তত্ত্বদৃষ্টি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। কারণ সুন্দর সর্বত্র আছে, তাকে খুঁজে নিতে হয় না। কেবল সৌন্দর্য দর্শন করবার মতো উপযুক্ত চোখ তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত তিনি সৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

৪১১.২.৭.৫ ‘অসুন্দর’ প্রবন্ধের মূল সুর

ঊনবিংশ শতক বাংলাদেশের নবজাগরণের যুগ। এই সময়কার দার্শনিকরা সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্পকলা ইত্যাদিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে চর্চা করেছেন। সাহিত্যের মতোই শিল্পতত্ত্বেরও নতুন করে চর্চার অভ্যাস শুরু হয়। যার প্রতিভূ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ছিলেন নন্দনতত্ত্ববিদ্ শিল্পতত্ত্ববিদ্ ও একজন শিল্পী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি শিল্প সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন তাই পরে ‘বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এতে শিল্প ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বর্তমান। অনেকে আবার বলেন এটি সৌন্দর্য সম্পর্কিত দার্শনিকতার কথা। এই গ্রন্থে ‘মেঘদূত’, ‘ঋতুসংহার’, ‘ঋগ্‌বেদ সংহিতা’ ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী’র ‘অসুন্দর’ প্রবন্ধে সুন্দর এবং অসুন্দরের তুলনামূলক আলোচনা করে সুন্দর ও অসুন্দরের স্বরূপকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে তুলে ধরেছেন।

শিল্প হল জড় ধর্মের বিপরীত ধর্ম। তাঁর মতে শিল্প হল কোনো মানুষের আত্মিক ধর্ম বা আত্মিক বোধ।

শিল্পকে সৃষ্টি করতে হলে তাকে অর্জন করতে হয়। তিনি জগতের সমস্ত শিল্পের মধ্যে ভাবের মাধ্যমকে লক্ষ করেছেন। তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'র একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'অসুন্দর'-এ অনবদ্য ভঙ্গীতে 'অসুন্দর' সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারণার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণা অনেক স্বতন্ত্র। আমাদের মন যাকে বারবার চায় তাকেই আমরা সাধারণত সুন্দর বলে মনে করি। আর তাকে আমরা সবসময় কাছে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখার ভুলেও আমরা সুন্দরকে অসুন্দর বলে মনে করতে পারি। আবার ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগার পার্থক্য শক্তি মানুষের মানসিক ব্যাপার। তবুও বলা যায় যা মনে ধরে, যে বস্তুটি অন্তরে স্থান করে নেয় তাই সুন্দর। আর যা বাইরের বিষয় থেকে যায় তা অসুন্দর। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মতে আত্মিক ধর্মের উপরে সুন্দর অসুন্দর নির্ভর করে।

অসুন্দরের মধ্যে মিথ্যা আবরণের জাল থাকে। তার মধ্যে একটা ভান থাকে। তাই ভান যা তা অসুন্দর। অন্যদিকে আর্ট যা তাই সুন্দর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে অবনীন্দ্রনাথ আবার বলেছেন,—সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে একটি ভেদরেখা টানা কঠিন।

সুন্দর এবং অসুন্দরের ধারণা সাধারণভাবে ব্যক্তিমানুষের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ব্যক্তিভেদে এই সুন্দরের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। একজনের কাছে যা অসুন্দর অন্যজনের কাছে আবার তা সুন্দর বলে মনে হয়।

বাস্তব জীবনের সৌন্দর্যবোধ এবং অসুন্দর, সাহিত্য ও শিল্পের সুন্দর ও অসুন্দরের থেকে আলাদা। সেখানে অসত্য ও সত্য, অসুন্দরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

শিল্পসাহিত্যের মূল কথাই হল সবকিছুতেই সুন্দর করে দেখা ও দেখানো। সেখানে সমস্ত উপকরণ প্রকরণ দিয়ে অসুন্দরকেও সুন্দর করার সাধনা অনবরত চলছে। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"সুন্দর ও মঙ্গলের পক্ষে যেগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড
বাধা তাই নিয়ে হচ্ছে রূপদক্ষ সকলের কারবার।"

যার ছোঁয়ায় অসুন্দর সুন্দর হয়ে ওঠে তার নাম রস। যে ছোট ছেলেটি কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলে, সেটি কোনো দিক দিয়ে ঘোড়ার মতো না হলেও তবু সবাই জিনিসটাকে সুন্দর দেখে। উষার সহজ বর্ণনা যুগ যুগ ধরে কবিরা দিয়ে এসেছেন, এর মধ্যে কতটা সত্য, কতটা মঙ্গল তা মাপতে গেলে এর রসভঙ্গ ঘটবে। আগুন যখন কারও বাড়িতে আগুন লাগায় তখন তা অসুন্দর আবার সেই আগুনই যখন অন্ধকারে গৃহকোণে দীপশিখার মতো জ্বলে তখন তা সুন্দর। এসব ঘটে রসের কারণে। এই রসের রহস্যময় সংস্পর্শে যে-কোনো বস্তুরই রূপান্তর ঘটে। অবনীন্দ্রনাথের মতে—

"যা চরিত্রবিহীন তা অসুন্দর।"

চরিত্র বলতে তিনি শ্রী, স্বাদ ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। পরিষ্কারভাবে অসুন্দরকে দেখানো শক্ত। সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে যে সত্য, শুভ, মঙ্গল ইত্যাদি রয়েছে সেগুলিও ব্যক্তিগত রুচিবোধ অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

সব সুন্দর রচয়িতা নিজেকে গোপন রাখে, অসুন্দর সে নিজে থেকে এগিয়ে আসে। ফুল কতখানি সুন্দর হয়ে ফোটে তা নিজেই জানে না, প্রজাপতি জানে না সে কত সুন্দর:

"যে কাজে রচয়িতা কেমন বানিয়েছি, এইটুকুই
প্রকাশ করে গেলো সে কাজ অসুন্দর হল।"

রসসৃষ্টির দ্বারাই ভাবের পরিপূর্ণতা। গোপনীয়তা রক্ষা করাই শিল্পীর সত্তা। সূর্য যখন আপনাকে খুব অনেকখানি সরিয়ে রেখে জলে স্থলে আলোকিত করে তখন একটা অপরূপ সৌন্দর্য ও সুষমা নিয়ে চোখে পড়ে, কিন্তু নদীর জলে সূর্য যখন নিজেকেই প্রখরতর করে ফোটাচ্ছে তখন চোখের পীড়া উৎপন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করে সৌন্দর্য প্রকাশ করে।

সুতরাং অসুন্দর হল যার সত্য নেই, যার গোপনীয়তা নেই, যার বৈচিত্র্য নেই, যার চরিত্র নেই। আর সুন্দর হল যা গোপন, যা মহীয়ান, যা রহস্যময়, যা বৈচিত্র্যময়। কিন্তু শিল্পতত্ত্ববিদ্ শুধু সুন্দরের পূজারী নন, তিনি অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরকে সন্ধান করে চলেন। তাই বিশিষ্ট রচয়িতা বা শুধু চোখ দিয়ে নির্মল জলময়, পানাপুকুরের মধ্যেও সুন্দরকে খোঁজ করেন। এবং সুন্দর ও অসুন্দরকে পাশাপাশি স্থান দেন।

৪১১.২.৭.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আনন্দ পাবলিশার্স)
২. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (দেজ পাবলিশিং)
৩. সাহিত্য বিবেক—ড. বিমল মুখোপাধ্যায় (দেজ পাবলিশিং)
৪. রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব সূত্র—ড. সুবীরকুমার নন্দী (পি. এম. বাক্‌চি)
৫. সৌন্দর্যতত্ত্ব—ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (চিরায়ত প্রকাশন)
৬. আধুনিক বাংলা উপন্যাস পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ—অধ্যাপক রামেশ্বর শ অনূদিত (পুস্তক বিপণি)

৪১১.২.৭.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১. 'সুন্দর' প্রবন্ধের মূল ভাব নিজের ভাষায় বিবৃত করো।
২. অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ভাবনার মূল সুর কী?
৩. 'অসুন্দর' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ অসুন্দর বলতে কী বুঝিয়েছেন, প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।
৪. 'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধের মূল ভাব নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করো।
৫. 'সুন্দর' ও 'অসুন্দর' প্রবন্ধের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করো।

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক ৮
শ্রীঅরবিন্দ

বিন্যাসক্রম

৪১১.২.৮.১ শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্বের মূল ভাবনা
৪১১.২.৮.২ কাব্যের আত্মা
৪১১.২.৮.৩ রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু
৪১১.২.৮.৪ ছন্দস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ
৪১১.২.৮.৫ কাব্যের সূক্ষ্মদর্শন ও মন্ত্র
৪১১.২.৮.৬ কাব্যের জাতীয় বিবর্তন
৪১১.২.৮.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলি
৪১১.২.৮.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৪১১.২.৮.১ শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্বের মূল ভাবনা

কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব গড়ে ওঠে তাঁর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র জীবনের যোগ সাধনা, বিশ্বসাহিত্য অনুশীলন এবং ব্যাপক অধ্যয়নের সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন তার উপর।

সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন—

> "তাতে সম্যক প্রবেশের প্রস্তুতি আমাদের নেই, উপযুক্ত আধ্যাত্মিক চেতনার অভাবে তাতে প্রবেশের চাবিকাঠির সন্ধানও আমাদের জানা নেই, কাজেই এই দুরূহ চিন্তাসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বিমূঢ় বোধ করা আশ্চর্য নয়। কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির অভাবকে আমরা শ্রদ্ধা দিয়ে পূরণের চেষ্টা করতে পারি। শ্রদ্ধার অভিসিঞ্চনে অনেক সময় জটিল জিনিসও সহজ হয়ে যায়।" (নারায়ণ চৌধুরী: নির্বাচিত প্রবন্ধের সংগ্রহ)

দেখতে পাই—প্রকৃত জনের কাছে অরবিন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগে চরমপন্থী বিপ্লবী নেতা। ভক্তজনের কাছে মহাযোগী। বিদগ্ধ জনের কাছে একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেন

তিনি যোগী হওয়ার আগে থেকেই কবি ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাব্যসাধনা করে গেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি কাব্যতত্ত্ববিদ্‌ও। কাব্যসাহিত্য হল শিল্পেরই অন্যতম শাখা। তাই কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তিনি শিল্পতত্ত্ব তথা নন্দনতত্ত্বের কথাও ভেবেছেন। তাঁর নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া যায়, তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে—

1. The Life Divine
2. The Future Poetry
3. The Essays on the Gita
4. The Ideal of Human Unity
5. The Human Cycle
6. The Secrets of the Veda

আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের অবদান সবচেয়ে মৌলিক। রবীন্দ্রনাথ ও ক্রোচের নন্দনতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আবার এদের মধ্যে অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি ছিলেন, দার্শনিকও ছিলেন। অপর দিকে ক্রোচের মধ্যে দার্শনিকসুলভ মনোভাব থাকলেও কবিত্বের দিক দিয়ে ততটা প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে কবি ও দার্শনিক উভয় মনোভাবের মেলবন্ধন ঘটেছে। ফলে তাঁর নন্দনতত্ত্বে ক্রোচের মতো দার্শনিকসুলভ যুক্তির সঙ্গতি যেমন প্রত্যক্ষমান, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতো কবি হৃদয়ের সৃষ্টি সত্যের প্রত্যক্ষ উষ্ণতাও লক্ষ করা যায়।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনও আবার পাশ্চাত্যের কান্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকের দর্শন যা আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদের যুক্তিতর্ক লব্ধ দর্শনের মতো নয়। তাঁর দর্শন তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফল—

"What I wrote was the work of intuition and aspiration working on the basis of my spiritual experience" (A. B. Purarni: Evening Talks with Sri Aurobindo-p. 127)

এই কারণে তাঁর দর্শনের বিভিন্ন দিকও নন্দনতত্ত্ব তাঁর সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এককথায় শ্রীঅরবিন্দ জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে ছিলেন প্রগতিবাদী। তিনি বলেন, প্রকৃতির মধ্যেই একটি প্রগতির প্রবণতা ক্রিয়াশীল রয়েছে। এই প্রগতি যান্ত্রিক প্রগতি (Mechanical Evolution) নয়। এই প্রগতি উদ্দেশ্যমুখী (Teleological Evolution)। তাঁর মতে প্রগতির বিবর্তন একটি পরিপূর্ণতা লাভের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই পরিপূর্ণতা সুন্দর জীবনের পরিপূর্ণতা।

বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই—এই পৃথিবীর প্রথমে জড়ের বিকাশ হয়েছিল। জড়ের পরে এল গাছপালা—পশুপাখি—প্রাণের বিকাশ হল—এল প্রাণময় স্তরের (Vital) সত্তা। তার পর এল মননশীল মানুষ। মনোময় (Mental) স্তরের বিকাশ হল। চার্লস ডারউইন এ পর্যন্ত এসে থেমে যান। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, আমরা যদি প্রগতিতে বিশ্বাস করি তাহলে আমরা একথা মানতে বাধ্য যে, জগতের বিকাশ এ স্তরে এসে থেমে থাকতে পারে না। মনোময় স্তরের পর উন্নততর একটি স্তরের বিকাশ হবেই। শ্রীঅরবিন্দ মনের চেয়ে উর্ধ্বতর এই নতুন স্তরের নাম দেন 'অতিমানস' (Super mind)। জগতে মনোময় স্তরের বিকাশের ফলে যেমন পশুপাখির চেয়ে উন্নততর জীব মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি এই অতিমানস স্তরের বিকাশের ফলে মানুষের চেয়ে উন্নততর জীব 'অতিমানবে'র (Superman) আবির্ভাব হবে।

শ্রীঅরবিন্দ বিষয়টি এইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন—

Existence	—	সৎ
Consciousness	—	চিৎ
Bliss	—	আনন্দ
Super mind	—	অতিমানস
Mind	—	মন
Psyche	—	চৈতন্যপুরুষ
Life	—	প্রাণ
Matter	—	জড়

উপরের চেতনা নিম্নের স্তর প্রেক্ষেপণের নাম বিবর্তন এবং নীচের স্তর থেকে ক্রমশ উপরের স্তরে যে বিকাশ তার নাম দিয়েছেন বিবর্তন।

সুতরাং বলা যায় প্রগতিবাদী মানুষের প্রগতি মনোময় স্তর থেকে ঊর্ধ্বতর অতিমানব স্তরের দিকে আমাদের বর্তমান জীবনের রূপান্তর হয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে শিল্পসাহিত্যও রূপান্তর হয়ে চলেছে। মনোময় স্তর ছেড়ে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বতর স্তরে আমাদের চেতনা উত্তীর্ণ হবে এই ঊর্ধ্বায়নের সূত্রপাত হয়েই গেছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিদর্শন লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস প্রমুখ কবির মধ্যে। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তাঁর যোগজীবনে যতই এগিয়ে গেছেন ততই ঊর্ধ্বতর চেতনা থেকে বারবার তাঁর প্রতীকধর্মী মহাকাব্য 'সাবিত্রী'কে পুনর্লিখিত ও সংশোধিত করে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বারবার বলেছেন—একটি মানসোত্তর ভূমি থেকে ভবিষ্যতের কবিতা রচিত হবে এবং তাতে কাব্য সাহিত্যের আরও পূর্ণতা আসবে—

"If we can get a continuous inspiration from the overmind,
that would mean a greater height of perfection"

('Letters-p'. 95-96)

আবার তিনি নিম্নতর চেতনা থেকে সৃষ্ট শিল্পগুলিকেও নিকৃষ্ট বলেননি। যাঁরা প্রাচীন কবি তাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছেন। যেমন—শেক্সপীয়র, বাল্মীকি, ব্যাসকে পৃথিবীর প্রথম সারির কবি বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায় শিল্পের বিবর্তনের ধারায় ঊর্ধ্বতর চেতনার কথা বললেও ঊর্ধ্বতর চেতনাকেই শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি স্বরূপ গ্রহণ করেননি, জীবনের সঙ্গে গভীর যোগ, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গভীরে উপলব্ধি ও শিল্পরূপের উৎকর্ষকেই তিনি শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করেছেন।

নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় প্রথমেই বিবেচ্য শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা প্রশ্ন একথা বলাই বাহুল্য যে, প্লেটো, শেলী, রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রীঅরবিন্দ দিব্যপ্রেরণায় বিশ্বাসী ছিলেন। প্লেটো এই দিব্যপ্রেরণার নাম দেন 'Enthusias mas'। একদিকে শ্রীঅরবিন্দ দিব্যপ্রেরণায় বিশ্বাস করেছেন অন্যদিকে তিনি কাব্য তথা শিল্পকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে নীরবে যুক্ত করে দিয়েছেন। কাব্যে আধ্যাত্মিকতা না থাকলেও চলবে কিন্তু জীবনকে শিল্পসৃষ্টি থেকে বাদ দেওয়া চলবে না। জীবনাদি সৃষ্টিতে স্বতোৎসারিত প্রেরণা আনতে পারে তবে সেই সৃষ্টির আধ্যাত্মিকতা ছাড়াও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে শ্রীঅরবিন্দ এ কথা স্বীকার করেছেন যে সাহিত্য জীবনের স্থূল উপাদান গ্রহণ করলেও তার আসল ক্ষেত্র হল কল্পনার সূক্ষ্মলোক।

প্রকৃতির জড় বিধান থেকে মানুষের মন যেমন মুক্ত হয়ে চলেছে, শিল্প সৃষ্টি বাহ্য প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে, তেমনি মানুষের চেতনা মনের স্তর পেরিয়ে ক্রমশ ঊর্ধ্বে অতিমানস চেতনার দিকে উঠে চলেছে। মন থেকে এই যে অতিমানসের দিকে চেতনার গতি এর মধ্যবর্তী অনেক স্তর আছে। এই স্তরগুলি প্রধানত নিচে থেকে ক্রমশ উপর দিকে—

অতিমানস Super mind

↑

অধিমানস Over mind

↑

বোধিমানস Intuitive mind

↑

জ্যোতির্মানস Illuminated mind

↑

ঊর্ধ্ব মানস Higher mind

↑

মন Mind

মন থেকে উঠে এসে মস্তিষ্কের এলাকা পেরিয়ে আমাদের চেতনা ক্রমশ এই স্তরগুলিতে ধাপে-ধাপে উত্তরণ লাভ করেছে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের কাব্য এবং শিল্প মানব চেতনাস্তর থেকেই রচিত বা সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতের কাব্য এবং শিল্প ক্রমশ এই সব ঊর্ধ্বতর স্তরের যে-কোনোটি থেকে সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

> "কয়েকজন কবির মধ্যে ঊর্ধ্বতন চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস এবং A.E." শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, এ পর্যন্ত মানুষের চেতনা যত ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ হয়েছে তার শীর্ষবিন্দুতে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।"

মানুষের চেতনার যেমন ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ ঘটেছে তেমনি তার চারিপাশে সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং তার অন্তর্মুখী গভীরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের চেতনার বিস্তার ঘটছে তিনভাবে—(১) ঊর্ধ্বায়ন (২) প্রসারণ (৩) গভীরতামুখী অবগাহন। শিল্পী এবং গভীরতর তত্ত্ব উদ্ঘাটন। 'ফ্রয়েড' ইতিপূর্বেই মানুষের মনের উপরের স্তর বের করে অনেক গভীরতর অবচেতন ও অচেতন স্তর আবিষ্কার করেছেন। কাব্য এবং শিল্পের 'পরাবাস্তববাদ' (Surrealism) বা 'চেতনা প্রবাহ' (Stream of consciousness) প্রভৃতি মতবাদে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

কাব্যকে শ্রীঅরবিন্দ মানুষের ঊর্ধ্বতর তথা গভীরতর চেতনার সৃষ্টি রূপে দেখেছেন এবং এই গভীরতর ঊর্ধ্বতর চেতনার সৃষ্টি হলে কাব্য মানুষের অন্তরতম সত্যকে প্রকাশ করবে। তখন কাব্য হয়ে উঠবে ভাবঘন, সংহত, গভীরতর সত্যের ছন্দিত প্রকাশ। বৈদিক ঋষিরা যাকে বলেছেন মন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দের মতে ভবিষ্যতের কবিতা যতই গভীরতর জীবনসত্যের দিকে এগিয়ে যাবে ততই তা মন্ত্র হয়ে উঠবে। কিন্তু এ কথা মনে করা ভুল হবে যে কাব্য হবে দার্শনিক তত্ত্বের পদ্যরূপ। শ্রীঅরবিন্দ তা বলতে চাননি। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন—দার্শনিক তত্ত্ব অবলম্বন করে পদ্য রচনা করলেই তা কাব্য হয় না। কাব্যকে তিনি মূলত কাব্যই রেখেছেন। কাব্যকে দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশরূপে দেখতে চাননি।

৪১১.২.৮.২ কাব্যের আত্মা

কাব্যের অন্তরে যথাযথ প্রবেশ না করে তাকে বাইরে থেকে বিচার করতে গেলে প্রকৃত মনের কাছে প্রতিভাত হয়—কাব্য যেন কল্পনা, বুদ্ধি ও শ্রুতির এক রকমের উন্নত মানের চিত্ত নিবেদন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কাব্যের আত্মা, তার অন্তরের উদ্দেশ্য, গভীরতা বিধানের প্রয়োজন ছিল না। কাব্যের কাছে দুই রকম আনন্দ উপলব্ধি করা যায়—(১) বাহ্য-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আনন্দ (২) আত্মার কল্পনালব্ধ আনন্দ। আর এই আনন্দ আমাদের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনা বা শ্রুতি কোনোটাই কাব্যের উচ্চতম স্রষ্টা নয়। আসল স্রষ্টা হল অন্তরাত্মা। কাব্য বাণী যত সহজতরভাবে অন্তরাত্মায় গভীরে পৌঁছতে পারে, কাব্য তত মহৎ হয়ে ওঠে। আনন্দ যেমন ব্যাখ্যাতা, সৃষ্টিকর্তা, তেমনি উদ্‌ঘাটিয়তা এবং রূপ-নির্মাতা। সেই আনন্দকেই কবির আত্মা অনুভব করে থাকে। একরকম বলা যায়—আধ্যাত্মিক সত্য, মহাচেতনা এবং সর্বভূতের যে জীবন,। কবির আনন্দ হল তারই প্রতিচ্ছবি। এ হল এক মহাশক্তির বিস্তার।

এক ধরনের সমালোচকরা বলে থাকেন কাব্য হল আপেক্ষিকমাত্র। আঙ্গিক যতই অপরিহার্য হোক না কেন, অন্যান্য শিল্পের চেয়ে কাব্যে বোধ হয় তার স্থান অনেক কম। কারণ প্রথমত—কাব্যের প্রকরণ অর্থাৎ ছন্দবদ্ধ বাক্‌, তা সূক্ষ্ম ও অমৃত উপাদানে পূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, শিল্প স্রষ্টায় মধ্যে কাব্য হল সবচেয়ে জটিল, নমনীয় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই তার বিস্তার অসীম। কাব্যের দুটি সত্তা অনুভূতিময় উপাদান রয়েছে। তা হল—(১) ধ্বনি (২) অর্থ বা চিন্তা। আর এই দুইয়ে রয়েছে আত্মিক মূল্য। এই উপাদানগুলি যদিও কাব্যের আঙ্গিকদের আশ্রয় করে গড়ে উঠে। কিন্তু কাব্য আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই উপাদান তা নির্দিষ্ট গণ্ডিকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। সুতরাং বলা যায় কাব্য তার নিজের অবসর নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। তা কোনো বাহ্যিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কবি কাব্য সৃষ্টিতে আঙ্গিককে আয়ত্ত করে মাত্র। কবি-আত্মাও একটি প্রেরণালব্ধ ছন্দ, একটি অন্তর্জাত ধ্যানলব্ধ আত্মজাগরণ গড়ে উঠে। এই ধ্যানলব্ধ বাক্‌ই হল শ্রেষ্ঠতম কাব্য বাণী।

মানুষের মধ্যে প্রাণশক্তির উন্মেষ ঘটে ষড়ভঙ্গিমার সাহায্যে। বিশেষ বিশেষ ধ্বনি যে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ করেও বুদ্ধিগত দিক থেকে যে-কোনো ধ্বনি যে-কোনো অর্থই প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, মানুষের প্রাণে অনুভূতি, আবেগ ও স্থূল মানসিকতা স্পন্দন সৃষ্টি করার ক্ষমতা ধ্বনির রয়েছে। কাব্যে ধ্বনি ব্যঞ্জনাশক্তির প্রতীক। তার প্রাণের ও বীর্যের প্রতি আবেগ, অনুভূতি ও প্রাণের ব্যঞ্জনাকেই আবিষ্কার করে না, তার আত্মাকেও সে সামনে তুলে ধরে। সুতরাং শাস্ত্রে যে অর্থ বহনকারী কাব্য তাকে সীমাহীন অর্থ ব্যঞ্জনায় উপনীত করে। তাই তো কাব্য শুধু প্রাণের ব্যঞ্জনাকে আবিষ্কার করে না, শব্দের আত্মিক, অভিব্যঞ্জনাকে, আত্মাকে তুলে ধরে, এবং সূক্ষ্ম দর্শন ও ভাবকে প্রকাশ করে। কাব্যের ছন্দ: স্পন্দনের প্রকাশ ও গতি আসে আমাদের অন্তরাত্মায় সূক্ষ্ম দর্শনজনিত আত্মিক সংবেদন থেকে। এই সূক্ষ্ম দর্শন প্রকৃতি, ঈশ্বর, মানুষ, প্রাণীজীবন ও বস্তুজীবনে এবং যে-কোনো কিছু হতে পারে। হতে পারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য, চিন্তাজাত সত্যে, সুখ-দুঃখে, কিংবা জীবন দর্শনে। এর ফলেই পাওয়া যায় প্রকৃত খাঁটি কবিতা, মহৎ কাব্য।

ভাষা যেসব জিনিসকে প্রকাশ করে, তার মধ্যে দুটি উপাদান থাকে। বাহ্য উপাদান এবং আত্মিকভাব। তাই তো কবি আবেগের ক্ষেত্রে শুধু আবেগকেই চায় না, আত্মাকেও চায়। কাব্যে কবির প্রয়াস হল তার বাণীতে জীবনের

সত্য বা প্রকৃতির সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। এই মহত্তর সত্য, আনন্দ ও সৌন্দর্যই কবি অনুসন্ধান করে চলেছেন। তিনি খুঁজে চলেছেন সেই সত্য, এবং সেই সত্যকে যা সুন্দর। তাই তো কবির নিজের ভিতরকার সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে আমাদের কাছে উপহার দেন অন্তরাত্মায় আনন্দ। গদ্যে আবৃত করে দেয় কাব্যশৈলীর ও কাব্যিক আত্মা। এই তীব্রতা ও গভীরতার উৎস ভাষা। বাণীর অন্তরে অন্তরাত্মার সূক্ষ্মতার তীব্রতা থেকে এর রক্ষা।

৪১১.২.৮.৩ রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু

কাব্যের ছন্দস্পন্দনের মতো রচনাশৈলীরও একটি উদ্দেশ্য আছে। রচনাশৈলীর প্রসঙ্গটি আমাদের লক্ষণীয় বিষয়। যে-কোনো রচনাশৈলীর মধ্যে কিছু শক্তি আছে যাকে ছন্দরূপে দেওয়া হয়েছে। তাকে কাব্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আমাদের কাজ এই শক্তির প্রয়োজন এবং এর গভীরতা কতটুকু তা বিশ্লেষণ করা। অনেক কাব্যকে আমরা সাহিত্যের আঙ্গিনায় নিই না। কারণ সেই কাব্যের প্রকাশরীতি, গদ্যশৈলী লক্ষণীয়। কিন্তু ভুললে হবে না, কাব্যশৈলীর মুখ্য বিষয় হল উপস্থাপিত বিষয়কে কল্পনার দৃষ্টিতে অন্তরের আবেগে অনুভূতিগুলিকে জীবন্ত করে তোলা, যা গদ্যশৈলীর উপাদান থেকে খুব বেশি পার্থক্য নেই। তবুও কাব্যে একটি নির্দিষ্ট চিন্তাশক্তি, বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি ও মূল্যবোধ প্রকট হয়ে ওঠে।

কাব্যের মধ্যে চিত্রকল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের মতো মানুষের মনের কাছে মূর্তিমান চিত্র ভাস্বর হয়ে উঠে। কাব্যবাণীর মূল কথা হল পাঠকের চিন্তা ও অনুভব করা নয়, বরং বহু বিষয়কে আমাদের কাছে এনে দৃশ্যপট তৈরি করা। কাব্য ভাষার প্রাথমিক ফলশ্রুতি এবং শক্তি হল এই দৃশ্য রচনা করা। কারণ প্রকৃতি জগতে আমরা যাকে নিয়ে থাকি, আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় রাজ্যে, কবি আমাদের শেখান তাকে নিয়ে অন্তরাত্মার মধ্যে, তাকে মানসে মনে ও হৃদয়ে অবস্থান করতে। আর তার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মা দিয়ে অন্তরাত্মারই আলোতে অন্তরের দিব্য চক্ষু দিয়ে আমরা দেখে থাকি। প্রাচীন পণ্ডিতেরা যেমন বলেন কবি হলেন ঋষি স্রষ্টা। তিনি শুধু ছন্দের যাদুকর নন, কবিশাস্ত্র রচয়িতার কলাকুশলী নন, তিনি পংক্তিতে ও স্তবকে স্তবকে চিন্তাশক্তির প্রতিফলন ঘটান না। তিনি সীমার গণ্ডি অতিক্রম করে লাভ করেন দিব্যবাণীশক্তি। যে বাণী আমাদের জ্যোতির্ময়ী দর্শন থেকে বেরিয়ে আসে। আর সেই বাণীকে লাভ করার জন্যই কাব্যশৈলীর সাধনা।

আধুনিক মতানুযায়ী কাব্যের আবেদন হল বুদ্ধির কাছে নয়, কল্পনার কাছে। কল্পনাও আবার অনেক রকমের। যেমন—বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনা, যা জীবন ও জগতের বাহ্য চাপের সঙ্গে দৃশ্যমান। ভাবনিষ্ঠ কল্পনা যা মনের ও আবেগের সঙ্গে জড়িত। এই সব ছবি মনের রাজ্যে কল্পনার জন্ম দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও রয়েছে খেয়ালী কল্পনা যা মনকে অস্থির করে না। আছে নান্দনিক কল্পনা যা বিলাস বাণী ও চিত্রকল্পের সৌন্দর্য নিয়ে গঠিত। কাব্য সৃষ্টিতে এই সবেরই নিজস্ব স্থান আছে। কাব্যশৈলীর ক্ষেত্রে এগুলি প্রণয়ন মাত্র। আসলে কবি-কল্পনা বাস্তব অবাস্তব কারোর স্রষ্টা নয়, সে শুধু সত্যের দ্রষ্টা। শিল্পের মতো কাব্যেও প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি অনুকরণও হয় না। কিংবা কল্পনার রহস্য ব্যাখ্যা করেন মাত্র। যা আমাদের কাছে গোপন থাকে, কিন্তু সঠিক সময়ে তার দ্বারস্থ হলে আমাদের কাছে রহস্যকে মেলে ধরে।

আরেক ধরনের রচনাশৈলী যা বিষয়বস্তু অনুযায়ী হয়ে থাকে। কারণ কবির দৃষ্টি ও তার ভাষার মধ্যে মিল একাত্ম হয়ে যায়। তবে এই মিল বা একাত্ম সর্বদাই নির্ভুল নয়। কাব্যে প্রাণময় শৈলীর একটি নিজস্বতা আছে। তেমনি আবেগময় শৈলীরও নিজস্ব শক্তি আছে। আবার সুনির্দিষ্ট শৈলীরও মৌলিকতা লক্ষ করা যায়।

তবে এই সব শৈলীরও নিজস্ব শক্তি থাকলেও উচ্চতর কল্পনায় ভাষা থেকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। কারণ চিন্তা ও আবেগের একনিষ্ঠ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—

There's not a joy the world can give like that it takes away.

এই পংক্তিতে বায়রন সস্তা আবেগের স্ফুটন ঘটিয়েছেন মাত্র। কারণ এখানে বিশ্বব্যাপী বেদনাকে ব্যক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

Gods in this heaven
Alls right with the world.

এখানে ব্রাউনিং উচ্চশক্তিসম্পন্ন ভঙ্গিতে বিশ্বের আনন্দকে ধ্বনিত করেছেন মাত্র।

কাব্যশৈলীর যেখানে আমাদের পৌঁছানো প্রয়োজন, এর থেকে ঊর্ধ্বতর এক শৈলী আছে, যা বুদ্ধি, প্রাণ শক্তি, আবেগ শক্তি কাব্য ভাষা কিছুই নয়—তা হল কবির সূক্ষ্ম দর্শনের মহৎ এক সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্য বস্তুনিষ্ঠ বা ভাবনিষ্ঠ উভয়ই হতে পারে। সে সৌন্দর্য কখনও অল্প কখনও বেশি হতে পারে। যাতে থাকে অন্তরাত্মার অপরিসীম শক্তি, যা কাব্যের ভাষা ছন্দের প্রবাহকে বয়ে নিয়ে যায়। যদিও তার তীব্রতার তারতম্য লক্ষণীয়। কখনও সৌন্দর্যের জন্য কাব্যিক প্রয়াস, কখনও কবিমনের সচেতন অভিপ্রায়, অন্তরাত্মায় গভীরতম বিন্দুকে গড়ে তুলেছে বাহ্য সৌন্দর্য দিয়ে, সেখানে চিত্রকল্প সৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। আর এই সৌন্দর্যই আমাদের মধ্যে উঠে আসবে চিত্রকল্পের মাধ্যমে। কাব্যের এই চিত্রকল্প ও আধ্যাত্মিক আনন্দ হল সৃষ্টিশীল কাব্যিক উল্লাস।

কাব্যের আনন্দ, চিত্র, তীব্রতা কোনো একটি বিশেষ রচনাশৈলীতে আছে তা নয়, কাব্য ভাষার কোনো বিষয়ের উপর নির্ভর করে না একে অলংকৃত চিত্রসমূহ রচনাশৈলীর সর্বোচ্চ বিকাশেরই মধ্যেই পেতে পারে। যেমন পেয়েছি কালিদাস ও Shakespeare-কে। তাঁদের রচনায় প্রত্যেকটি শব্দকে যথাসম্ভব সর্বাধিক ছন্দস্পন্দন ও ভাব ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করে তুলেছেন তীব্রতার কোনো মাধ্যম নয়। এই তীব্রতা ও কাব্যশৈলী হল অভিন্ন বস্তু। 'বাক্' নিজেই অধিষ্ঠাতা। নিজের উপাদান নিজেই সৃষ্টি করে চলে। বাইরের সৌন্দর্য যাই হোক না কেন, অন্তরের মন্ত্রই কাব্যে একমাত্র উপযোগী শৈলী।

৪১১.২.৮.৪ ছন্দস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাশ্চাত্যের কান্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকের দর্শন বা আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদের যুক্তিতর্কলব্ধ দর্শনের মতো নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—তাঁর দর্শন তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। এই দার্শনিক চিন্তা তাঁর নন্দনতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল। তিনি মনে করেন, কাব্য হল আমাদের গভীরতম সত্তার—আমাদের অন্তরাত্মার জীবন্ত অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত উপলব্ধির প্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দের মতে 'ভবিষ্যতের কবিতা যতই গভীরতর জীবনসত্যের দিকে এগিয়ে যাবে ততই তা মন্ত্র হয়ে উঠবে। এই মন্ত্রের সৃষ্টি হবে একমাত্র তখনই যখন কাব্যে ত্রিবিধ তীব্রতা সাধিত হবে। এই ত্রিবিধ তীব্রতা হল, প্রথমত, ছন্দোময় গতিপ্রবাহের সর্বাধিক তীব্রতা, দ্বিতীয়ত, বাণীরূপ ও চিন্তাবস্তুর পরস্পর পিনদ্ধতা অর্থাৎ রচনাশৈলীর সর্বাধিক তীব্রতা এবং তৃতীয়ত, অন্তরাত্মার সত্যদর্শনের সর্বাধিক তীব্রতা। সমস্ত মহৎ কাব্যের জন্ম এই তিন উপাদানের ঐক্যতান থেকে। এই তিন উপাদানের মধ্যে যে-কোনো একটির ঘাটতি হলে কাব্য মহৎ কাব্যের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়।

উল্লেখিত তিনটি উপাদানের মধ্যে প্রাথমিক গুরুত্ব হল কাব্যের ছন্দস্পন্দন। এই ছন্দস্পন্দন শুধু ছন্দের বহিরঙ্গ কারুকার্য নয়। অর্থাৎ ছন্দের মিল বা মাত্রাবিধানের খুঁটিনাটি পরিমাপ হলে তা সার্থক হবে না। ছন্দের আসল স্পন্দন কবি হৃদয়ের গভীরতম স্পন্দন থেকে আসে। তার মানে ছন্দ শুধু কাব্যের বাইরের পোষাক নয়। ছন্দ হল কবির স্পন্দিত আবেগের অভিব্যক্তি। এই জন্য শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"যখন আমরা কাব্যের গতিপ্রবাহের কথা বলি, তখন শুধু পদ্যবন্ধের যান্ত্রিক ছন্দস্পন্দনকেই বোঝাতে চাই না, এমনকি তার নিখুঁত আঙ্গিকগত চমৎকারিত্ব থাকলেও না। সেই পারিপাট্য হল শুধু প্রথম ধাপ, শুধু স্থূল ভিত্তি। এর উপরে থাকা চাই এক গভীরতর সূক্ষ্মতর সঙ্গীত, এক ছন্দিত আত্মিক গতি, যা ছন্দের যান্ত্রিক কাঠামোয় প্রবেশ করে এবং তাকে ছাপিয়ে যায়।"

শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য হল আমাদের অন্তরতম সত্তাতেই নিত্য ছন্দস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে। কবির কাব্যে খাঁটি ছন্দ হল এই অন্তরের স্পন্দনেরই বাহ্য অভিব্যক্তি। সুতরাং ছন্দের উৎস কবির গভীরতম সত্তার কাছে। এই আবেদন শ্রোতা বা পাঠকের গভীরতম সত্তার কাছে। এই আবেদন কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে—"আমাদের ভিতরের একটি কান আছে, যার দাবি আরও অনেক বড়। সেই ভিতরের কানের কাছে পৌঁছান এবং তাকে তৃপ্ত করাই হল সুরমাধুর্য ও সুরসুষমার স্রষ্টার সত্যকার উদ্দেশ্য।"

শ্রীঅরবিন্দ মহৎ কাব্যের সঙ্গে ছন্দ গভীরভাবে অন্বিত বলে মনে করেন। সাম্প্রতিক কালের একটি প্রবণতা হল ছন্দস্পন্দন ত্যাগ করে গদ্যকবিতা রচনা। হুইটম্যান ও কার্পেন্টারের কবিতাই এই প্রবণতার বাহন। ফ্রান্স ও ইতালিতে এই ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। গদ্যকাব্যের সমর্থক কবিরা মনে করেন যে, পদ্য ছন্দের বন্ধন কাব্যের পায়ে একটা শিকলের বেড়ি এঁটে দেয়। পদ্যছন্দ স্বাধীনভাবে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এই সীমা ভেঙে গদ্যকাব্যের রচয়িতা কাব্যের ভাবকে মুক্তি দিতে চান। শ্রীঅরবিন্দের মতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একথা সত্য হলেও সর্বক্ষেত্রে সত্যি নয়। অনেক মহাকবি ছন্দবন্ধনকে মেনে নিয়েই অনেক মহৎ কাব্যের মহৎ ভাবকে প্রকাশ করেছেন। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার, শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে ছন্দবদ্ধতা প্রতিবন্ধক নয় এবং যারা গদ্যকাব্য রচনা করেছেন তারা এই মহাকবিদের চেয়ে বড় সৃষ্টি রেখে যেতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন গদ্যকাব্যের রচয়িতারা যতদিন না তাঁদের নতুন গদ্যকাব্য নিয়ে এমন সৃষ্টি রেখে যেতে পারছেন, যার পাশে অতীতের মহান স্রষ্টাদের সৃষ্টিগুলি ম্লান হয়ে যায়, ততদিন তাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। এমনকি, রবীন্দ্রনাথও একসময় গদ্যকবিতা রচনা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেও গদ্যছন্দ ছেড়ে পদ্যছন্দে ফিরে আসতে হয়েছে। এবং গদ্যছন্দে রচিত তাঁর কবিতাগুলি পদ্যছন্দে রচিত কবিতাগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট এমন কথা আমরা বলতে পারি না।

মিলটন প্রথম জীবনে একসময় মিত্রাক্ষরে কবিতা রচনা করেছিলেন। পরে তিনি নিজেই মিত্রাক্ষর ত্যাগ করে অমিত্রাক্ষরে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু প্রথম জীবনের কবিতাগুলি মিত্রাক্ষরে রচিত বলে লিরিক কবিতা হিসাবে কোনোক্রমে নিকৃষ্ট নয়। আর পরবর্তীকালে অমিত্রাক্ষরে তিনি মহাকাব্য রচনা করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে অমিত্রাক্ষরও এক রকমের পদ্যছন্দ, এটা গদ্যছন্দ নয়। তিনি একথাও বলেছেন—"শুধু ভাষার শক্তির সঙ্গে ছন্দোযন্ত্রের টুংটাং ধ্বনির যাদু এসে মিলিত হলেই তা কাব্যের মহত্তর পরিচয় বহন করে না। কাব্যের রূপ বা ছায়া তার থাকতে পারে, কিন্তু কাব্যের আত্মা তার নেই।"

অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ এ কথাও বলেছেন বাঁধাধরা সুরসুষমা বা সুরমাধুর্যে কান তৃপ্ত হলেও নান্দনিক চেতনা নিম্নগামী হয়। সবসময় এ কথা স্মরণে রাখতে হবে শিল্পীত রূপ ও শ্রুতিমধুরতা নয়, বরং তা হয়ে উঠবে—"অন্তরের এমন একটা কিছু যা ভিতরের সংগুপ্ত সুষমার একটা প্রতিধ্বনি এনে ধরতে চাইছে, আমাদের অন্তর্লোকের

ছন্দিত অসীমতার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছে।” উচ্চতর সুরসুষমা ও সুরমাধুর্য পূর্ণ ছন্দস্পন্দন অন্তরাত্মাকে স্পন্দিত করে। আর তখন “এর আধারে কানায় কানায় ভরে ওঠে সঙ্গীত; কখনো বা মনে হয়, এ কাব্যে গড়িয়ে গিয়ে হারিয়ে গেল সেই সঙ্গীতেরই মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যে সঙ্গীতের গতিপ্রবাহের ভিন্নতর একটি অধরা আধ্যাত্মিক রহস্য রয়েছে।” আর সেই কাব্যই মহৎ সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে।

৪১১.২.৮.৫ কবির সূক্ষ্মদর্শন ও মন্ত্র

কাব্যের তীব্রতা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যখন এর গভীরতা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আধার হয়ে উঠে, তখনই জীবনবোধ, চিন্তাশক্তি, আবেগ এবং বস্তুর সৌন্দর্যের দর্শনজনিত তীব্রতায় পরিণত হয়। সেই সাথে কাব্যের উদ্‌ঘাটন বস্তুসৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। মহৎ কাব্য-বাণী হল বস্তুর উদ্‌ঘাটন। কাব্যের ক্ষেত্রে এই দুটি উপাদানই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহৎ কবিদের ক্ষেত্রে তীব্রতা লক্ষ করা যায় জোয়ারের জলের ন্যায়, কারণ কবির এইসব সূক্ষ্ম মুহূর্তের আবির্ভাব হয় কবির সূক্ষ্মদর্শন ও কাব্যবাণীর অটুট শক্তি থেকে।

সূক্ষ্মদর্শন হল কবির নিজস্ব শক্তি। সমস্ত মহৎ কাব্যই তার নিজস্ব আদর্শ ও তাৎপর্যের সেই মহত্তর সত্যকে সংরক্ষিত রাখে। তাই কাব্যের আবেদন আমাদের ভিতরের কানের কাছে। আর কানের ভিতর দিয়েই কাব্যকে মরমে পৌঁছতে হবে। ফলে কবি আমাদের বহির্দৃষ্টি নয়—অন্তর্দৃষ্টির মুক্তি ঘটান। যারা মহৎ কবি হয়ে উঠতে পেরেছেন, তাঁরা প্রকৃতি মানুষও জীবনকে ব্যাপক ও বলিষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী এবং বোধিলব্ধ সূক্ষ্ম দর্শনের অধিকারী, সেই সূক্ষ্মদর্শনের সর্বোত্তম প্রকাশেই কাব্যের জন্ম। হোমার, শেক্সপীয়র, দান্তে, বাল্মীকি, কালিদাস সকলেরই সূক্ষ্মদর্শনই মহত্ত্বের মৌলিক লক্ষণ। যদিও চিন্তাশক্তি চিত্রসম্ভার ও কাব্যিক প্রকাশ ভঙ্গির ছিল মাত্র, এগুলি কাব্যের উৎস বা আত্মা ছিল না। বিশেষ দৃষ্টি হল কবিপ্রতিভার মূল শক্তি। আসলে কবিরা হলেন কাব্য-সত্যের দ্রষ্টা ও শ্রোতা।

আধুনিক গতিসৌন্দর্য ও সৃষ্টিশীল কবিদৃষ্টির ব্যাপকতা আমরা চাই না, সত্যদ্রষ্টা ঋষি হয়ে উঠুক কবিরা। বরং আমাদের কাছে কবিরা দার্শনিক নবী, আচার্য এবং একটি ধর্ম বা নীতির প্রচারক হয়ে উঠুক, কারণ আমরা যখন সত্য একই ঋষির ভূমিকা দাবি করি কিংবা ঈশ্বর, দেব-দেবী কিংবা মানুষ প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টির মহৎ কাব্য খুঁজে পাই। কারণ মানব জাতি ও জীবনদর্শনের উপদেশ বাণী কাব্যের মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে।

ঈশ্বর বাণী কিংবা বিধান দেন আদেশ হিসাবে। কিংবা কবি সত্যকে ফুটিয়ে তোলেন সৌন্দর্য শক্তির মধ্যে এবং প্রতীকী ও চিত্রকল্পের মধ্যে। অর্থাৎ সত্যের প্রকাশ প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে লীলার মধ্যে। দার্শনিক ও কবির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা যায়। দার্শনিকের কাজ মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করা এবং সত্যের বিভিন্ন দিক বিন্যস্ত করা। কবির কাজ সত্যের বিভিন্ন দিককে ধারণ করা এবং একটি জীবন্ত সম্পর্ককে উপস্থাপন করা। অর্থাৎ কবি সত্যের রূপকাষ্ঠে সংবেদনের বশে সত্যের আদর্শকে সৌন্দর্যের মাধ্যমে সৃষ্টি করা।

আবার একজন নবীর সাথে একজন কবির সঙ্গে চিন্তার বিভিন্ন পদ্ধতি লক্ষ করা যায় তখন নবীর মধ্যে কবির অবস্থান হতে পারে। তিনি তাঁর অনুভূতি ভাষা ও বাণীকে প্রাণের ভেতরে ঘিরে রাখেন। ভবিষ্যতের চিন্তা করো না।—নবী এই নির্দেশকে খুঁজে পান সত্যে, সৌন্দর্যবাণী প্রকাশ বাণী, চিত্রকল্পে। দার্শনিক তেমনি তাঁর নিরস মুক্তিজাল থেকে মুক্তি দেবার জন্য এবং মুক্তির ঘন আবরণে রং ও রেখার ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু এসবই অভ্যন্তরীণ স্তর নয়—বাইরের অলংকার মাত্র। দার্শনিক যদি তাঁর চিন্তাকে কাব্যের বিষয় করে তোলেন

তবে তিনি দার্শনিক ভাবুক থাকেন না, তিনি ঋষি কবি হয়ে উঠেন। তাই কট্টর পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা অনেককেই দার্শনিক বলতে অস্বীকার করেন। কারণ তিনি চিন্তা করেন না, ভাবুক নয়। তিনি স্রষ্টা। তাঁর চিন্তা স্বচ্ছ হতে পারে, সঠিকও হতে পারে। কিন্তু এ দৃষ্টি দার্শনিক মস্তিষ্ক দিয়ে নয়—ঋষির চোখ দিয়ে। দার্শনিক কবিতাও দার্শনিক মনের দেখবার রীতি, পদ্ধতি ও প্রকাশ ভঙ্গিমা—তা যত দূরে যাবে ততই কাব্য নামে প্রতিফলিত হবে। এবং কাব্যরূপেই বেঁচে থাকবে। তার সূক্ষ্মদর্শন নিজেকে চিন্তা সমৃদ্ধ চিত্রকল্পের মাধ্যমে ঢেলে দেবে।

যদিও পূর্বে এই পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়ে উঠেনি। সেজন্য আমরা বেশ শক্তিশালী কবির দার্শনিক মতবাদকে, দার্শনিক মতবাদের চেয়েও বেশি গদ্যময় বিষয়কে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হ্যাসিয়দ ও ভার্জিলের কথা।

ভার্জিলের 'Geogrgies' (কৃষিবিদ্যা) কাব্যটি সুন্দর সুন্দর অনুচ্ছেদে নিসর্গ চিত্রে, ছন্দ ও চিত্রকল্পের সৌন্দর্যে আজও বেঁচে আছে। ভারতবর্ষই এই দার্শনিক প্রয়াসকে কাব্যিক সাফল্যে রূপান্তর করতে পেরেছে। যেমন গীতা ও উপনিষদে আদর্শের পরিকল্পিত কয়েকটি অপ্রধান রচনা। গীতায় কাব্যিক সাফল্য হল—জীবনের এক মহান সংকটময় পরিস্থিতি, দ্বিতীয়ত গীতায় যে আধ্যাত্মিক রীতির অনুভূতিকে জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে প্রকাশ করে। এমনকি কখনও কখনও পদ্যে রচিত কিন্তু গদ্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আসলে উপনিষদগুলি দার্শনিক মনন থেকেও আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎ দর্শন বেশি।

আসলে বর্তমানে আমাদের নান্দনিকবোধ রোমের কবিদের ভ্রান্তিকে সরিয়ে যেতে পেরেছি। আজও কাব্যে একটি সূক্ষ্মতর রূপে বুদ্ধির প্রবণতাকে অনধিক প্রবেশের মনোভাব লক্ষ করা যায়। আসলে সমালোচনা দার্শনিক ভাবকে কাব্যে প্রকাশ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু আরন্ডলের মতানুযায়ী "কাব্য হল জীবনের সমালোচনা।"

শিল্প রূপের দিক থেকেও কোনো দার্শনিক সত্যের প্রকাশ কাব্যের মূল সূত্র নয়। বরং মূল মন্ত্র হল অন্তরাত্মা আত্মদর্শন এবং ঈশ্বর প্রকৃতি জগৎ এবং অন্তর্সত্যের সদ্‌গত দর্শন ছন্দময় প্রকাশই হল কাব্য।

জীবন সম্পর্কে শিল্পীর সে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত, সেই দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করতে এরকম পার্থক্য রচনা করা হয়ে থাকে। যেমন জীবন ভাবনিষ্ঠ-বস্তুনিষ্ঠ পার্থক্য, ভাববাদী ও জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। একজন কবি বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা দেখতে পারেন। কিন্তু যখন ভাগবত বিষয় তুলে ধরতে যান তখনই তাঁর হাত কাঁপে। দৃঢ় মুষ্টিতে ধরতে পারেন না। আবার একজন কবি ভাবগত জগতে বিচরণ করতে পারেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। কিন্তু তাঁরা উভয়ই উঁচুস্তরের কবি হতে পারেন। পরিষ্কারভাবে কাব্যকে জীবন্ত করে তুলতে কবির নির্দিষ্ট বস্তুনিষ্ঠতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবগত দৃষ্টি রূপায়ণও দরকার। কবির সৃষ্টি বাইরের জীবন থেকেও ভেতরে জীবনের প্রভাবই বেশি তাই বাইরের দৃষ্টি কাজে লাগায় মাত্র, অন্তর্দৃষ্টিকেই শিল্পসৃষ্টির কাঠামো করে তুলতে হয়।

বস্তুমুখী শিল্প থেকে আমাদের ফোটোগ্রাফিতে নিয়ে আসি। আর ভাবমুখী দৃষ্টিভঙ্গিকে কমানোর প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের পক্ষেই উপযুক্ত—কাব্যের পক্ষে নয়। এর দ্বারা মহত্তর সত্যকে বা অধিক বাস্তবকে পাওয়া যায় না। বরং হারানোর সম্ভাবনাই বেশি। বৈজ্ঞানিক উপস্থাপন নির্ভুল হলেও আত্মার কাছে খাঁটি বস্তু ও পূর্ণ সত্য নয়—তা বস্তুর প্রক্রিয়ামাত্র। বস্তুবাদী শিল্পকলা আদৌ শিল্পনামের যোগ্য হলেও জীবনের যথাযথ উপস্থাপন নয়। বিজ্ঞানের উপস্থাপন হতে পারে। কারণ কোনো শিল্পই বিজ্ঞান নয়, শিল্প-বিজ্ঞান হতে পারে না। ভাববাদী

শিল্পকলা সৃষ্টি করে করে শক্তিশালী রচনা, সৌন্দর্য ও কাল্পনিক ইন্দ্রজাল। যদিও দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে কবির জন্যে এই আইন করা যায় না। কারণ কবি বলেন নিজের দেখা যায় অনুযায়ী। এতটুকু বলা যায় কাব্যে কবির অন্তরের জাগ্রত শিল্পেরই সৃষ্টি করবেন—কোনো কৃত্রিমতা নয়।

আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাব্যের মূল বিষয় ছাড়া অন্য সব উপাদান কবির নিজের মতানুযায়ী চলবে। তবে সর্বক্ষেত্রেই একটি জিনিস দরকার—তা হল যে সব শব্দ, চিত্রকল্প ব্যবহার করবেন, এর দ্বারা কবি সেই মূল সত্যের আলোকে পৌঁছবেন। কবির স্বতন্ত্র সত্তা সেই সত্যের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। কবিও নিজেকে তার সৃষ্টির মধ্যেই লীন করে দেন। স্রষ্টার নিজস্ব ও সূক্ষ্মদর্শন অসীময়তা হারিয়ে যায়। তখন সর্বভূতের যিনি আত্মা তিনি একচ্ছত্র আধিপত্য করেন।

অন্যসব জিনিসের কবি সূক্ষ্মদর্শনও মানব মনের বিবর্তনের সাথে যুগ ও পরিবেশ অনুযায়ী উত্থান-পতন ঘটে। যেমন প্রথম যুগে মানুষের দৃষ্টি ছিল চারি পাশের বস্তুজগতের দিকেই জীবনের গল্পে ও তার ধ্যান-ধারণা আবদ্ধ। তারপর আসে পরিচিত বাস্তব জগতের পরিকল্পিত চিত্র। সেই পর্বে লক্ষ করা যায় মানুষের প্রাণশক্তির আনন্দ ও উৎসুক্য, তার অস্তিত্বের জীবন কামনা ও রোমাঞ্চকর অনুভব। এর দ্বারা মানুষ প্রত্যাশা করল কাব্যে ও শিল্পে উপস্থাপিত কল্পনা ও আবেগের মাধ্যমে। তারপর সে শুরু করল বিষয়বস্তু নিয়ে বুদ্ধির কারসাজি। ক্রমানুযায়ী উন্নত নান্দনিক চেতনার জাগ্রত আনন্দের রূপ নিল। ফলে মানুষের মন ও আবেগের মাধ্যমে কল্পনার কাছে আবেদন সৃষ্টি কাব্য এক ধরনের কবিতা। এবং বুদ্ধির কাছে মানসিক স্তরের কবিতাই হল প্রাচীন ও আধুনিক যুগের দুই অবদান। পরবর্তী কাব্য আরও সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সমৃদ্ধ জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে এক শিল্প রূপ গড়ে উঠেছে, এখানেই কাব্যের একটি নির্দিষ্ট সীমা। এই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে কাব্য এক মহৎ কাজ করতে পারে। কবিকে এই সত্য নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হয়েছে। মানুষের মন জীবনের ক্রিয়াশীল, অন্তসত্তার মন এবং অন্তসত্তার শক্তিগুলিকে নিবিড়ভাবে গড়ে তোলে। তখন কাব্য সৃষ্টির ঊর্ধ্বতর স্তরে আবির্ভূত হয়। আরও গভীরতায় ও বিস্তারতর দিকেই পৌঁছয়। কবির দৃষ্টি যে সত্য দর্শন করে এবং কাব্য শক্তি সেই মহত্তর কাজটি সম্পূর্ণ করে। এজন্যেই কাব্য দৃষ্টি ও কাব্য শক্তির পূর্ণতা আসে।

ভাষা ও ছন্দের শ্রেষ্ঠতাই কাব্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ভাষা ছন্দের সার্থকতা আগে, যখন কাব্যে সূক্ষ্মদর্শনের তীব্রতা থাকে। কবির দৃষ্টি শুধু ব্যক্তিগত দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে না; দেশ-কালে মানসিকতার উপরেও নির্ভর করে। একটি মহান যুগের একজন ছোট্ট কবিও মহৎ কবিকে ছাপিয়ে যেতে পারে। একজন কবির মুহূর্তের সূক্ষ্মদর্শন শেক্সপীয়র, দান্তে-এর থেকে আমাদের মনে বেশি দাগ কাটতে পারে। যদি মানবজাতি তার নিজের বিকাশগুলোকে সেইযুগের সাথে মিলিয়ে নেয় তবে তার আগে অনেক দৃঢ় জায়গায় পৌঁছাতে পারে। যার সার্থক রূপ ও প্রতীক সূক্ষ্মদর্শনের সাথে মিলিয়ে দিতে পারে।

৪১১.২.৮.৬ কাব্যের জাতীয় বিবর্তন

জাতীয় জীবনের বিবর্তনের সাথে কাব্যের সম্পর্ক আমরা পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছি। কারণ কাব্যের সাথে জাতীয় জীবনের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'ভবিষ্যতের কবিতা গ্রন্থে' বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। কবির সৃষ্টি যে শুধু নিজের উপর ও তাঁর দেশের উপর নির্ভর করে না, তার জাতির মানসিকতার উপর নির্ভর করে। সেই জাতির আধ্যাত্মিক, বৈদিক ও নান্দনিক পরিবেশের উপরও নির্ভরশীল,

তা বলে তিনি নিজেকে সে শুধু জাতির প্রতিধ্বনি ও জাতির অতীত জীবনের ঐতিহ্যের উপর আবদ্ধ থাকবেন না। বাইরের জীবন থেকেও মৌলিক ও নিজস্ব পথ খুঁজে বের করবেন। যেমন বর্তমান কালে আইরিশ ও ভারতীয়রা অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যেও বলিষ্ঠ আত্মচেতনাকে ফিরিয়ে এনেছেন। এবং তাদের সাহিত্য-সচেতন জাতীয়তাবাদ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীঅরবিন্দ কাব্যের সাথে জীবনের সম্পর্কের কথাও স্বীকার করেছেন। কবির সাথে কবিতার তীব্রতাকেও তুলে ধরেছেন। কবির সংস্কৃতি ঐতিহ্য চেতনাই প্রতিফলিত হয় কবিতায়। যদিও কবির সৃষ্টি নিজে থেকেই নিজের ভেতর থেকেই তবুও তাঁর চারপাশের জীবন-অভিজ্ঞতা উপলব্ধি, ভাল-মন্দ, জীবন-দর্শন এ ছাড়া কবির সামগ্রিক পরিবেশ কবিতায় প্রতিফলিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন যুগে যুগপ্রবণতা মানুষের জীবন, সংকট, যুগগত স, সমস্যা কাব্যে উঠে আসে। আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক ভাবনা-চিন্তাও কবির মননকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি কাব্যেও প্রতিফলিত হয়।

কবির সৃষ্টি জাতির মানসিকতার উপরও নির্ভর করে। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব ধর্মীয় প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সেই কবির নিজস্ব ধর্মীয় প্রবণতাই কাব্যে উঠে আসে। কারণ কবিতায় নিজস্ব সংস্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনা না। আমরা যদি কবি জগতের দিকে দৃষ্টি দিই, তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল কবির মধ্যে নিজস্ব জাতীয় মানসিকতায় ও জাতীয় মহাকাব্যের ভাব-প্রবণতা লক্ষ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কাব্যের মধ্য দিয়ে আমরা কবির দ্বারস্থ হতে পারি এবং তাঁর দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি সেই জাতির সত্যকার নান্দনিক অভিব্যক্তি।

একইরকমভাবে কবির সৃষ্টি জাতীয় জীবনের সাথে যুক্ত। অপরদিকে কবি জাতীয় জীবন থেকে যুক্তও বটে। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের অবগত করে গেছেন কবির কাব্য সর্বদাই যে নিজস্ব জাতি ও পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, তা সত্য নয়। কখনো কখনো কাব্যের প্রয়োজনে তিনি স্বজাতিত্ববোধ থেকে বেরিয়ে যান, জাতীয় জীবনে দাঁড়িয়ে কবি এমন কিছু সৃষ্টি করেন, যা তাঁর নিজস্ব জাতিকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। এবং নিজস্ব জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দেয়। যেমন—গোর্কির 'Mother' রচনায় রাশিয়ার উত্থান-পতনকে তুলে ধরেছে। এখানে কবি জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে, জাতির উত্তীর্ণের পথ খুঁজেছেন। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে জাতির স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করেছেন, যা ভারতীয় জাতির মধ্যে নতুন ধারার সূচনা করেছে। এই স্বদেশীচেতনা বা আন্তর্জাতিক ভাবনা বাঙালি জাতির মধ্যে ছিল না বললেই চলে। এভাবেই শিল্পী তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার মধ্য দিয়ে জাতির মুক্তি ঘটান। এরূপ উপাদানগুলি কবির চিত্তে সচেতনভাবেই প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষ ও পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মানুষের সাথে পরিবেশের দারুণভাবে মিল লক্ষ করা যায়। পরিবেশের উপাদান মানবজাতিকে প্রতিনিয়তই পরিচালনা করে বা নিয়ন্ত্রণ করে। স্বভাবতই কবি বা শিল্পীরা নিজস্ব পরিবেশের উপাদানকে অতিক্রম করতে পারেন না। মানুষ তার পরিবেশের সাথে একটা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমালোচনার রীতিতে আবদ্ধ থাকেন। ঐতিহাসিক সমালোচনা বাহ্য এবং অবাস্তব পদ্ধতির কখন বাদ দিলেও ঐতিহাসিক সমালোচনাতত্ত্বের মধ্যে একটা সত্য নিহিত আছে। সেটা কোনো মূল বিষয়কে সত্য-সত্যই সহায়ক হতে পারে, যা আমাদের কাব্য আস্বাদনের ব্যাপারে না হলেও কাব্যের বুদ্ধিগত বিচারে সত্যিই সাহায্য করতে পারে। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বলেন—

“কাব্যাস্বাদনের খাঁটি ঋষি—কবি এবং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যা আমাদের জানা একান্তই প্রয়োজন, তার জন্য সোজাসুজি কবিরাই দ্বারস্থ হতে হবে, তাঁর কাব্যের কাছেই চলে আসতে হবে; সত্যকার নান্দনিক বা কাব্যিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে সত্যিই আমাদের যা দরকার তা সেখানেই আমরা পাব।”

প্রত্যেক মহৎ সৃষ্টির দুটি উপাদান রয়েছে—(১) কালোত্তীর্ণ শাশ্বত সত্য বস্তু (২) কালগত উপাদান নশ্বর বস্তুরাজি। যার দ্বারা আমাদের সুনির্দিষ্ট সমালোচনা যা আমাদের মূল নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত। কবি ব্যক্তিত্বের মধ্যে সত্য ও সুন্দর নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপ নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে। এবং কবির ব্যক্তিগত বুদ্ধি নয়, বরং নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপ আত্মপ্রকাশের বাণীকে খুঁজে বের করে সৃষ্টি করে চলেছেন।

তা সত্ত্বেও কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। এবং শ্রোতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। এই দুইয়ের মিলনের দ্বারা বুদ্ধিগত নান্দনিক বিচারবোধের কাছে কাব্যের আবেদন গিয়ে পৌঁছায়। এই ব্যক্তিগত ও কালগত উপাদান সর্বদাই কাব্যকে আকর্ষণ করে। কাব্যে সে জিনিস আমরা আস্বাদন করি, তার চেয়ে বড় কথা, যেভাবে আমরা আস্বাদন করি সেটাই হল কাব্যের ও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। সেজন্যেই কাব্যসৃষ্টির প্রকাশ ভাব উদ্দেশ্য এবং ব্যঞ্জনা শিল্পরসের বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত সৌন্দর্যে একাত্ব স্থাপন করে।

প্রত্যেক জাতি ও জনগোষ্ঠীর জীবনে একটি মূলভাব থাকে। এই মূলভাবটি মানুষের আত্মার একটি বিশেষ রূপ, এই রূপেই বিবর্তনের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ যা কিছু আরোহণ করে, সবকিছুই তার মূলভাবের মধ্যে মিশিয়ে নেয়। তার কাব্য শিল্প ও দর্শন হল আত্মারই অভিব্যক্তি। কবির আত্মা জাতির চিত্ত মেলে বা জ্বলজ্বল করতে পারে। তার সৃষ্টি জাতির চিত্ত থেকে পৃথক নয়। তবু কবির ব্যক্তিত্বে জাতির মূলভাবের মধ্যেই উদ্‌ঘাটন ঘটে। সুতরাং কাব্যে জাতীয় বিবর্তন এবং তার সঙ্গে কবির সৃষ্টি সম্পর্কে একাত্ম করাই আমাদের চেষ্টা, তা সফল হতে বাধ্য। কাব্যের নিজস্ব আত্মজভাবও রূপের দৃষ্টিভঙ্গি এই সম্পর্ক থেকেই উঠে আসে।

৪১১.২.৮.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যতের কবিতা—অধ্যাপক রামেশ্বর শ অনূদিত (পুস্তক বিপণি)

২. আধুনিক বাংলা উপন্যাস পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ—অধ্যাপক রামেশ্বর শ (পুস্তক বিপণি)

৩. ক. বি. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (ষষ্ঠ সংখ্যা) (Aesthetic and Literary Theory of Sri Aurobindo: Rameswar Shaw)

৪. সাহিত্য বিবেক—ড. বিমল মুখোপাধ্যায় (দে'জ পাবলিশিং)

৫. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (দে'জ পাবলিশিং)

৪১১.২.৮.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১. 'ভবিষ্যতের কবিতা' অবলম্বনে শ্রীঅরবিন্দের নন্দনতত্ত্বের মূল ভাবনা লিপিবদ্ধ করো।

২. কাব্যের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক বলতে শ্রীঅরবিন্দের মতামত আলোচনা করো।

৩. 'ভবিষ্যতের কবিতা' অবলম্বনে কাব্যের আত্মার পরিচয় দাও।

৪. জাতীয় জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক কতটা? শ্রীঅরবিন্দের 'ভবিষ্যতের কবিতা' অবলম্বনে আলোচনা করো।

৫. কাব্যের শৈলী কীরকম হওয়া উচিত তা শ্রীঅরবিন্দের 'ভবিষ্যতের কবিতা' অনুসরণে লিপিবদ্ধ করো।

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক ৯
প্লেটো

বিন্যাসক্রম

৪১১.৩.৯.১ ভূমিকা

৪১১.৩.৯.২ প্লেটোর শিল্পতত্ত্ব

৪১১.৩.৯.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪১১.৩.৯.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.৩.৯.১ ভূমিকা

প্লেটোকে বলা হয় পাশ্চাত্য দর্শনের জনক। এ ছাড়াও নাটক রচনা, কাব্যিকতা ইত্যাদি ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম দিক। সবচেয়ে আশ্চর্যের খ্রিস্টপূর্ব যুগে জন্মগ্রহণ করেও প্রেম ও সৌন্দর্য ভাবনার আদর্শ সোপান গড়েছিলেন তিনি। অসাধারণ মননশক্তির অধিকারী প্লেটো ছিলেন সকল দার্শনিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আজ সারা পৃথিবীতে নান্দনিক ভাবনার যে সুর দার্শনিকদের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, তার উৎস বা সৃষ্টিপথ সেই প্রাচীন গ্রিসে। সেই প্লেটোর মননে। মার্কিন দার্শনিক যথার্থই বলেছেন, ‘প্লেটোই দর্শন, আর দর্শন মানেই প্লেটো।’

তাঁর জন্ম প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স শহরে। খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ থেকে ৩৪৮ অবধি তিনি জীবিত ছিলেন বলেই জানা গেছে। তিনি ছিলেন দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র। অভিজাত পরিবারের এই সন্তান সেসময় অনায়াসে রাজনীতিতে ভালো পদ লাভ করতে পারতেন। কিন্তু সে সব না নিয়ে মেতে উঠেছিলেন দর্শনচিন্তায়। ৩৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি এথেন্সে আকাদেমি খুলেছিলেন। বলা বাহুল্য সেই আকাদেমির ছাত্র ছিলেন অ্যারিস্টটল। প্লেটো কথোপকথন বা সংলাপের ভঙ্গিতে, মূলত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর কাঙ্ক্ষিত বক্তব্য তুলে ধরেছেন বইয়ের পাতায়। প্লেটোর ভাবনার গভীরতা ও ব্যাপকতার সুর লক্ষ করা যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। যেমন ‘এপলোজি’ (Apology), ‘ক্রাইটো’ (Crito), ‘প্রোটাগোরাস’ (Protagoras), ‘গর্জিয়াস’ (Gorgias), ‘সফিস্ট’ (Sophist), ‘সিমপোসিয়াম’ (Symposium), ‘ফিডো’ (Phaedo), ‘দ্য রিপাবলিক’ (The Republic), ‘ক্রিটিয়াস’ (Critias), ‘ল’স (Laws) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না এর মধ্যে ‘দ্য রিপাবলিক’ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

৪১১.৩.৯.২ প্লেটোর শিল্পতত্ত্ব

তাঁর দর্শন ভাবনায় সক্রেটিসের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। সংলাপের আকারে নিজেদের দার্শনিক ভাবনা উপস্থাপন করার পদ্ধতিও সক্রেটিসজাত। তাঁর গ্রন্থ উৎকৃষ্ট সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। বেশির ভাগ সংলাপের ক্ষেত্রেই ডায়ালেক্টিক বা যুক্তি খণ্ডন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—করুণা কী? সাহস কী? ন্যায় ধর্ম কী? প্রথমে এইরকম প্রশ্ন পদ্ধতি, পরে উত্তরদাতারা যে উত্তর দিতেন গ্রন্থের চরিত্র হিসাবে সক্রেটিস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যুত্তর বুঝিয়ে দিতেন আগের উত্তরগুলি যথার্থ নয়। ফলে প্রশ্নোত্তরের পর্বটি দীর্ঘায়িত হয়ে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ দার্শনিক আলোচনায় পর্যবসিত হত। আসলে সক্রেটীয় পদ্ধতিটি ছিল তুলনা, প্রতি তুলনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কোনও বিষয় বা ভাবনাকে পুনর্নির্মাণের প্রবণতা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানান্বেষণের চাহিদা গড়ে তোলাই ছিল প্লেটোর লক্ষ্য। সক্রেটীয় পদ্ধতির মূল কথা ছিল কোনও ধারণাকে যাচাই বা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা। অন্ধভাবে অনুসরণ করাকে তিনি বিশ্বাস করেননি।

প্লেটো দর্শনের আর এক উৎস সফিস্টরা। এঁরা ছিলেন মূলত বাইরে থেকে আসা প্রাচীন গ্রিসের একদল পণ্ডিত। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এঁরা এথেন্সে এসেছিলেন। অতঃপর অর্থের বিনিময়ে এথেন্সবাসীকে ব্যাকরণ, ছন্দ, রাজনীতি, শব্দতত্ত্ব, গণিত, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। সফিস্টদের আরও বড় অবদান ছিল মানুষকে বড় করে দেখার প্রবণতা। মূলত সফিস্টদের জন্যেই গ্রিক দর্শনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে মানুষের নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনৈতিক ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছিল।

সুতরাং বলা যায় প্লেটোর দার্শনিক জীবনের ভিত্তি যেমন ছিলেন সক্রেটিস তেমনি সফিস্টরাও। তবে এটা ঠিক কোনও দার্শনিকের ভাবনাকেই প্লেটো হুবহু গ্রহণ করেননি। এর মধ্যে যেগুলি তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্যি বলে মনে হয়েছিল, সেগুলিকে সামঞ্জস্য করেই তিনি তৈরি করেছিলেন নতুন দার্শনিক তত্ত্ব। আর সেই দর্শন ভাবনা আজও সারা পৃথিবীতে গভীরভাবে প্রসারিত।

আমরা শিল্পতত্ত্বের বিচার করি যে অর্থে সেই অর্থে প্লেটোকে বিচার করা যায় না। কারণ শিল্প বা কাব্য সম্পর্কে তিনি যে মতামত দিয়েছেন তা কখনও দর্শনের আলোকে, কখনও বা রাষ্ট্রনীতির আলোকে উদ্ভাসিত। তবুও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারি। যদিও সেগুলি কাব্যতত্ত্ব হিসাবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। এই হিসাবে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দ্য রিপাবলিক'।

একজন কবি কাব্য রচনা করেন। বাস্তব জগৎ থেকে তাঁকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয়, আবার তিনি অনেক কিছু বর্জনও করেন। 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এইসব মতামত বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এই অংশটাকে 'Education: The First Stage' বলে উল্লেখ করেছেন অনুবাদক ডেসমন্ড লি। কবি ও কাব্যের সংস্কার সাধনে প্রয়াসী ছিলেন প্লেটো। তখনকার যুগে যেহেতু হোমারসহ বিভিন্ন কবির কবিতা মুখস্থ করে আবৃত্তি করার চল ছিল, তাই তিনি সমাজ গঠনে কবিতার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের দশম পুস্তকের নাম ডেসমন্ড লি-র মতে 'Theory of Art' বা 'শিল্পতত্ত্ব'। এখানকার এই অংশটুকু আবার তিনটি উপপর্বে বিভাজিত। সেগুলি এইরকম—

১. শিল্প এবং মায়া (Art and Illusion)
২. শিল্প ও কাব্যের আবেদন (The Appeal of Art and Poetry)
৩. কাব্য ও নাটকের কার্যকারিতা (The Effects of Poetry and Drama)

বিষয়গুলি আলোচনা করলে বোঝা যাবে প্লেটো শিল্প এবং মায়া পর্বে জীবনের উপর থেকে কাব্যের প্রভাবকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন, এর জন্যেই কাব্য বা কবিদের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা। কাব্য যে যুক্তিহীন, অসার বিষয় তা প্রমাণ করতেই তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এখানে তিনি মানব জীবনে বা আদর্শ রাষ্ট্রে কাব্যের কুপ্রভাবকেই লক্ষ করেছেন। কাব্য যেহেতু কল্পনা ও আবেগের উপর নির্ভরশীল, তাই এখানে যুক্তিনির্ভরতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির জায়গা খুবই কম। তাঁর মনে হয়েছে যুক্তিহীন কোনও বিষয় মানবজীবন বা আদর্শ রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি হতে পারে না। তিনি এখানে কোনও শৈল্পিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাননি। বরঞ্চ দর্শনের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই কাব্য ভাবনার নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছিলেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বিষয়, রচনারীতি, কলাকৌশল, তাল ছন্দ ইত্যাদিকে। উপস্থাপনের কৌশল বিষয়ে তিনি প্রথম থেকেই নতুন কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে কী বলা হবে আর কীভাবেই বা তা বলা হবে এ বিষয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন অনেক কথা। তাঁর মনে হয়েছে উত্তম বা তৃতীয় পুরুষে কোনও কাব্যিক বিষয়কে উপস্থাপন করলে তাতে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারে। কাব্যকে যেহেতু তিনি অনুকরণের অনুকরণ বলেছেন, তাই সেটি পরিহারের যোগ্য।

কাব্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও তত্ত্ব না দিলেও তিনি অনেক নতুন কথা বলেছিলেন সেই সময়। এই হিসাবে উল্লেখযোগ্য 'দ্য রিপাবলিক', 'ফিদ্‌রাস', 'ফিলেবাস' প্রভৃতি গ্রন্থে। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল যে অনুকরণ রীতির (Mode of Imitation) কথা বলেছিলেন, তার সূত্রপাত হয়েছিল প্লেটো কথিত 'উপস্থাপনের ধরন' (Manner of Presentation) অনুসারে। তিনি 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থে অনুকরণের ভঙ্গি অনুসারেই মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক ইত্যাদির শ্রেণি বিভাজনের কথা বলেছিলেন। তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে, ট্রাজেডিই পাঠক বা শ্রোতার মনে 'Pity and Fear' (করুণা ও ভয়)-এর সৃষ্টি করে। একই কথা তিনি 'ফিদ্‌রাস' গ্রন্থেও বলেছিলেন। এ ছাড়াও এখানে তিনি শিল্পের ধারণায় সমগ্রতার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেন। ভালো ট্রাজেডি দেখে মানুষের মনে যে 'ট্রাজিক আনন্দ' (Tragic Pleasure) সৃষ্টি হয়, সেকথা তিনি অবশ্য বলেছেন 'ফিলেবাস' গ্রন্থে। এখানে একটি কথা জেনে রাখা ভালো শিল্পতত্ত্বের অনেক সূত্রের সূচনা করেছিলেন প্লেটো স্বয়ং। কিন্তু সবগুলি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। যেগুলি পরবর্তীকালে বিকশিত হয়েছিল তাঁরই শিষ্য অ্যারিস্টটলের হাতে।

'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের তৃতীয় পুস্তকে আছে সুর ও ছন্দের কথা। তিনি বলেছেন—

> "সঙ্গীত শিক্ষা অপর যে কোনও শিক্ষার চেয়ে শক্তিশালী। কারণ সুরের ছন্দ এবং সঙ্গীত আত্মার গভীরে প্রবেশ করে তার চেয়ে সুদৃঢ় প্রভাবে যে সুশিক্ষিত তাকে সুন্দর এবং যে কুশিক্ষিত তাকে অসুন্দর করে তোলে।"

এর থেকে বোঝা যায় প্লেটো সঙ্গীতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন—

> "যে মানুষের মধ্যে সঙ্গীতবোধ আছে সে মনোহরের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুরাগ বোধ করবে।"

উল্লেখ্য এই মনোহারিত্বই হল তাঁর শিল্পভাবনার মূলকথা। কাব্য নয়, প্লেটো সঙ্গীতের আলোকে সৌন্দর্যকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর মতামত যা সুন্দর তাকে ভালোবাসতে শেখা উচিত।

এক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, তা হল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিষাদ বা হতাশার সুরকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথা। এই জন্যেই তিনি একথা বলেছেন। কারণ এখানে কোমলতা ও আলস্যের উপাদান খুব বেশি করে থাকে। মানুষের মনকে বাস্তবজগৎ বহির্ভূত করে তোলে এই সুর। তাই জন্য তিনি প্রাচীন গ্রিসের

দুঃখ সৃষ্টিকারী সুর 'আয়োনীয়' ও 'নীডিয়'কে পরিত্যাগের কথা বলেছিলেন। পরিবর্তে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন যুদ্ধের সুরকে—

> "আমাদের প্রয়োজন যুদ্ধের সুরের; এমন সুরের যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে সেই ধ্বনি, যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় বীরের কণ্ঠে তার আসন্ন বিপদ কিংবা দৃঢ় সংকল্পের মুহূর্তে। কিংবা যখন তার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয় কিংবা বীর যখন কোনও আঘাত পায় বা মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এইরকম মুহূর্তে। জীবনের সঙ্কটে ভাগ্যের এমন আঘাত সহ্য করা দৃঢ়তায় বীর যে ধ্বনি উচ্চারণ করে আমাদের প্রয়োজন সেই সুরের।"

প্লেটোই প্রথম শিল্পের স্বরূপ প্রসঙ্গে মাইমেসিসের (Mimesis) কথা বলেছেন। অর্থাৎ 'Art is imitation Mimesis' বা শিল্প হল অনুকরণের অনুকরণ। 'দ্য রিপাবলিক' (The Republic) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই শব্দটির প্রথম পরিচয় পেলেও তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন দশম খণ্ডে। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডে নাইমেসিসের সমার্থক হিসেবে 'Impersonation'-কেই বুঝিয়েছেন। এখন প্রশ্ন 'Impersonation' বলতে সাধারণ পাঠক কি বুঝবেন? উত্তরে বলা যায়, একজন মানুষ যখন অন্যের ব্যক্তিত্ব, কথাবার্তা, আচার-আচরণ হুবহু অনুকরণ করে অন্যদের দেখায় সেটাই তো 'Impersonation' হিসেবে খ্যাত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্যক্তিক কবিতায় কবি সাধারণত নিজের অনুভূতির কথাই বলেন। কিন্তু নাটক অভিনয় কালে একজন অভিনেতা নিজের কথা না বলে অন্যের কথা বলে থাকেন। সুতরাং তৃতীয় অধ্যায়ে 'Impersonation' আর 'Mimesis' শব্দদ্বয়ের অর্থ ও ব্যবহারের একটা গোলযোগ দেখা গেছে।

ফলে 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের দশম খণ্ডে প্লেটোকে ভাবতে হল শিল্পের অনুকরণ নিয়ে। তাই এখানে 'মাইমেসিস' শব্দটিকে 'Imitation' ও 'Representation'-এর সমার্থক করেছিলেন। প্লেটোর মনে হয়েছিল পৃথিবীর কোনও অনুকরণই সত্য নয়। প্লেটোর মতে অনুকরণ মাত্রেই অন্যের নকল। সাহিত্যে যা দেখা যায় সেটি আসলে চোখের সামনে দেখা জীবন ও জগৎকে নকল করা। সাহিত্য বা শিল্পে 'Creativity' বা কোনও সৃজনকে লক্ষ করেননি তিনি। এই ভাবনা তার মনে এসেছিল 'ধারণাতত্ত্ব' (Theory of Idea) থেকে। অর্থাৎ পৃথিবীতে একটা আইডিয়ার জগৎ আছে যার সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর কোনও মিল নেই। বাস্তব পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এই আইডিয়ার জগৎ থেকে নকলিকৃত হয়ে এসেছে। আর কবিরা ওই বস্তুজগতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। ফলে তাঁদের কাব্য আসলে নকলের নকল।

প্লেটোর এই ধারণার সঙ্গে ভারতীয় ধারণার যথেষ্ট মিল আছে। ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। প্লেটোর ব্রহ্ম আসলে তাঁর কল্পিত আইডিয়ার জগৎ। আর বাস্তব পৃথিবীর জগৎ উভয়ের কাছেই এক। ভারতীয় দর্শনের মতো প্লেটোর দর্শনেও এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে। তবে শঙ্করাচার্য বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক ছিলেন। তিনিই বলেছেন, 'জীব ব্রহ্মৈব না পর।' অর্থাৎ জীব আর ব্রহ্ম ভিন্ন নয়। বিশ্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের মেতা সম্পৃক্ত। এখানেই প্লেটো ও শঙ্করাচার্য ভিন্ন। বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাক বা না থাক, সেটাই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন প্লেটো। কবিরা আইডিয়ার জগৎ নয়, বস্তুজগৎকে সামনে রেখেই কাব্য রচনা করে থাকেন। অনুকৃত বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য সম্পর্কে প্লেটোর বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন যে পৃথিবীতে যা যা সুন্দর, যা সৎ তাদেরকে অনুকরণ করাই কবিদের কাজ। কখনওই অসুন্দরকে অনুকরণ করা ঠিক হবে না। তাহলে তার প্রভাব পড়তে পারে রাষ্ট্রের উপর। এইদিক থেকে প্লেটো কাব্যের মূল খুঁজেছেন আনন্দ দানের শক্তিতে নয়, সত্যকে জানার আহ্বানে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে প্লেটো ছিলেন কাব্যের ক্ষেত্রে অনুকরণের বিরোধী। তাই শিল্প বা সাহিত্যকে তিনি সাদা মনে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ অনুকরণ প্রক্রিয়া। তিনি মনে করেছিলেন যে, অনুকরণ আসলে কোনও কবির ত্রুটিযুক্ত অসম্পূর্ণ কাজ। অনুকরণ কখনও আসল হতে পারে না। কখনওই সত্যের স্বাদ দেয় না। কখনওই সুসামঞ্জস্য রূপে প্রতীয়মান হয় না। তাই জন্যেই অনুকৃত শিল্প প্লেটোর অপছন্দের।

প্লেটোর আলোচনায় নিজরে কথাতেই কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। ট্রাজেডি প্রসঙ্গে তিনি সত্য থেকে তিন ধাপ সরে যাওয়ার কথা বলেছেন। আবার কখনও বলেছেন দুই ধাপ সরার কথা। কবি বা শিল্পীর অনুকরণের বিষয় কখনও প্রকৃতি হতে পারে, কখনও হতে পারে মানব সৃষ্টি কৃত্রিম জগৎ। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আসলে ঈশ্বরের নিজ হাতে গড়া 'Idea'-র অনুকরণ। এক্ষেত্রে কবিরা সত্যি থেকে দুই ধাপ পিছিয়ে। অর্থাৎ 'Idea'-এর সত্য, আর সেখান থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অনুকরণ। কিন্তু যেখানে মানুষ নিজে থেকে এই বাস্তব পৃথিবীতে কিছু তৈরি করেছে, তখন তাকে দেখে কবি বা শিল্পী যখন কাব্য বা চিত্র আঁকছেন, তখন সেটা সত্যি থেকে তিন ধাপ সরে এসেছে। কারণ ঈশ্বরের মনের 'Idea' থেকে কোনও কিছু তৈরি, তা দেখে মনুষ্যসমাজ কিছু তৈরি করলে কবিরা যখন সেটা দেখে কিছু অনুকরণ করে, সেটা হয় সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে। আবার বলা যায় নাটকের ক্ষেত্রে কবি বা শিল্পীকৃত মানবীয় আচরণের অনুকরণ করলে সেটা হয়ে যায় সত্যি থেকে তিন ধাপ দূরের অবস্থান।

আসলে প্লেটো ছিলেন ভাবলোকে বিশ্বাসী। অতীন্দ্রিয়বাদ তাঁর দর্শনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। কাব্যিক দৃষ্টিতে শিল্পকে তিনি বিশ্লেষণ করেননি। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তাঁর কাব্য বিচারের মূল সুর। তবুও বলা যায় কোনও নমুনা সামনে না পেয়ে তিনি যেভাবে কাব্য বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছিলেন তা আজও বিস্ময়কর। প্লেটোর অনুকরণ সংক্রান্ত আলোচনায় স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি দুটি দিকের মাঝামাঝিতে অবস্থান করেছেন। একদিকে তাঁকে টেনে রেখেছে শিল্পের অধিবিদ্যক সংজ্ঞা, অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবনে শিল্পের প্রয়োজনীয়তামূলক চিন্তা। কোনও দিককে সঠিকভাবে গুরুত্ব দিয়ে তিনি কাব্যকে বিশ্লেষণ করতে পারেননি। তাই আধুনিক জীবনে প্রায় সকলেই প্লেটোর শিল্প ব্যাখ্যা মেনে নিতে অসম্মত হয়েছেন।

৪১১.৩.৯.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. প্লেটোর শিল্পভাবনা তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থকে সামনে রেখে বুঝিয়ে দাও।
২. শিল্প হল অনুকরণের অনুকরণ (Art is Imitation Mimesis) বলতে প্লেটো ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন?

৪১১.৩.৯.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. নন্দনতত্ত্ব—ড. সুধীর কুমার নন্দী
২. পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা—নবেন্দু সেন সম্পাদিত
৩. সাহিত্য বিবেক—বিমল মুখোপাধ্যায়
৪. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
৫. নন্দনতত্ত্বের প্রতীচ্য—সুখেন বিশ্বাস
৬. ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব: প্লেটো অ্যারিস্টটল—সুখেন বিশ্বাস

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক ১০
অ্যারিস্টটল

বিন্যাসক্রম

৪১১.৩.১০.১ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স

৪১১.৩.১০.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪১১.৩.১০.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.৩.১০.১ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স

অ্যারিস্টটল খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ সালে থারেস উপকূলবর্তী স্টাগিরাস নামক এক গ্রিক উপনিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিকোম্যাকাস ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আমিন্টাসের রাজসভায় গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। অ্যারিস্টটল বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তাঁকে প্রাণিবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থের শুরুতেই Poetry নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ কবিতা কি এই বিষয়টি নিয়ে চুল চেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ছিলেন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর ছাত্র। অ্যারিস্টটল নীতিশাস্ত্র, অধিবিদ্যা, রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। তাঁর লেখা রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ—‘দি পলিটিকস্’ এ ছাড়াও ‘দি এথিকস্’, ‘দি লজিক’ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌সে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অনুকরণ তত্ত্ব। অনুকরণ তত্ত্ব কথাটি গ্রিক সাহিত্যে তাঁর আগেও অবশ্য প্রচলিত ছিল, তাঁর গুরু প্লেটোও অনুকরণ অর্থেই mimesis শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'Art is imitation mimesis'। কিন্তু mimesis শব্দটিকে প্লেটো যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন, অ্যারিস্টটল সে অর্থে প্রয়োগ করেননি। প্লেটোর কাছে এই ‘অনুকরণ’ ছিল একটা ভাববাদী ধারণা মাত্র, অ্যারিস্টটল তাকে বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্লেটোর ধারণার সঙ্গে তুলনা না করলে অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্বের তাৎপর্য বোঝা যাবে না, তাই সেটাই আগে করা যাক।

প্লেটো মনে করতেন আমরা চোখের সামনে যে পৃথিবী দেখছি সেটা একটা অনুকরণ মাত্র, আসল বা ‘আইডিয়াল’ পৃথিবীর ধারণা রয়েছে ঈশ্বরের মনে। কবিরা সেই ‘আইডিয়ালে’র যে অনুকরণ চোখে দেখতে পান, তার আবার একটা অনুকরণ করেন। সেইজন্যই আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের তিনি নির্বাসিত করতে চেয়েছেন—কবিরা নকলের আবার নকল করে সত্য থেকে অনেকটা দূরে চলে যান।

অ্যারিস্টটল প্লেটোর এই ‘আইডিয়াল’কে স্বীকার করেননি, দৃশ্যমান জগৎকেই তিনি আসল মনে করেছেন।

কবিরা এই সৃষ্টির অনুকরণ করতে গিয়ে আর একটা নতুন সৃষ্টি করে ফেলেন, যা আমাদের আনন্দ দেয়। সুতরাং কবিদের তিনি কোনো মতেই নিন্দার যোগ্য মনে করতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, প্লেটো মনে করতেন কেবলমাত্র সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই কবির কর্তব্য, অসুন্দর বস্তুর অনুকরণ করলে তাঁরা নিজেদের মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। অ্যারিস্টটল প্লেটোর এই ধারণাকেও সমর্থন করেননি, তিনি বলেছেন যা আপাত-অসুন্দর তাও কবির হাতে আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে, সেই কারণে কেবল সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই শিল্পীর কাজ হতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, ভাববাদী ধারণা বর্জন করে শিল্পকলার আলোচনাকে অ্যারিস্টটল বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর আগে শিল্প সম্বন্ধে অনেক ভাববাদী ধারণা প্রচলিত ছিল—ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, প্রেরণা ছাড়া সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি করার জন্য আলাদা রকমের প্রতিভার দরকার হয় ইত্যাদি। অ্যারিস্টটল এই সমস্ত ভাববাদকে নস্যাৎ করে, বলতে চাইলেন, প্রত্যেকটি জীবেরই অনুকরণ করবার একটি প্রবণতা আছে, মানুষের এই ক্ষমতা সর্বাধিক—সে অনুকরণ করতে চায় এবং অন্যান্য জীবের চেয়ে ভালো অনুকরণ করে। এই অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই সাহিত্য-শিল্পাদির জন্ম, কোনো বিশেষ প্রতিভা বা প্রেরণা থেকে নয়। একেই বলা হয় অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্ব বা mimesis theory। এই তত্ত্বটিকেই তিনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে বোঝা যায় এই একই অনুকরণ প্রবণতা কীভাবে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের জন্ম দেয় এবং বড় শিল্পী ও মাঝারি শিল্পীর তফাত করে দেয়।

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছেন, অনুকরণ প্রবণতা শিল্পের জন্মদাতা হলেও এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পের তফাত হয়ে যায় তিনটি ব্যাপারে—অনুকরণের বিষয়, অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের রীতি। অনুকরণের বিষয় প্রকৃতি হলে তা চিত্রশিল্পের জন্ম দেয়, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বিষয় মানুষের মনোভাব বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হলে তা নৃত্যের জন্ম দেয়, মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মানুষ প্রধান বিষয় হলে সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। মাধ্যমের পার্থক্যগুলিও লক্ষ করবার মতো—চিত্রশিল্পের মাধ্যম রঙ ও তুলি, নৃত্যের মাধ্যম দেহভঙ্গিমা, ভাস্কর্যের মাধ্যম ও উপাদান পাথর, সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা, উপাদান কাগজ, কলম। রীতি পাল্টালেও শিল্পের প্রকৃতি পাল্টে যায়। সাহিত্য শিল্পেও রীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হয়।

এবার অনুকরণ তত্ত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য আমাদের বুঝে নিতে হবে। প্লেটো যে অনুকরণের কথা বলেছেন তা ছিল বিশুদ্ধভাবে imitate করা, অর্থাৎ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং—যেমন দেখছ তেমন নকল করো। সত্যের অনুকরণকে বলেছেন eikastike, তা গ্রহণীয়; মিথ্যার অনুকরণকে বলেছেন phantastike, তা বর্জনীয়। অ্যারিস্টটল কিন্তু mimesis-এর দ্বারা বিশুদ্ধ নকলকে বোঝাতে চাননি। ‘মিটিওরলজি’ গ্রন্থে বলেছেন, অনুকরণ ঠিক নয়—শিল্প প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, ‘পলিটিক্সে’ বললেন, প্রকৃতির অপূর্ণতা শিল্প পূর্ণ করে, ‘মেটাফিজিক্স’ গ্রন্থে বলেছেন শিল্প আর প্রকৃতি হচ্ছে দুই উদ্দীপক শক্তি—প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্পের তাগিদ, শিল্পের প্রবর্তনা রয়েছে শিল্পীর হৃদয়ে। ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থে তিনি বললেন, কাব্য মানুষ ও মানবিক আচার ব্যবহারকে অনুকরণ করে বটে, কিন্তু তা যান্ত্রিক অনুকরণ মোটেই নয়, আদর্শায়িত অনুকরণ। বাইওয়াটারের অনুবাদে তা এইভাবে বলা হয়েছে—'Imitation is the idealistic representation of universal element in human nature and sight.' আদর্শায়িত অনুকরণ কী, তা জানতে গেলে universal element বা জীবনের সামগ্রিক সত্য কাকে বলে সেটা বুঝতে হবে।

মানুষের জীবনে যত ঘটনা ঘটে সেই সমগ্র ঘটনা তুলে ধরলেই তা সামগ্রিক ঘটনা হয় না, এবং তা তুলে ধরা সম্ভবও নয়। হোমার তাঁর মহাকাব্যে যুদ্ধের কিছু দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সব যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই বলেননি, অথচ জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কেমন করে হল এটা। তাহলে universal বলতে কী বোঝান অ্যারিস্টটল, সেটা বাইওয়াটারের অনুবাদ থেকেই জেনে নেওয়া যাক। অনুবাদে পাই— 'By the universal I mean how a person of certain type on occasion speak or act according to the law of probability or necessity.' অর্থাৎ কিনা এক বিশেষ পরিস্থিতি বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ সম্ভাব্যতার বিষয় ভেবে যে আচরণ করে, তাই হল universal। সম্ভাব্যতার নিয়ম অবশ্য পদার্থশাস্ত্রের বিষয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, একটি চরিত্রের বিশেষ পরিস্থিতির আচরণ যদি সম্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তাহলেই তার মধ্যে থাকে একটা শাশ্বত সত্য যাকে আমরা বলি universal বা সার্বজনীন বা সামগ্রিক সত্য। এটাকেই অ্যারিস্টটল যখন বড় করে দেখছেন, তখন আমরা বুঝতে পারি অনুকরণকে তিনি নিছক 'নকল' হিসাবে দেখছেন না, দেখছেন এক শিল্প প্রক্রিয়া হিসাবে। কবি কেবল অনুকরণ করেন না, জীবনের শাশ্বত সত্যে পৌঁছবার জন্য তাকে একটি পন্থা হিসাবে অবলম্বন করেন মাত্র।

কবি যে অসুন্দর ও কুৎসিত ঘটনাকেও অবলম্বন ও অনুকরণ করতে পারেন—মানে প্লেটো 'phantastike' বলে যে অনুকরণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন, তাকেও যে মোটেই নিষিদ্ধ বলে মনে করেন না অ্যারিস্টটল, তার কারণও ওই সম্ভাব্যতার মধ্যেই আছে। অর্থাৎ, জীবনের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলবার কাজে যদি তা সহায়তা করে তবে জীবনের অসুন্দর বৃত্তিগুলির অনুকরণও কবি করতে পারেন বলে তিনি মনে করেন।

বস্তুত প্লেটোর mimesis এবং অ্যারিস্টটলের mimesis-এর মধ্যে মিল শুধু কাজে, দুজনের ধারণায় আছে বিরাট তফাত। এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে তিনি গুরুর সংজ্ঞা থেকেই শুরু করেছেন এবং সে কারণে অনুকরণ দিয়েই তাঁকে আলোচনা আরম্ভ করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর অনুকরণের মধ্যে গ্রহণ, বর্জন, পরিশোধন ইত্যাদি শৈল্পিক ক্রিয়াগুলি আছে—কবি কেবল যান্ত্রিকভাবে জগৎ ও জীবনের নকল করেন, এ কথা তিনি বলেননি। জীবনের এক সামগ্রিক রূপ নির্মাণের অবলম্বন হচ্ছে অনুকরণ, এই হল তাঁর অভিমত এবং তাঁর অনুকরণ তত্ত্বে আমরা পাই একই সঙ্গে শিল্পীর প্রচুর সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা।

অ্যারিস্টটল শিল্পের সৌন্দর্যে ও সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ''অ্যারিস্টটলের ভাবনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, সৌন্দর্য, আনন্দ, চিত্তোৎকর্ষ প্রভৃতির মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক ধরা পড়েছে এবং শিল্প মাত্রেরই অন্তরঙ্গ লক্ষণের মধ্যে তা নিহিত হয়ে আছে, শিল্পের আসল ধর্ম তা যেমন সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টি করে, তেমনি আবার বোধকেও জাগ্রত করে।" সর্বোপরি মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রধান ভূমিকা নেয়। অ্যারিস্টটল তাই 'মাইমেসিস'-কেই কাব্য বা সাহিত্য-শিল্পের সাধারণ লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল চালসিস নামক শহরে ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মারা যান। সাহিত্যতত্ত্বের গুরু হিসেবে আজও অ্যারিস্টটল স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৪১১.৩.১০.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. অ্যারিস্টটলের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করো।

৪১১.৩.১০.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সৌন্দর্যতত্ত্ব—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
২. রসসমীক্ষা—রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
৩. নন্দনতত্ত্বের সূত্র—অরুণ ভট্টাচার্য
৪. Illusion and Reality—Christopher Caudwell
৫. Asthetics—Benedetto Croce

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক ১১
শিলার

বিন্যাসক্রম

৪১১.৩.১১.১ নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ

৪১১.৩.১১.২ নন্দনতাত্ত্বিক শিলার

৪১১.৩.১১.২.১ ব্যক্তি পরিচয়

৪১১.৩.১১.২.২ সাহিত্য জীবন

৪১১.৩.১১.২.৩ নান্দনিকতার অধ্যয়ন

৪১১.৩.১১.২.৪ শিলারের রচনাসমূহ

৪১১.৩.১১.৩ শিলারের প্রতিভার বিশ্লেষণ

৪১১.৩.১১.৪ উপসংহার

৪১১.৩.১১.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪১১.৩.১১.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.৩.১১.১ নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ

'সৌন্দর্যতত্ত্ব' কথাটি ব্যাপক। এ কারণে এর বিষয়বস্তুর সীমা নির্দিষ্ট করা কষ্টকর। সৌন্দর্যতত্ত্বের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি, শিল্পকলার বিচার, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য প্রভৃতি সমস্যাকে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনে সৌন্দর্যতত্ত্বের ভূমিকা আলোচিত হয়।

সাধারণভাবে সৌন্দর্যানুভূতিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি আদিম অনুভূতি বলে মনে করা হয়। প্রকৃতির মোকাবিলায় আদিমকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসাবে কাজ করেছে। এরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনো কোনোটি মানুষের মনের আবেগময় প্রতিক্রিয়া। এই আবেগময় প্রতিক্রিয়ার মূলে মানুষের জীবন রক্ষার অচেতন জৈবিক প্রয়োজনই আদিকালে সমধিক কাজ করেছে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনা এবং শক্তির প্রকাশকে আপন জীবন রক্ষার সহায়ক কিংবা ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত করেছে। এ সমস্ত শক্তিকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মনে জাগরুক রাখার সে চেষ্টা করেছে। এই আদিম বোধ থেকেই আদি শিল্পকার্যের সৃষ্টি। এই উৎস থেকে সামাজিক ভালোমন্দ বোধেরও উৎপত্তি।

মানুষের নিজের জীবনের মতোই সৌন্দর্যানুভূতির ইতিহাস দীর্ঘ। সভ্যতার জটিল বিকাশের ধারায় সৌন্দর্যতত্ত্বকেও প্রাথমিক যুগে সহজ এবং আধুনিককালে জটিল এবং অবাস্তবের লক্ষণযুক্ত দেখা যায়।

কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির মনের আবেগময় অনুভূতি এবং তার ভাষাগত প্রকাশ ব্যতীত শিল্পকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত এবং অন্যান্য মানবিক সৃষ্টিকে সুন্দর কিংবা অসুন্দর এবং ভালো কিংবা মন্দ হিসাবে বিচারের প্রয়াসকে সৌন্দর্যতত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। সৌন্দর্যতত্ত্ব বলতে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তত্ত্বকে বুঝায় না। এর দ্বারা উপরোক্ত বিষয়গুলির উপরে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চিন্তাবিদের চিন্তা কিংবা ভাবধারার কথা বুঝায়। সৌন্দর্যতত্ত্বের সামগ্রিক আলোচনায় সুন্দর এবং অসুন্দরের অথবা ভাল এবং মন্দের কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ কিংবা মানদণ্ড আছে কিনা সে প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করা হয়।

সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীনের দাস-প্রধান সমাজে লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে গ্রিসের হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং অপরাপর দার্শনিকের রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের জটিলতর বিকাশের আমরা সাক্ষাৎ পাই। প্রাচীন রোমের দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এবং হোরেসও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিন এবং টমাস একুইনাস প্রমুখ ধর্মতাত্ত্বিকগণ সৌন্দর্যতত্ত্বে রহস্যবাদের আমদানি করেন। তাদের মতে জগতাতীত এক ঐশ্বরিক সুন্দরের অস্তিত্ব রয়েছে। সেই ঐশ্বরিক সুন্দরের মানদণ্ডেই জাগতিক বস্তুনিচয়ের সৌন্দর্য পরিমাপ করতে হবে। মধ্যযুগের এই রহস্যবাদের প্রতিক্রিয়া ঘটে পরবর্তীকালে নব-জাগরণের চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকগণের মধ্যে। এঁদের মধ্যে পেতরার্ক, আলবার্ট, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, দুরার, ব্রুনো এবং মন্টেনের নাম বিখ্যাত। পাশ্চাত্যের নব-জাগরণের পরবর্তী জ্ঞানান্বেষণের যুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে বার্ক, হোগার্ত, ডিডেরক, রুশো, লেসিং প্রমুখ খ্যাতি অর্জন করেন। মানবতাবাদের এই ঐতিহ্যকে বহন করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিলার এবং গ্যেটে ঘোষণা করেন যে, সৌন্দর্য এবং শিল্পের উৎস হল মানুষ এবং তার বাস্তব জীবন।

সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাসে দুটি প্রধান ধারার সাক্ষাৎ সব যুগেই পাওয়া যায়। এদের একটি হচ্ছে সৌন্দর্য সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণা; অপরটি ভাববাদী। ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্ব সৌন্দর্যকে অতি-প্রাকৃতিক একটি সত্তা বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। অতি-প্রাকৃতিক এই সত্তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এবং সিদ্ধির অতীত। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই এই নিকষ সুন্দরকে উপলব্ধি করা সম্ভব। এরূপ ব্যাখ্যায় ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং সুন্দরের ধর্মীয় রহস্যবাদী কল্পনায় কোনো পার্থক্য নেই। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞানতার মোহে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস সমাজের শক্তিমান শ্রেণিগুলো সব যুগেই করে এসেছে। সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে দর্শনের অন্যান্য মৌলিক প্রশ্নের ন্যায় ভাববাদের বিরোধী ব্যাখ্যা হচ্ছে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মানুষের বাস্তব পরিবেশ এবং জীবনের মধ্যেই সৌন্দর্যানুভূতির সৃষ্টি এবং বিকাশকে লক্ষ করেছেন। সৌন্দর্যতত্ত্বে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের বিরোধ সমাজের শোষক এবং শোষিতের বাস্তব বিরোধের ভাবগত প্রতিফলন।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সৌন্দর্যতত্ত্বে তিনটি প্রশ্ন মূল (১) বস্তুজগতে সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং বিকাশ; (২) মনোজগতে সৌন্দর্যানুভূতির ব্যাখ্যা, এবং (৩) শিল্পকর্মের মূল্যায়ন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের প্রবহমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের ধারাতে ক্রমাধিক পরিমাণে আনন্দজনক জীবনযাপনের তাগিদে সুন্দর, অসুন্দর, মহৎ, হীন, হর্ষ এবং বিষাদ প্রভৃতি অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যাপকতা দিক থেকে সৌন্দর্যতত্ত্ব কেবল শিল্পকলার সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণ করে না। শিল্পকলার সৌন্দর্যের বিশ্লেষণে সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি প্রয়োগগত দিক মাত্র। ব্যাপকভাবে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচ্য হচ্ছে মানুষ। তার

সৃজনশীল ক্ষমতার বাস্তব প্রকাশে, মহতের জন্য জীবন উৎসর্গে, দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামে যে আনন্দানুভূতি সে বোধ করে কিংবা বর্বরতার আঘাতে যে ঘৃণা তার মনে উদ্ভূত হয়, তার বিকাশ-প্রক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ব্যুৎপত্তি

দর্শনের একটি বিশেষ শাখা হল নন্দনতত্ত্ব। এর বিষয় সৌন্দর্য। বাংলা ভাষায় এই শব্দটি গৃহীত হয়েছে সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদ থেকে (নন্দন বিষয়ক তত্ত্ব/কর্মধারয় সমাস)। সংস্কৃত ক্রিয়ামূল √নন্দ্ এর ভাবগত অর্থ হল— আনন্দ পাওয়া, আনন্দ দান করা। এর সাথে অন্ (ল্যুট) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নন্দন শব্দ তৈরি হয়েছে। √নন্দ্ (আনন্দ পাওয়া, আনন্দ দান করা) + অন্ (ল্যুট) = নন্দন

নন্দন শব্দের আরও একটি রূপতাত্ত্বিক রূপ রয়েছে। এই শব্দটি উৎপন্ন হয় ণিজন্ত √নন্দি ক্রিয়ামূল থেকে। এর সাথে ইন্ (ইনি) প্রত্যয় যুক্ত হয়েও নন্দন শব্দ তৈরি হয়। √নন্দি ইন্ + (ইনি) = নন্দন

এই বিচারে নন্দন শব্দের অর্থ দাঁড়ায়— যা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় বা যার দ্বারা আনন্দ দেওয়া যায়, তাই নন্দন। যেহেতু আনন্দের উৎস সৌন্দর্য তাই নন্দন শব্দের অন্য অর্থ হল—সৌন্দর্য প্রদায়ক। এই বিচারে নন্দনতত্ত্বের আভিধানিক অর্থ হল—সৌন্দর্যপ্রদায়ক তত্ত্ব। কিন্তু দর্শনবিদ্যার একটি বিশেষ শাখা হিসেবে নন্দনতত্ত্ব ব্যাপক অর্থ প্রদান করে। যতদূর জানা যায়, নন্দনতত্ত্ব শব্দটি প্রথম উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের 'আধুনিক কাব্য' নামক প্রবন্ধে তিনি একটি বাক্যে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এই ভাবে— 'নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে।'

রবীন্দ্রনাথ নন্দনতত্ত্ব এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব দুটো শব্দই ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে Aesthetics-এর বাংলা শব্দ 'নন্দনতত্ত্ব'-ই প্রচলিত। এই শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য। সত্তাতত্ত্ব অনুসারে এই শব্দের শ্রেণিকরণ করা হয় নিচের বিধি অনুসারে। ঊর্ধ্বক্রমবাচকতা { নন্দনতত্ত্ব | দর্শন | মানবিক বিজ্ঞান | জ্ঞান-শাখা | জ্ঞানস্বক্ষেত্র | প্রজ্ঞা | জ্ঞান | মনস্তাত্ত্বিক বিষয় | বিমূর্তন | বিমূর্ত সত্তা | সত্তা |}

ইংরেজি ব্যুৎপত্তি

এর ইংরেজি Aesthetics, esthetics। এই শব্দটির উৎস গ্রিক। গ্রিক αισθητικος (aisthetikos, আইসথেটিকস), এর অর্থ হল আমি অনুভব করি। এই শব্দটি প্রথম জার্মান ভাষায় গৃহীত হয়েছিল Æsthetik বানানে। ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে জার্মান দার্শনিক আলেকজান্ডার গটলীব বমগার্টেন (Alexander Gottlieb Baumgarten) সৌন্দর্যবিদ্যার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেন। আধুনিক জার্মান বানান Ästhetik। একইভাবে ফরাসি শব্দ esthétique গৃহীত হয়েছিল গ্রিক থেকে। ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটি এসেছে জার্মান শব্দ থেকে।

৪১১.৩.১১.২ নন্দনতাত্ত্বিক শিলার

জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিখ ফন শিলার (জার্মান: জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিখ ভন শিলার; নভেম্বর ১০, ১৭৫৯, মারবাচ এম নেকার – ৯ই মে, ১৮০৫, ওয়েমির)—জার্মান কবি, দার্শনিক, শিল্প তাত্ত্বিক এবং নাট্যকার, ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সামরিক ডাক্তার, ঝড় আন্দোলনের প্রতিনিধি। এবং সাহিত্যে হামলা এবং রোমান্টিকতা, ওডেস টু জয়ের লেখক, এটির একটি পরিবর্তিত সংস্করণ, যার একটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংগীতের পাঠ্য হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে মানুষের ব্যক্তির এক প্রবল রক্ষক হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন।

জীবনের শেষ সতের বছর ধরে (১৭৮৮-১৮০৫) জোহান গোথির সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, যাকে তিনি তাঁর কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যা খসড়া আকারে থেকে যায়। এই দুই কবির মধ্যে বন্ধুত্বের এই সময়কালে এবং তাদের সাহিত্যের বিতর্কটি ওয়েমার ক্ল্যাসিকিজমের নামে জার্মান সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল।

৪১১.৩.১১.২.১ ব্যক্তি পরিচয়

জন্ম ১০ই নভেম্বর, ১৭৫৯ মারবাচে। জার্মান বার্গেরেস্টভোর স্থানীয়: তাঁর মা প্রাদেশিক বেকারের পরিবার থেকে, সহকর্মী এবং তাঁর বাবা একজন রেজিমেন্টাল প্যারামেডিক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পরে এবং প্রোটেস্ট্যান্ট যাজকের সাথে অধ্যয়নের পরে শিলার ডুউক অফ ওয়ার্টেমবার্গের নির্দেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সামরিক একাডেমিতে প্রবেশ করেন এবং আইন অধ্যয়ন শুরু করেন, যদিও তিনি শৈশব থেকেই পুরোহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন; ১৭৭৫ সালে একাডেমি স্টুটগার্টে স্থানান্তরিত হয়, পড়াশোনার পাঠ্যক্রম বাড়ানো হয় এবং শিলার আইন ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারি পথ গ্রহণ করেন। ১৭৮০ সালে কোর্স থেকে স্নাতক করার পরে, তিনি স্টুটগার্টে রেজিমেন্টাল ডাক্তারের পদ পেয়েছিলেন।

এমনকি একাডেমিতে শিলার তাঁর প্রাথমিক সাহিত্য পরীক্ষাগুলির ধর্মীয় ও সংবেদনশীল উচ্চারণ থেকে বিদায় নিয়ে নাটকীয়তার দিকে ফিরে গিয়েছিলেন এবং ১৭৮১ সালে দ্য রবার্স শেষ করে প্রকাশ করেছিলেন। পরের বছরের শুরুতে নাটকটি ম্যানহাইমে মঞ্চস্থ হয়েছিল; ডাক্তারদের প্রতিনিধিত্ব করতে রেজিমেন্ট থেকে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং মেডিকেল লেখাগুলি ব্যতীত অন্য কিছু লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল, যার ফলে শিলার ওয়ার্টেমবার্গের ডুচি থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ম্যানহিম থিয়েটারের কোয়ার্টারমাস্টার ডাল্লোর্গ শিলারকে একটি 'থিয়েটার কবি' হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন এবং ম্যানহাইম থিয়েটারে মঞ্চে প্রযোজনার জন্য নাটক লেখার জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং 'নাটক এবং প্রেম'—দুটি নাটক ম্যানহাইম থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে একটি দুর্দান্ত সাফল্য হয়েছিল।

অপ্রত্যাশিত প্রেমের যন্ত্রণায় শোকিত হয়ে শিলার স্বেচ্ছায় তাঁর অন্যতম উৎসাহী প্রশংসক, প্রাইভেট-ডসেন্ট জি কর্নারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং দু'বারেরও বেশি সময় ধরে তাঁর সাথে লিপজিগ এবং ড্রেসডেনে অবস্থান করেছিলেন।

১৭৮৯ সালে, তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে একটি পদ পেয়েছিলেন এবং শার্লোট ফন লেঙ্গফিল্ডের সাথে তাঁর বিবাহের জন্য তিনি পারিবারিক সুখ পেয়েছিলেন।

ক্রাউন প্রিন্স ভন শ্লেসভিগ-হলস্টেইন-সন্ডারবার্গ-অগাস্টেনবার্গ এবং কাউন্ট ই। ভন শিম্মেলম্যান তিন বছর (১৭৯১-১৭৯৪) তাকে বৃত্তি প্রদান করেছিলেন, তখন শিলার প্রকাশক আই ফ্রিয়ার সমর্থন করেছিলেন। কোট্টা, যিনি তাকে ১৭৯৪ সালে মাসিক ম্যাগাজিন ওরি প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

শিলার দর্শনের, বিশেষত নান্দনিকতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ফলস্বরূপ, দার্শনিক চিঠিগুলি এবং প্রবন্ধগুলির একটি সম্পূর্ণ সিরিজ (১৭৯২-১৭৯৬) প্রকাশিত হয়েছিল— অন ট্র্যাজিক ইন আর্ট, অন গ্রেস অ্যান্ড ডিগনিটি, অন সাব্লাইম, এবং অন নাইভ এবং সেন্টিমেন্টাল কবিতা। শিলারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আই কান্ট দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

দার্শনিক কবিতা ছাড়াও তিনি খাঁটি লিরিক্যাল কবিতাও তৈরি করেছেন— সংক্ষিপ্ত, গানের মতো চরিত্র যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। শিলার আরেকটি সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করেন, ইয়ার বুক আলমানাক অফ মিউজ, যেখানে তাঁর বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

উপকরণগুলির সন্ধানে, শিলার জেভি গোথির দিকে ফিরেছিলেন, গোয়েটি ইতালি থেকে ফিরে আসার পরে তাঁর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল, কিন্তু তখন বিষয়টি কোনও উচ্চতর পরিচিতির বাইরে যায়নি; কবিরা এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে। তথাকথিত 'বল্ড ইয়ার' (১৭৯৭) শিলার এবং গিথে-সহ দুর্দান্ত ব্যালড সহ চিহ্নিত করেছিলেন শিলারের 'কাপ', 'গ্লোভ', 'পলিক্রাটোভ রিং', যা ভি.এ.-র দুর্দান্ত অনুবাদগুলিতে রাশিয়ান পাঠকের কাছে এসেছিল Zhukovsky।

১৭৯৯ সালে, ডিউক শিলারের রক্ষণাবেক্ষণ দ্বিগুণ করেন যা মূলত পেনশনে পরিণত হয়েছিল, কারণ কবি আর পড়াতে ব্যস্ত ছিলেন না এবং জেনা থেকে ওয়েমারের দিকে চলে গেলেন। ১৮০২ সালে, জার্মান দেশ ফ্রান্সিস দ্বিতীয়ের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট শিলারকে আভিজাত্য দিয়েছিলেন।

শিলার কখনই সুস্থ ছিলেন না, প্রায়শই অসুস্থ ছিলেন; তিনি যক্ষ্মার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। শিলার ৯ মে ১৮০৫ সালে ওয়েমারে মারা যান।

জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিখ ভন শিলার। জার্মান কবি, দার্শনিক, শিল্প তাত্ত্বিক এবং নাট্যকার, ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সামরিক ডাক্তার, সাহিত্যে ঝড় ও আক্রমণাত্মক ও রোমান্টিকতার ধারার প্রতিনিধি, ওড টু জয় রচয়িতা, যার একটি পরিবর্তিত সংস্করণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংগীতের পাঠ্য হয়ে ওঠে। তিনি মানবসমাজের রক্ষাকর্তা হয়ে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশ করেছিলেন।

জীবনের শেষ সতের বছর ধরে (১৭৮৮-১৮০৫) জোহান গোথির সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, যাকে তিনি তাঁর কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যা খসড়া আকারে থেকে যায়। এই দুই কবির মধ্যে বন্ধুত্বের এই সময়কালে এবং তাদের সাহিত্যের বিতর্কটি 'ওয়েমান ক্লাসিকিজম' নামে জার্মান সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল।

৪১১.৩.১১.২ সাহিত্য জীবন

১৭৭৫-এর দিকে শিলার আইন ছেড়ে মেডিকেল অনুষদে স্থানান্তরিত হন। এখানে তিনি প্রতিভাবান শিক্ষকদের বক্তৃতাগুলিতে অংশ নেন, বিশেষত, একাডেমিক যুবকের প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক আবেলের দর্শনের উপর একটি বক্তৃতা কোর্স। এই সময়কালে, শিলার অবশেষে নিজেকে কাব্যকলাতে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

একাডেমিতে প্রশিক্ষণের প্রথম বছর থেকে, ফ্রেডরিচ ফ্রেড্রিচ ক্লোপস্টক এবং কবিদের কাব্য রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন 'ঝড় ও হামলা' ছোট ছোট কাব্য রচনা লিখতে শুরু করলেন। ডিউক এবং তাঁর উপপত্নী কাউন্টারেস ফ্রান্সিসকো ফন হোহেনগেইয়ের সম্মানে বেশ কয়েকবার তাকে অভিনন্দনমূলক ওড লেখার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল।

১৭৭৯ সালে, শিলারের প্রবন্ধ 'ফিজিওলজির দর্শন' একাডেমি প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে দ্বিতীয় বছরে থাকতে বাধ্য করা হয়। ডিউক কার্ল ইউজিন তার রেজোলিউশন চাপিয়ে দিয়েছেন: *"আমি অবশ্যই একমত হই*

যে শিলারের শিষ্যের গবেষণামূলক পুণ্য নেই, তার মধ্যে প্রচুর আগুন রয়েছে। তবে ঠিক এই পরবর্তী ঘটনাটিই আমাকে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে এবং একাডেমিতে তাকে আরও এক বছর ধরে রাখতে বাধ্য করেছিল, যাতে তার উত্তাপ শীতল হয়ে যায়। যদি তিনিও পরিশ্রমী হন, তবে এই সময়ের মধ্যেই সম্ভবত একজন মহান ব্যক্তি তাঁর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবেন।"

একাডেমিতে অধ্যয়নকালে শিলার তাঁর প্রথম রচনা লেখেন। '**জুলিয়াস অফ টোরেন্টস**' (১৭৭৬) নাটকের প্রভাবে জোহান আন্তন লেইসউইজ ফ্রেড্রিচ লিখেছেন **কসমস ভন মেডিসি**– একটি নাটক যেখানে তিনি সাহিত্য আন্দোলন 'ঝড় এবং আক্রমণ'-এর একটি প্রিয় থিম বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন: ভাইদের মধ্যে ঘৃণা এবং তার পিতার প্রেম। একই সময়ে, ফ্রিডরিচ ক্লোপস্টকের রচনা ও রচনাশৈলীর প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ শিলারকে ১৭৭৭ সালের মার্চ মাসে দাস স্কেবিবিজ ম্যাগাজিনে জার্নালে প্রকাশিত ওড 'কনকারার' লেখার জন্য উৎসাহিত করেছিল, যা একটি প্রতিমার অনুকরণ ছিল।

অবশেষে, ১৭৮০ সালে তিনি একাডেমি থেকে স্নাতক হন এবং স্টুটগার্টে রেজিমেন্টাল ডাক্তার পদ লাভ করেন, তাকে অফিসার পদে বরাদ্দ না দিয়ে এবং বেসামরিক পোশাক পরার অধিকার ছাড়াই—ডুকালের স্বভাবের প্রমাণ। ১৭৮১ সালে তিনি নাটকটি সম্পূর্ণ করেছেন **ডাকাতরা** (দাই রবার), একাডেমিতে থাকার সময় তাঁর দ্বারা রচিত। ডাকাতি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করার পরে দেখা গেল স্টুটগার্টের কোনও প্রকাশকই এটি মুদ্রণ করতে চাননি এবং শিলারকে তার নিজের ব্যয়ে একটি নাটক প্রকাশ করতে হয়েছিল।

ম্যানহিমের বইয়ের ব্যবসায়ী শোয়ান, যাকে শিলারও পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন, তাকে ম্যানহিম থিয়েটারের পরিচালক ব্যারন ভন ডাহলবার্গের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি নাটকটি দেখে আনন্দিত হয়ে তাঁর থিয়েটারে মঞ্চ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে ডালবার্গ কিছু সমন্বয় করতে বলেছেন—কিছু দৃশ্য এবং সর্বাধিক বিপ্লবী বাক্যাংশ সরিয়ে ফেলতে, কর্মের সময়টি বর্তমান থেকে সপ্ত বছরের যুদ্ধের দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থানান্তরিত হয়।

শিলার এই ধরনের পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছিলেন; ১২ ডিসেম্বর, ১৭৮১-এর ডাহলবার্গের কাছে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'অনেক তিরাদ, বৈশিষ্ট্য, বড় এবং ছোট উভয়ই এমনকি চরিত্রগুলি আমাদের সময় থেকে নেওয়া হয়েছে; ম্যাক্সিমিলিয়ানের যুগে স্থানান্তরিত, তাদের কোনও দামই হবে না ... ফ্রেডরিকের দ্বিতীয় যুগের বিরুদ্ধে একটি ভুল সংশোধন করার জন্য, আমাকে ম্যাক্সিমিলিয়ানের যুগের বিরুদ্ধে অপরাধ করতে হয়েছিল, 'তবে তবুও ছাড় দেওয়া হয়েছিল, এবং' ডাকাত 'প্রথমে ম্যানহিমে রাখা হয়েছিল ১৩ জানুয়ারি, ১৭৮২। এই উৎপাদন জনসাধারণের সাথে একটি বিশাল সাফল্য ছিল।

১৩ জানুয়ারি, ১৭৮২ সালে ম্যানহিমের প্রিমিয়ারের পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে একজন প্রতিভাবান নাট্যকার সাহিত্যে এসেছিলেন। ডাকাতদের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হল দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ: বড় কার্ল মুর, যিনি ডাকাতদের একটি দলের প্রধান ছিলেন, অত্যাচারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বোহেমিয়ার বনাঞ্চলে গিয়েছিলেন, এবং ছোট ফ্রাঞ্জ মুর, যিনি এই সময়ে তার বাবার সম্পত্তির মালিক হতে চেষ্টা করেছিলেন।

কার্ল মুর সেরা, সাহসী, নিখরচায় সূচনা ব্যক্ত করেছেন, অন্যদিকে ফ্রাঞ্জ মুর বুদ্ধি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ। রববার্সে, জার্মান আলোকিতকরণের অন্য কোনও কাজ হিসাবে, রুসো দ্বারা উদ্‌যাপিত

প্রজাতন্ত্রবাদ এবং গণতন্ত্রের আদর্শ দেখানো হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের বছরগুলিতে শিলারকে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের নাগরিকের সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করা এই নাটকটির জন্য স্পষ্টতই কোনও ঘটনা নয়।

ডাকাতদের পাশাপাশি শিলার কবিতা সংকলন প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, যা ১৭৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল **'১৭৮২ সালের জন্য নৃতত্ত্ব'** (অ্যানথলজি আউফ দাস জহর 1782)। এই নীতিশাস্ত্রের সৃষ্টি শিলারের তরুণ স্টুটগার্ট কবি গথহাল্ড স্টিডলিনের সাথে বিরোধের ভিত্তিতে তৈরি, যিনি স্বাবিয়ান বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে দাবি করেছেন, প্রকাশ করেছেন **'1782 মিউজিকের স্বাবিয়ান নৃতত্ত্ব'**।

শিলার স্টিডলিনকে এই প্রকাশনার জন্য বেশ কয়েকটি কবিতা প্রেরণ করেছিলেন, তবে তিনি সেগুলির মধ্যে একটি মুদ্রণ এবং পরে সংক্ষেপে সম্মত হন। তারপর শিলার পথহাল্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পদগুলি সংগ্রহ করেছিলেন, বেশ কয়েকটি নতুন রচনা লিখেছিলেন এবং এভাবে তাঁর সাহিত্যের প্রতিপক্ষের 'মিউজিকের পাটামাটি'র সাথে পৃথক হয়ে '১৭৮২ এর জন্য নীতিবিজ্ঞান' তৈরি করেছিলেন। বৃহত্তর রহস্য এবং সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর স্বার্থে সাইবেরিয়ার টোবলস্ক শহরকে নৃবিজ্ঞানের প্রকাশের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

দ্য রবার্সের অভিনয়ের জন্য রেজিমেন্ট থেকে ম্যানহাইমে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য, শিলারকে ১৪ দিনের জন্য গার্ডহাউসে রাখা হয়েছিল এবং তাকে মেডিকেল রচনা ছাড়া অন্য কিছু লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল, যার ফলে তিনি তার বন্ধু, সংগীতশিল্পী স্ট্রিচারকে সাথে নিয়ে ডিউকের সম্পত্তি পালাতে বাধ্য হন ২২ সেপ্টেম্বর, ১৭৮২ মারগ্রাভ প্যালেটিনেটে বছর।

ওয়ার্টেমবার্গের সীমানা পেরিয়ে শিলার তার নাটকের প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি নিয়ে ম্যানহাইম থিয়েটারে গিয়েছিলেন। **জেনোয়াতে ফিৎসকো ষড়যন্ত্র** (জার্মান: ডাই ভার্সর্চুর্গং ডেস ফিয়েস্কো জু জেনুয়া), যা তিনি একাডেমির দর্শনের অধ্যাপক জ্যাকব আবেলকে উৎসর্গ করেছিলেন।

ওয়ার্টেমবার্গ ডিউকের অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় থিয়েটার পরিচালনা, নাটকটির প্রযোজনার বিষয়ে আলোচনা শুরু করার কোন তাড়াহুড়ো হয়নি। শিলারকে ম্যানহাইমে না থাকার জন্য, তবে নিকটতম ওগগারহেমের গ্রামে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর বন্ধু স্ট্রেচারের সাথে নাট্যকার লেখক শ্মিডট গ্রামের বাড়িতে 'দ্য হান্টিং কোর্টইয়ার্ড' নামে বাস করতেন। এখানেই ১৭৮২ সালের শরৎকালে ফ্রেডরিচ শিলার ট্র্যাজেডির প্রথম খসড়া তৈরি করেছিলেন **'চালাকি এবং ভালবাসা'** (জার্মান: কাবালে আন্ড লাইব), যা এখনও 'লুইস মিলার' নামে পরিচিত।

শিলার এই মুহূর্তে মুদ্রণ করছেন। **জেনোয়াতে ফিৎসকো ষড়যন্ত্র** তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যয় করেছেন এমন স্বল্প পরিমাণের জন্য। হতাশ পরিস্থিতিতে, নাট্যকার তাঁর পুরোনো পরিচয় হেনরিটা ফন ওয়ালজোগেনকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যিনি শীঘ্রই বাউরবাচে লেখককে তার খালি সম্পত্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

বাবারবাচে, 'ডাঃ রিটার' নামে তিনি ৮ই ডিসেম্বর, ১৭৮২-তে থাকতেন। এখানে, শিলার 'কৌতুক এবং প্রেম' নাটকের শেষের দিকে এগিয়ে যান, যা তিনি ১৭৮৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাজ শুরু করেছিলেন। তারপরে তিনি একটি নতুন ঐতিহাসিক নাটকের চিত্র আঁকেন **ডন কার্লোস** (জার্মান: ডন কার্লোস)। তিনি ম্যানহাইম ডুকাল কোর্টের পাঠাগার থেকে বইগুলি থেকে স্প্যানিশ ইনফান্তার ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন, যা

তিনি একজন পরিচিত গ্রন্থাগারিক সরবরাহ করেছিলেন। ডন কার্লোসের গল্পের পাশাপাশি শিলার স্কটিশ রানী মেরি স্টুয়ার্টের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সময়ের জন্য তিনি দ্বিধা করেছিলেন যে তাদের মধ্যে কোনটি বন্ধ করা উচিত, তবে ডন কার্লোসের পক্ষে এই পছন্দটি করা হয়েছিল।

ফ্রিডরিচ শিলারের ব্যক্তিগত জীবনে জানুয়ারি ১৭৮৩ একটি উল্লেখযোগ্য তারিখ ছিল। বাউরবাচে, এই দাসীর সাথে দেখা করতে, এস্টেটের উপপত্নী তার ষোল বছর বয়সী মেয়ে শার্লোটের সাথে উপস্থিত হয়েছিল। ফ্রেডরিচ প্রথম দর্শনেই একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং তার মাকে বিয়ের অনুমতি চেয়েছিলেন, তবে তিনি সম্মতি দেননি, যেহেতু প্রথম লেখকের পকেটে একটি পয়সাও ছিল না।

এই সময়ে, তাঁর বন্ধু আন্দ্রে স্ট্রেইচার শিলারের পক্ষে ম্যানহাইম থিয়েটার প্রশাসনের পক্ষে জাগ্রত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। থিয়েটারের পরিচালক ব্যারন ফন ডাহলবার্গ, জেনে যে ডিউক কার্ল ইউজিন ইতিমধ্যে তাঁর নিখোঁজ রেজিমেন্টাল চিকিৎসকের সন্ধান ত্যাগ করেছিলেন, শিলারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে নাট্যকারের সাহিত্যকর্মের প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন।

শিলার বরং ঠান্ডা উত্তর দিয়েছিল এবং কেবলমাত্র 'লুইস মিলার' নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলেছিল। ডাহলবার্গ জেনোয়া এবং লুইস মিলার ফিয়েস্কো ষড়যন্ত্র উভয় নাটক নির্মাণের সাথে একমত হয়েছিলেন, এরপরে ফ্রিডরিচ জুলাই মাসে ম্যানহাইমে ফিরে আসেন প্রযোজনার নাটকগুলির প্রস্তুতিতে অংশ নিতে।

অভিনেতাদের দুর্দান্ত নাটক সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে 'জেনোয়াতে ফিয়েস্কো ষড়যন্ত্র' তেমন সাফল্য পায়নি। ম্যানহাইম থিয়েটারের শ্রোতারা এই নাটকটি খুব গর্হিত বলে মনে করেছেন। শিলার তার তৃতীয় নাটক—'লুইস মিলার'-এর রিমেক গ্রহণ করেছিলেন। একটি মহড়া চলাকালীন নাট্য অভিনেতা অগস্ট আইফল্যান্ড নাটকের নাম পরিবর্তন করে 'চালনা এবং প্রেম' করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই নামে, নাটকটি ১৫ এপ্রিল, ১৭৮৪-এ মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং একটি বিশাল সাফল্য ছিল। 'চালাকি' এবং 'ছিনতাইকারী' এর চেয়ে কম নয়, জার্মানির প্রথম নাট্যকার হিসাবে লেখকের নামকে মহিমান্বিত করেছিল।

১৭৮৪ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রবেশ করেছিলেন **কুর্ফাল্টজ জার্মান সোসাইটি** যা ম্যানহাইম থিয়েটারের পরিচালক ডিরেক্টর ওল্ফগ্যাং ভন ডালবার্গ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যা তাকে প্যালিটিনেট বিষয়ের অধিকার দিয়েছিল এবং ম্যানহাইমে তার অবস্থানকে বৈধ করেছে। ২০ জুলাই, ১৭৮৪ সালে কবিকে সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের সময় তিনি 'একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে থিয়েটার' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন পড়েছিলেন। থিয়েটারের নৈতিক গুরুত্ব, দুর্নীতি প্রকাশ এবং পুণ্যকে অনুমোদনের জন্য ডিজাইন করা, শিলার তার প্রতিষ্ঠিত জার্নালে উদ্যোগী হয়ে প্রচার করেছিলেন **রাইন কোমর** (জার্মান: রাইনিশে থালিয়া), এর প্রথম সংখ্যাটি ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

ম্যানহিমে ফ্রিডরিচ শিলার শার্লট ভন কালব নামে এক যুবতী মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যাঁর প্রশংসা লেখককে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। তিনি যখন শর্মারকে ডেইমস্ট্যাডে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন ওয়েমারের ডিউক কার্ল অগাস্টাসের সাথে পরিচয় করেছিলেন। নাট্যকার নির্বাচিত চেনাশোনাতে পড়েছিলেন, ডিউকের উপস্থিতিতে তাঁর নতুন নাটক ডন কার্লোসের প্রথম অভিনয় নাটকটি উপস্থিতদের উপর দুর্দান্ত ছাপ ফেলে।

কার্ল অগাস্টাস লেখককে ওয়েমির উপদেষ্টার পদ মঞ্জুর করেছিলেন, তবে শিলারের দুর্দশা কমেনি। লেখকের দু'শ গিল্ডারের ঋণ শোধ করার কথা ছিল, যা তিনি 'ডাকাত' প্রকাশের জন্য বন্ধুর কাছ থেকে ধার

করেছিলেন, কিন্তু তার কাছে টাকা ছিল না। এছাড়াও ম্যানহিম থিয়েটারের পরিচালকের সাথে তার সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়, ফলস্বরূপ শিলার তার চুক্তি ভেঙে দেয়।

একই সময়ে, শিলার আদালতের বই বিক্রয়কারী মার্গারিটা শোয়ান-এর ১৭-বছরের কন্যার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন, তবে, তরুণ কোকোয়েটি প্রথম কবিটির পক্ষে একটি দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেননি, এবং তার বাবা সমাজে অর্থ ও প্রভাব ছাড়াই কোনও মেয়েকে তার তার মেয়েকে বিবাহিতভাবে দেখার ইচ্ছা করেছিলেন। ১৭৮৪ সালের শুরুর দিকে, কবি গেটফ্রাইড কার্নারের নেতৃত্বে তাঁর কাজের অনুরাগীদের লাইপজিগ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ছয় মাস আগে প্রাপ্ত চিঠিটি স্মরণ করেছিলেন।

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৫-এ শিলার তাদের একটি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন যাতে তিনি তাঁর কঠিন পরিস্থিতিটি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেছিলেন এবং লাইপজিগের কাছে আসতে বললেন। ইতিমধ্যে ৩০শে মার্চ, কার্নারের কাছ থেকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ জবাব এসেছে। একই সাথে তিনি কবিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের বিনিময়ের বিল পাঠিয়েছিলেন যাতে নাট্যকার তার ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। এভাবে গটফ্রাইড কার্নার এবং ফ্রেডরিচ শিলারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব শুরু হয়, যা কবির মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

শিলার ১৭ এপ্রিল, ১৭৮৫-এ যখন লাইপজিগ পৌঁছেছিলেন তখন তার সাথে ফারডিনান্ড হুবার এবং বোনেরা দোরা এবং মিনা স্টকের সাথে দেখা হয়েছিল। কার্নার এই সময় ড্রেসডেনে অফিসিয়াল ব্যবসায় ছিলেন। লিপজিগের প্রথম দিন থেকেই শিলার ম্যানহিমে থেকে যাওয়া মার্গারিটা শোয়ানকে খুব আকুল করে তুলল। তিনি একটি চিঠি দিয়ে তাঁর বাবা-মায়ের দিকে ফিরেছিলেন যাতে তিনি তাঁর মেয়ের হাতের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। প্রকাশক শোয়ান মার্গারিটাকে নিজেই এই সমস্যাটি সমাধান করার সুযোগ দিয়েছিলেন, তবে তিনি শিলারকে অস্বীকার করেছিলেন, যিনি এই নতুন ক্ষতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। শীঘ্রই গটফ্রিড কার্নার ড্রেসডেন থেকে এসেছিলেন, যিনি মাইন স্টকের সাথে তার বিবাহ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কার্নার, হুবার এবং তাদের বন্ধুদের বন্ধুত্ব দেখে উষ্ণ হয়ে শিলার সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই সময়েই তিনি তাঁর সংগীত তৈরি করেছিলেন **ওড টু জয় (ওড অ্যান ডাই ফ্রয়েড)**।

১১ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৫ সালে গটফ্রাইড কার্নারের আমন্ত্রণে শিলার ড্রেসডেনের কাছে লসউইটজ গ্রামে চলে আসেন। এখানে ডন কার্লোস পুরোপুরি পুনর্নির্মাণ এবং সমাপ্ত হয়েছিল, একটি নতুন নাটক, মিসানথ্রোপ চালু হয়েছিল, একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল এবং দ্য আধ্যাত্মিক মানুষ উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়গুলি রচনা করা হয়েছিল। এখানে এটি শেষ হয়েছিল এবং তার **দার্শনিক চিঠিগুলি** (জার্মান দর্শনশাস্ত্র ব্রিফি)— তরুণ শিলারের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দার্শনিক রচনা, যা এপিস্টোলারি আকারে রচিত।

১৭৮৭ সালে গটফ্রাইড কার্নারের মাধ্যমে ফ্রেডরিচ শিলারকে ড্রেসডেন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। একই সময়ে, তিনি হ্যামবার্গের জাতীয় থিয়েটারে ডন কার্লোসের মঞ্চায়নের জন্য একজন বিখ্যাত জার্মান অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক ফ্রিডরিচ শ্রয়েডারের কাছ থেকে একটি প্রস্তাব পেয়েছিলেন।

শ্রোয়েডারের প্রস্তাবটি বেশ ভাল ছিল, তবে শিলার ম্যানহাইম থিয়েটারের সাথে অতীতের খারাপ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে এই আমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং জার্মান সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল ওয়েমারের কাছে যান, সেখানে তাকে ক্রিস্টোফ মার্টিন উইল্যান্ড তাঁর সাহিত্য জার্নাল জার্মান বুধে সহযোগিতা করার জন্য অধীর আগ্রহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল (জার্মান: ডের ডয়চে মেরকুর)।

শিলার আগস্ট ২১, ১৭৮৭-এ ওয়েমারে এসেছিলেন। শার্লোট ভন কালব একাধিক সরকারি সফরে নাট্যকারের সঙ্গী হয়েছিলেন, যার সহায়তায় শিলার দ্রুত তৎকালীন বৃহত্তম লেখক মার্টিন উইল্যান্ড এবং জোহান গটফ্রাইড হার্ডারের সাথে দেখা করেছিলেন। উইল্যান্ড শিলারের প্রতিভার তীব্র প্রশংসা করেছিলেন এবং বিশেষত তাঁর সর্বশেষ নাটক ডন কার্লোসের প্রশংসা করেছিলেন। প্রথম বৈঠকের দুজন কবিই বহু বছরের দীর্ঘস্থায়ী ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেছিলেন। বেশ কয়েকদিন ধরে ফ্রেডরিচ শিলার জেনার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভ্রমণ করেছিলেন, সেখানে সেখানকার সাহিত্যিক মহলে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল।

১৭৮৮ সালে শিলার থালিয়া (জার্মান: থালিয়া) ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছিলেন এবং একই সাথে উইল্যান্ডের জার্মান বুধে সহযোগিতা করেছিলেন। এই বছরের কয়েকটি কাজ আবার লাইপজিগ এবং ড্রেসডেনে শুরু হয়েছিল। কোমরের চতুর্থ সংখ্যায় তাঁর উপন্যাসটি অধ্যায়গুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল—'**স্বপ্নদর্শী**'।

৪১১.৩.১১.২.৩ নান্দনিকতার অধ্যয়ন

ওয়েমারে চলে যাওয়ার পরে এবং প্রধান কবি ও বিজ্ঞানীদের সাথে দেখা করার পরে শিলার তার ক্ষমতা নিয়ে আরও সমালোচিত হয়ে ওঠেন। জ্ঞানের অভাব বুঝতে পেরে নাট্যকার প্রায় এক দশক ধরে ইতিহাস, দর্শন এবং নান্দনিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করতে শিল্প থেকে দূরে সরে এসেছিলেন

কাজের প্রথম খণ্ড প্রকাশ '**নেদারল্যান্ডসের প্রস্থান ইতিহাস**' 1788 সালের গ্রীষ্মে ইতিহাসের অসামান্য পণ্ডিত হিসাবে শিলার খ্যাতি এনেছিলেন। জেনা এবং ওয়েইমের কবিগুরুর বন্ধুরা (আই.ভি. গোথ-সহ, যাকে শিলার ১৭৮৮ সালে সাক্ষাৎ করেছিলেন) জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও দর্শনের অসাধারণ অধ্যাপকের পদ পেতে সহায়তা করার জন্য তাদের সমস্ত সংযোগ ব্যবহার করেছিলেন, যারা এই শহরে কবির থাকার সময় অভিজ্ঞ ছিলেন সমৃদ্ধির সময়।

ফ্রেডরিচ শিলার ১১ মে, ১৭৮৯-এ জেনায় চলে এসেছিলেন। তিনি যখন বক্তৃতা শুরু করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী ছিল। 'বিশ্বের ইতিহাস কী এবং এটি কীসের জন্য পড়াশোনা করা হয়' শিরোনামের প্রবর্তনামূলক বক্তৃতাটি (জার্মান ছিলেন হিস্ট অ্যান্ড জু ওয়েলচেম এন্ডে স্টুডিয়ার্ট ইউনিভার্সালজেসিস্টে?) দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছিল। শিলারের ছাত্ররা তাঁকে স্থায়ীভাবে উৎসাহ দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ তাঁকে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপকরণ সরবরাহ করেনি তা সত্ত্বেও শিলার তাঁর একক জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই বিষয়টি জানতে পেরে, ডিউক কার্ল অগাস্টাস তাঁকে ডিসেম্বর ১৭৮৯ সালে এক বছরে দু'শ থ্যালারের সামান্য বেতনের নিয়োগ দেন, তার পরে শিলার শার্লট ফন লেঙ্গফেল্ডের কাছে অফিসিয়াল অফার করেছিলেন এবং ফেব্রুয়ারি ১৭৯০ সালে রুডলস্টাডটের কাছে একটি গ্রামে গির্জায় একটি বিয়ে হয়েছিল।

বাগদানের পর শিলার তাঁর নতুন বইয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। '**তিরিশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস**', বিশ্ব ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন নিবন্ধের কাজ শুরু করে এবং আবার 'রাইন কোমর' ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে শুরু করে, যেখানে তিনি ভার্জিলের 'আনেইডস'-এর তৃতীয় এবং চতুর্থ বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। পরে এই জার্নালে তাঁর ইতিহাস ও নান্দনিকতা সম্পর্কিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৭৯০ সালের মে মাসে শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতাগুলি অব্যাহত রেখেছিলেন; এই শিক্ষাবর্ষে তিনি প্রকাশ্যে ট্র্যাজিক কবিতা এবং বিশেষত বিশ্ব ইতিহাসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

১৭৯১ এর শুরুতে, শিলার পালমোনারি যক্ষ্মায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এখন তাঁর মাঝে মাঝে কয়েক মাস বা সপ্তাহের অন্তর ছিল, যখন কবি শান্তভাবে কাজ করতে সক্ষম হতেন। ১৭৯২ সালের শীতে এই রোগের প্রথম দিকটি ছিল বিশেষত শক্তিশালী, যার কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা স্থগিত করতে বাধ্য হন। এই বাধ্যতামূলক বিশ্রামটি শিলার দার্শনিক কাজের সাথে আরও গভীর পরিচিতির জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

কাজ করতে অক্ষম হওয়ায় নাট্যকার অত্যন্ত চরম আর্থিক পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন—এমনকি সস্তার দুপুরের খাবার এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের জন্যও কোনও অর্থ ছিল না। এই কঠিন মুহূর্তে ডেনিশ লেখক জেনস ব্যাগসেনের উদ্যোগে ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেড্রিখ ক্রিশ্চান শ্লেসভিগ-হলস্টেইন এবং কাউন্ট আর্নস্ট ভন শিম্মেলম্যান শিলারকে এক হাজার ট্যালারের বার্ষিক ভর্তুকি হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন যাতে কবি তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন। ডেনিশ ভর্তুকি ১৭৯২-৯৪ বছরে অব্যাহত ছিল। এরপর শিলারকে প্রকাশক জোহান ফ্রেড্রিখ কোট সমর্থন করেছিলেন, যিনি তাকে ১৭৯৪ সালে মাসিক পত্রিকা ওরি প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

১৭৯৩-এর গ্রীষ্মে, শিলার লুডভিসবার্গে তার বাবা-মার বাড়ি থেকে একটি চিঠি পেলেন এবং তাকে তাঁর বাবার অসুস্থতার কথা জানালেন। শিলার তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর বাবার সাথে দেখা করতে, তাঁর মা এবং তিন বোনকে দেখার জন্য তাঁর স্ত্রীর সাথে বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাদের এগারো বছর আগে তিনি ভেঙেছিলেন। ওয়ার্টেমবার্গের ডিউকের করণীয় অনুমতি নিয়ে কার্ল ইউজিন শিলার লুডভিসবার্গে পৌঁছেছিলেন, যেখানে তাঁর বাবা-মা ডুকালের বাসভবনের কাছেই বাস করতেন। এখানে, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩-এ কবির প্রথম পুত্রের জন্ম হয়েছিল। লুডভিসবার্গ এবং স্টুটগার্টে শিলার একাডেমিতে পুরোনো শিক্ষক এবং অতীতের বন্ধুদের সাথে দেখা করেছিলেন। কার্লের ডিউকের মৃত্যুর পরে, ইউজিন শিলার মৃতের সামরিক একাডেমি পরিদর্শন করেছিলেন, সেখানে তিনি তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের দ্বারা উৎসাহের সাথে তাকে গ্রহণ করেছিলেন।

১৭৯৩-৯৪ সালে স্বদেশে অবস্থানকালে শিলার তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ও নান্দনিক কাজ সম্পন্ন করেছিলেন **'মানুষের নান্দনিক শিক্ষার উপর চিঠি'** (জার্মান: Über die ästhetische Erziehung des Menschen)।

জেনার কাছে ফিরে আসার পরপরই কবি শক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন এবং তৎকালীন জার্মানির সমস্ত বিশিষ্ট লেখক এবং চিন্তাবিদদের নতুন ওরা ম্যাগাজিনে (জার্মান: ডাই হোরেন) সহযোগিতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শিলার একটি সাহিত্যিক সমাজের সেরা জার্মান লেখকদের একত্রিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৭৯৯ সালে শিলার নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর নিবন্ধগুলির সাথে মিল রেখে দার্শনিক বিষয়গুলিতে একাধিক কবিতা লিখেছিলেন: 'জীবনের কবিতা', 'নৃত্য', 'পৃথিবীর বিচ্ছেদ', 'জেনিয়াস', 'আশা' এবং অন্যান্য। নোংরা, প্রসেসিক বিশ্বে যা কিছু সুন্দর এবং সত্যবাদী তার মৃত্যু। কবির মতে, পুণ্য আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা কেবল একটি আদর্শ বিশ্বে সম্ভব। দার্শনিক কবিতার চক্রটি প্রায় এক দশক সৃজনশীল বিরতির পরে শিলারের প্রথম কাব্যিক অভিজ্ঞতা ছিল।

ফরাসি বিপ্লব এবং জার্মানির আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শিলার তাঁর views ক্যের দ্বারা দুই কবির মধ্যে পরস্পর প্রচারিত হয়েছিল। শিলার যখন তাঁর স্বদেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং ১৭৯৪ সালে ওরি

পত্রিকাটিতে জেনার কাছে ফিরে আসেন, তখন তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির রূপরেখা দিয়েছিলেন এবং গোয়েতকে একটি সাহিত্য সমাজে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি চুক্তির সাথে জবাব দেন।

লেখকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে জুলাই ১৭৯৪ সালে জেনায়। প্রকৃতিবিদদের সভা শেষে রাস্তায় বেরিয়ে কবিরা রিপোর্টের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন এবং কথোপকথন করে শিলারের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেছিলেন reached গোয়েতে বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি উদ্ভিদ রূপান্তর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে অত্যন্ত উৎসাহ দিয়ে শুরু করেছিলেন। এই কথোপকথনের পরে, শিলার এবং গিথের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র স্থাপন করা হয়েছিল, যা শিলারের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাধাগ্রস্ত হয়নি এবং বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা ঔপন্যাসিক স্মৃতিচিহ্ন ছিল।

গিথে এবং শিলারের যৌথ ক্রিয়াকলাপগুলি প্রথমত, একটি নতুন, বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের আগে উত্থিত সমস্যার তাত্ত্বিক বোঝাপড়া এবং ব্যবহারিক সমাধান হিসাবে তাদের লক্ষ্য ছিল। একটি আদর্শ রূপের সন্ধানে কবিরা প্রাচীন শিল্পকলায় পরিণত হয়েছিল। এতে তারা মানবসৌন্দর্যের সর্বোচ্চ উদাহরণ দেখেছিল।

যখন গ্যোথ এবং শিলার নতুন কাজগুলি ওরা ও মিউজসের আলমানাকে প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের প্রাচীনত্ব, উচ্চ নাগরিক এবং নৈতিক পথ এবং ধর্মীয় উদাসীনতার প্রতিচ্ছবিকে প্রতিফলিত করে, তখন বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রচারণা চালিয়েছিল। সমালোচকেরা ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন, নান্দনিকতার বিষয়গুলির ব্যাখ্যার নিন্দা করেছেন।

মার্চালের 'জেনিয়া'-এর মতো দম্পতি রূপে—শৈলর গয়েথকে ফর্ম হিসাবে আধুনিক জার্মান সাহিত্যের সমস্ত অবাধ্যতা এবং মধ্যযুগীয়তার নির্মমভাবে মারাত্মক শিকার করে গোটে এবং শিলার বিরোধীদের তীব্র তিরস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ডিসেম্বর ১৭৯৫ সালে, আট মাস ধরে, উভয় কবি এপিগ্রাম তৈরিতে প্রতিযোগিতা করেছিলেন: জেনা এবং ওয়েমারের প্রতিটি উত্তর অন্তর্ভুক্ত '**Xenia স্বাগতম**' দেখার, পর্যালোচনা এবং পরিপূরক। সুতরাং ডিসেম্বর ১৭৯৫ থেকে আগস্ট ১৭৯৬ পর্যন্ত যৌথ প্রচেষ্টায় প্রায় আট শতাধিক এপিগ্রাম তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে চারশো চৌদ্দটি সবচেয়ে সফল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল এবং ১৭৯৭ এর জন্য 'মিউজস অফ মিউজ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 'জেনিয়া' বিষয়টি খুব বহুমুখী ছিল। এর মধ্যে রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম, সাহিত্য এবং শিল্পের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তারা প্রায় দুই শতাধিক লেখক এবং সাহিত্যকর্মকে স্পর্শ করেছে। 'জেনিয়া' হল উভয় ক্লাসিক দ্বারা নির্মিত রচনাগুলির মধ্যে সর্বাধিক যুদ্ধের মতো।

১৭৯৯ সালে তিনি ওয়েমারে ফিরে আসেন, সেখানে পৃষ্ঠপোষকদের অর্থ দিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। গোথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার পরে শিলার তাঁর সাথে একসাথে ওয়েমার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা জার্মানির শীর্ষস্থানীয় থিয়েটারে পরিণত হয়েছিল। কবি তাঁর মৃত্যু অবধি ওয়েমারে রয়েছেন।

১৭৯৯-১৮০০ বছরগুলিতে। শিলার অবশেষে একটি নাটক লেখেন 'মেরি স্টুয়ার্ট', এর প্লট প্রায় দুই দশক ধরে তাকে দখল করেছে। তিনি সবচেয়ে মারাত্মক রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি দিয়েছিলেন, সহিংস রাজনৈতিক

দ্বন্দ্বের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এক যুগের চিত্র ধারণ করেছিলেন। নাটকটি সমসাময়িকদের মধ্যে দুর্দান্ত সাফল্য ছিল। শিলার এই অনুভূতি নিয়ে এটি শেষ করেছেন যে এখন তিনি 'একজন নাট্যকারের কারুকাজে দক্ষতা অর্জন করেছেন।'

১৮০২ সালে, পবিত্র রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সজ শিলারকে আভিজাত্য দিয়েছিলেন। তবে তিনি নিজেই সংশয়ী ছিলেন, ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৮০৩-এর একটি চিঠিতে হাম্বল্টকে লিখেছিলেন: 'আপনি যখন আমাদের উচ্চপদে উন্নীত হওয়ার কথা শুনেছেন তখন আপনি সম্ভবত হেসেছিলেন। এটি ছিল আমাদের ডিউকের উদ্যোগ, এবং যেহেতু সবকিছু ইতিমধ্যে ঘটেছে, আমি ললো এবং বাচ্চাদের কারণে এই উপাধিটি মানতে রাজি আছি। আদালতে ট্রেনটি ঘোরানোর সময় লোলো এখন তার উপাদানটিতে রয়েছে।

শিলারের জীবনের শেষ বছরগুলি মারাত্মক দীর্ঘায়িত অসুস্থতার দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছিল। তীব্র শীতের পরে, সমস্ত পুরোনো অসুস্থতা আরও খারাপ হয়ে গেল। কবি দীর্ঘস্থায়ী নিউমোনিয়াতে ভুগছিলেন। যক্ষ্মা রোগ থেকে আক্রান্ত হয়ে ৪৫ বছর বয়সে তিনি ৯ মে ১৮০৫ সালে মারা যান।

৪১১.৩.১১.২.৪ শিলারের রচনাসমূহ:

শিলারের নাটক :

১৭৮১ – দস্যুরা
১৭৮২ – জেনোয়াতে ফিয়েস্কো ষড়যন্ত্র
১৭৮৪ – 'চালনা এবং প্রেম'
১৭৮৭ – ডন কার্লোস, স্পেনের শিশু
১৭৯৯ – নাটকীয় ট্রেলজি 'ওয়ালেনস্টেইন'
১৮০০ – মেরি স্টুয়ার্ট
১৮০১ – অরলিন্স মেডেন
১৮০৩ – মেসিনা কনে
১৮০৪ – উইলিয়াম বলুন
ডিমেট্রিয়াস (নাট্যকারের মৃত্যুর কারণে শেষ হয়নি)

শিলারের গদ্য:

নিবন্ধ 'হারানো সম্মানের অপরাধী' (১৭৮৬)\
আধ্যাত্মিক মানুষ (অসম্পূর্ণ উপন্যাস)
Eine großmütige হ্যান্ডলং

শিলারের দার্শনিক রচনা:

দার্শনিকদের ফিজিওলজি (১৭৭৬)
মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সাথে মানুষের প্রাণী প্রকৃতির সম্পর্কের বিষয়ে/ denber den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen Mit seiner geistigen (১৭৮০)

ডাই স্কাউউহনে আলস ইইন নৈতিকতা অ্যানস্টাল্ট বেচারচেট (১৭৮৪)
ওবার ড্যান গ্রানড ডেস ভার্জেনজেন একটি ট্রাজিসেন জেজেনস্ট্যান্ডেন (১৭৯২)
অগস্টেনবার্গার ব্রিফি (১৭৯৩)
গ্রেস এবং গৌরব সম্পর্কে / Anber আনমুট আন ওয়ার্ড (১৭৯৩)
ক্যালিয়াস-ব্রিফ (১৭৯৩)
ম্যান / Über ডাই স্টেস্টিচে এরজিয়েহং ডেন মেনচেন (১৭৯৫) এর নান্দনিক শিক্ষার উপর চিঠিগুলি
নিরীহ এবং সংবেদনশীল কবিতা / Über নিখুঁত এবং সংবেদনশীলতা Dichtung (১৭৯৫) সম্পর্কে
শৌখিনতা সম্পর্কে / Über den Dilettantismus (১৭৯৯; গোথের সহ-রচনা)
উৎসাহ / Über das এরহাবিন সম্পর্কে (১৮০১)

শিলারের ঐতিহাসিক রচনা:

স্পেনীয় শাসন থেকে ইউনাইটেড নেদারল্যান্ডসের পতনের গল্প (১৭৮৮)
তিরিশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস (১৭৯৯)

৪১১.৩.১১.৩ শিলারের প্রতিভার বিশ্লেষণ

প্রারম্ভিকভাবে শিলারের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যিনি মূলত থিয়েটার এবং নাটকের সমস্যাগুলির প্রতি আগ্রহী ছিলেন, এটি 'আধুনিক জার্মান থিয়েটার' (ওবার জেনগেরওয়ারটিজ ডয়চে থিয়েটার, ১৭৮২), 'থিয়েটারকে নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়' এর মতো সমালোচনামূলক সাহিত্যকর্মগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছিল (ডাই স্কাউউহনে আলস ইইন নৈতিকতা অ্যানস্টাল বেরচেট, ১৭৮৫)। এই দুটিই শুরুর শিলার দ্বারা ভাগ করা ধারণা এবং শুদ্ধতার মুডে নিমগ্ন। তাদের লেখক সামন্ত বিশ্বের কুফলগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত এই সময়ের মার্শাল আর্টের পক্ষে ছিলেন। এই লক্ষ্যটির সফল প্রয়োগের জন্য, সমালোচককে সরলতা, স্বাভাবিকতা এবং সত্যের নাট্যকারের প্রয়োজন ছিল। তিনি ফ্রান্সের উদাহরণ অনুসরণ করে জার্মানিতে রোপণ করা ধ্রুপদীতার বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "প্যারিসে, তারা চটজলদি সুন্দর সুন্দর পুতুলগুলিতে পছন্দ করে যার মধ্যে কৃত্রিমতা সমস্ত সাহসী স্বাভাবিকতা সংহত করে।"

লেখক সমস্ত নিয়ম এবং সম্মেলনের বিরোধিতা করে শৈল্পিক সৃষ্টির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, এক জাতীয় পরিচয়ের প্রতি জোর দিয়েছিলেন। 'নিষ্ক্রিয় প্রেমী'দের লেখক সামন্ত আভিজাত্যের দিকে অভিহিত, খালি বিনোদনমূলক নাটকের একটি সিদ্ধান্তর প্রতিপক্ষ ছিলেন তিনি থিয়েটারকে মানুষের জন্য স্কুল হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং 'অবজ্ঞাপূর্ণ লোভী লোকদের' অভিনেত্রীর স্থান নয়।

শিলার এমন একটি থিয়েটারের সমর্থক যা লোককে আলোকিতকরণের আদর্শের চেতনায় শিক্ষিত করে। তিনি থিয়েটারকে এমন একটি চ্যানেল বলেছেন যার মাধ্যমে সত্যের আলো প্রবাহিত হয়। লেখকের মতে থিয়েটারটি সামাজিক ক্ষতিগুলিকে ঘৃণা করে। 'বিনা শাস্তিবিহীন কয়েক হাজার কুফলকে থিয়েটার দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়, হাজার হাজার পুণ্য, যার সম্পর্কে ন্যায়বিচার নীরব থাকে, মঞ্চে মাহিমান্বিত হয়।' খ্রাপোভিটস্কায়া টি.এন., কোরোভিন এ. ভি. বিদেশী সাহিত্যের ইতিহাস।

তরুণ লেখকের উভয় নিবন্ধ হ্যামবার্গ নাটকের লেখক লেসিংয়ের উপর তার উল্লেখযোগ্য প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়।

গ্রেপ্তারকালে শিলার ট্র্যাজেডি 'কুনিং অ্যান্ড লাভ' নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, যা তাঁর 'ঝড় ও হামলা' সময়কালের সেরা কাজ হয়ে ওঠে। লেখক তাঁর চরিত্রের মূল প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করেছেন ডুচি অফ ওয়ার্টেমবার্গে, যেখানে কবি যুবকটি কাটিয়েছিলেন, তিনি দ্বৈত স্বৈরাচারের ঘৃণ্য ঘটনা সম্পর্কে জানতেন। কার্ল ইউজিন তার প্রজাদের বাণিজ্য করা লজ্জাজনক বিবেচনা করেননি, সেগুলি বিদেশী সেনাবাহিনীর কাছে তোপের পশুর মতো বিক্রি করেছিলেন। তিনি শুবার্টের কারাগারে দশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন। তরুণ নাট্যকারও নিজের উপর ডিউকের স্বৈরাচার অনুভব করেছিলেন। শিলারের ট্র্যাজেডির পৃষ্ঠা থেকে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের দুনিয়ার প্রতি উৎসাহ বিদ্বেষ। কারণ ছাড়াই এঙ্গেলস এটিকে 'প্রথম জার্মান রাজনৈতিকভাবে প্রবণতাপূর্ণ নাটক' বলেছিলেন 'কৌতুক ও প্রেম' নাটক 'ঝড় ও হামলা' নাটকের বাস্তবতার চূড়ায় পরিণত হয়েছিল। এটিতে, প্রথমবারের মতো, জার্মান জীবনকে এ জাতীয় গভীরতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে চিত্রিত করা হয়েছে। 'ডাকাত', শৈল্পিক দক্ষতা, নাটকীয় কৌশল শিলার বৃদ্ধি সঙ্গে তুলনা। ফ্র্যাঞ্জ মুর এবং প্রথম নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির একতরফা ও সরলতা কাটিয়ে লেখক আরও জটিল চরিত্র তৈরি করেছিলেন। আরও জটিল সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা কেবল সংগীতশিল্পী মিলার, লুইস নয়, অন্যান্য চরিত্রেরও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এমনকি রাষ্ট্রপতি ওয়াল্টারকে কেবল একজন আদালতের কেরিয়ারিস্ট এবং ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে দেখানো হয়নি, তবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি প্রেমময় পিতাও তার ছেলের মৃত্যুতে হতবাক হয়েছিলেন, যার কাছ থেকে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। লেডি মিলফোর্ড কেবল একজন নৈতিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত মহিলা নন, তিনি কোনও নির্দিষ্ট দয়া ও অহংকার ছাড়াই নন।

দ্য রবারস এবং দ্য কুনিং অ্যান্ড লাভ নাটকগুলি শিলারকে কেবল জার্মানিই নয় খ্যাতনামা নাট্যকার হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। শীঘ্রই এগুলি ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। নাটকগুলি বিপ্লবী ফ্রান্সে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ট্র্যাজেডি 'কুনিং অ্যান্ড লাভ' শিলারের কাজের প্রথম দিকে স্টান শেষ হয়। তার কাজের পরিবর্তনটি ছিল ডোন কার্লোসের ট্রানডিজ (ডন কার্লোস, ১৭৮৭), যা তিনি ১৭৮৩ সালে ঝড় ও হামলার সময়কালে শুরু করেছিলেন। তিনি যখন নাটকটিতে কাজ করেছিলেন, কবির মতামত পাল্টে গেছে, তিনি স্টর্মার আদর্শ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন এবং মূল পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। তবুও, প্রাথমিক নাটকগুলির সাথে কার্লোসের ধারাবাহিকতা সহজেই উপলব্ধিযোগ্য।

'ডন কার্লোস' ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত। ফিলিপ দ্বিতীয়-এর রাজত্ব, যখন ট্র্যাজেডি হয়েছিল, স্পেনের সামন্ত-ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল, যেখানে অনুসন্ধান তদন্তকারী হয়ে পড়েছিল।

লেখকের মতামতের ধারক, শিলারের নতুন নায়ক, মার্কের পোজ হন, মূল সংস্কার অনুসারে, একটি গৌণ ভূমিকা অর্পণ করা হয়েছিল। ভঙ্গি স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের একজন উকিল। তিনি দ্বিতীয় ফিলিপের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছেন এমন স্বাধীনতা-প্রেমী ডাচদের সহায়তার জন্য স্পেনে পৌঁছেছেন। তিনি স্পেনীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, ডন কার্লোসকে রাজি করান, যার আত্মায় তিনি একবার 'মানবতা এবং বীরত্বের বীজ' বপন করেছিলেন, নেদারল্যান্ডসকে সাহায্য করার জন্য যান। কার্লোস তার যৌবনের এক বন্ধুর প্রস্তাবের সাথে একমত হন এবং তার বাবার কাছে তাকে নেদারল্যান্ডসে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তবে

ফিলিপ অন্যথায় সিদ্ধান্ত নেন: তিনি তার ছেলের উপর আস্থা রাখেন না এবং এই মিশনটি আলবার নিষ্ঠুর ডিউকের হাতে অর্পণ করেন, তাকে অবশ্যই নির্মমভাবে বিদ্রোহকে চূর্ণ করতে হবে।

স্টিলার আদর্শ থেকে শিলারের বিদায়ের সাথে ছিল নান্দনিক নীতিগুলির সংশোধন। শিলার চোর, ফিলিস্তিন নায়কদের জগতে আগ্রহ হারাচ্ছেন, যারা এখন তাকে ফ্ল্যাট এবং খারাপ বলে মনে করছেন। তিনি ডন কার্লোস, পোজের মতো উঁচু, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বদের আকর্ষণ করতে শুরু করেন, যার উপরে তিনি দেশের সম্ভাব্য ত্রাণকর্তা, জনগণের মুক্তিদাতা হিসাবে তাঁর প্রত্যাশা রেখেছেন। জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস। নাটকের স্টাইলও বদলে যাচ্ছে। তিনি গদ্যকে অস্বীকার করেছেন, যা ‘ডন কার্লোস’ এর মূল সংস্করণে লেখা হয়েছিল। প্রারম্ভিক নাটকগুলির গদ্য, তাদের চালচলন কথাবার্তা শ্লোগানগুলির সাথে অশ্লীলতা এবং দ্বান্দ্বিকতা দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, পাঁচ পাটের আইম্বিক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

ডন কার্লোসের পরে, শিলার প্রায় ১০ বছর ধরে নাটকীয় শিল্প থেকে দূরে সরে গেছে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ‘টু জাই’ (অ ডাই ফ্রয়েড, ১৭৮৫), যা বন্ধুত্ব, আনন্দ এবং প্রেমের এক অনুরাগী সংগীত। কবি বৈরিতা, কুৎসা, নিষ্ঠুরতা এবং যুদ্ধের নিন্দা করেছেন, মানবজাতিকে শান্তিতে ও বন্ধুত্বের সাথে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

১৭৮৯-১৭৯৪ সালের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের ঘটনার প্রতি শিলারের মনোভাব জটিল এবং বিপরীত ছিল। প্রথমদিকে, তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং গর্বিত ছিলেন যে ১৭৯২ সালে ফ্রান্সের আইনসভা তাকে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সম্মানসূচক নাগরিক উপাধিকার হিসাবে, স্বাধীনতার উকিল হিসাবে ভূষিত করে। ভবিষ্যতে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে শিলার বিপ্লবীদের বিরোধী হয়ে ওঠেন। তবে দুর্দান্ত ঘটনাগুলি তাকে বিশ্বদর্শন এবং সৃজনশীলতার বেশ কয়েকটি মূল সমস্যাগুলির পুনরায় মূল্যায়ন করতে বাধ্য করে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জনগণের ভূমিকা, ইতিহাসের উপর তাদের প্রভাব, স্বদেশের ভাগ্য নিয়ে প্রশ্ন। শিলারের নাটক থেকে একাকী বিদ্রোহীর চিত্র অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এতে মানুষের থিম প্রতিষ্ঠিত হয়। শিলার এখনও একটি স্বাধীনতা-প্রেমী কবি, তবে স্বাধীনতার কৃতিত্ব তিনি বিপ্লবী উপায়ে কল্পনা করেননি। জনসাধারণের অনিষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি নতুন অহিংস পদ্ধতির সন্ধান করেছেন। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে। শিলার মূলত দার্শনিক এবং নান্দনিক। তিনি কান্তের দর্শনের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন, যা লেখকের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। শিলার কান্তের দর্শনের প্রাথমিক নীতিগুলি মেনে নিয়েছিলেন, তবে আরও অনুসন্ধানের সময়, তিনি তাঁর সাথে তার তাৎপর্য আরও এবং আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এই পার্থক্যগুলি এই কারণে হয়েছিল যে জার্মান দার্শনিক স্বাধীনতার সম্ভাবনা, বাস্তবে মানবতাবাদী আদর্শকে বিশ্বাস করেনি এবং তাদের বাস্তবায়নকে অন্য বিশ্বে স্থানান্তরিত করে। সমস্ত শিলারের অনুসন্ধানের অর্থটি এই সত্যে নেমে আসে যে তিনি স্বাধীনতা অর্জনের উপায়গুলি, সত্যিকারের বিশ্বে ব্যক্তিত্বের ব্যাপক বিকাশের শর্ত তৈরি করার উপায় অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য মতবিরোধের দ্বারাও এই ইস্যুতে পার্থক্য নির্ধারিত হয়েছিল।

শিলারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক রচনা হল লেটারস অন দ্য এ্যাসেথিক এডুকেশন অফ ম্যান (উবার ডাই অ্যাথেটিচে আর্জিহুং ডেস মেনচেন, ১৭৯৫)। এই কর্মসূচি রচনায় লেখক কেবল নান্দনিক প্রশ্নগুলিকেই সম্বোধন করেননি, তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উত্তর দেওয়ার এবং সমাজকে পুনর্গঠনের উপায়গুলিও সন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন।

স্বাধীনতা অর্জনের সহিংস উপায়গুলি অস্বীকার করে শিলার নান্দনিক শিক্ষায় প্রাথমিক সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান করার মূল চাবিকাঠিটি দেখেন। অপরিশোধিত প্রাণী প্রবৃত্তি আধুনিক মানুষকে স্বাধীনতায় বাঁচতে দেয় না। মানবতাকে পুনরায় শিক্ষিত করা দরকার। সমাজকে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায়, লেখক নান্দনিক শিক্ষা, সৌন্দর্যের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা বিবেচনা করে। "...স্বাধীনতার পথ কেবল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে যায়' এই কাজের মূল ধারণা।

শিল্পকর্মের ফর্ম, সৌন্দর্য এবং অনুগ্রহ দ্বারা নান্দনিক শিক্ষায় একটি দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করা হয়। এখন থেকে কবি তাঁর রচনাগুলি সাজানোর দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। গদ্য যুবক নাটকগুলি পরিপক্ক শিলারের কাব্য ট্র্যাজেডির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস। শিলারের নান্দনিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল তাঁর কাজ 'অন নাইভ অ্যান্ড সেন্টিমেন্টাল কবিতায়' (ওবার সাদাসিধা ও সংবেদনশীলতা ডিচটং, ১৭৯৫-১৭৯৬)। এটি সমাজের বিকাশের সাথে নান্দনিক সমস্যার সংযোগটি ব্যাখ্যা করার প্রথম প্রচেষ্টা। শিলার নান্দনিক আদর্শের অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে অতিরিক্ত ঐতিহাসিক ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধারণ ছিল।

তিনি দুটি ধরনের কবিতা— 'নিষ্পাপ' এবং 'সংবেদনশীল', যা মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে উত্থিত হয় তার মধ্যে পার্থক্য করে। প্রথমটি প্রাচীন বিশ্বের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, দ্বিতীয়— আধুনিকের জন্য। 'নিষ্পাপ' কবিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদের কাজের নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতি। আধুনিক কবিরা ব্যক্তিগত, 'সংবেদনশীল'। তারা তাদের কাজগুলিতে চিত্রিত বিশ্বের প্রতি ব্যক্তিগত মনোভাব বিনিয়োগ করে। মানবসমাজের অনন্য শৈশবকালে এন্টিক কবিতাটির উদ্ভব হয়েছিল, যখন কোনও ব্যক্তি সুরেলাভাবে বিকাশ লাভ করেছিলেন এবং তার চারপাশের বিশ্বের সাথে বিভেদ বোধ করেন না। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে আধুনিক বা 'সংবেদনশীল' কবিতার বিকাশ ঘটে। নতুন সময়ের কবি তাঁর চারপাশের জগতের সাথে মতবিরোধ করে বেঁচে থাকেন এবং সুন্দরীর সন্ধানে তিনি প্রায়শই আধুনিকতা থেকে দূরে চলে যান যা তার আদর্শগুলির সাথে মেলে না।

শিলারের সহানুভূতিগুলি প্রাচীন 'কবিতা' কবিতার পাশে ছিল।

প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল শিলারের অনেক রচনায়; বিশেষত তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'গডসের ঈশ্বর' (ডাই গটার গ্রিচেনল্যান্ড, ১৭৮৮)-এ, যা কবির পুনরুত্থানের দ্বারা আদর্শিত প্রাচীন বিশ্বের মৃত্যু সম্পর্কে শোকের ভাবনাগুলি প্রতিফলিত হয়েছিল।

নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে। একের পর এক, শিলারের উজ্জ্বল বল্লাদগুলি উপস্থিত হয়েছিল—'দ্য কাপ' (নামটি ভি.এ. ঝুকভস্কি, শিলারের পক্ষে— 'ডাইভার'—ডার টাউচার), 'দস্তানা' (ডায়ার হ্যান্ডসচুহ), 'আইভিকোভে ক্রেনস' (ডাই ক্রানচি দেস) আইবিকাস), 'পোরুক' (ডাই বার্গশেইট), 'নাইট অফ টোগেনবার্গ' (রিটার টোগেনবার্গ), প্রতিভা দিয়ে ভি.এ. এর অনুবাদ করেছেন রাশিয়ান ভাষায় Zhukovsky।

বল্লাদগুলিতে কবি বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, সম্মান, বীরত্ব, ত্যাগ, মানব চেতনার মহানুভবতার মহৎ ধারণা গেয়েছেন। সুতরাং, 'পোরুক'-এর গানে তিনি বন্ধুত্বকে মহিমান্বিত করেছেন, যার জন্য পাই কোনও ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সামনে থামেন না; সাহস ও সাহসের বিবরণ 'গ্লোভ', 'কাপ'-এ বর্ণিত হয়েছে।

শিলারের বল্লগুলি একটি তীক্ষ্ণ নাটকীয় প্লট দ্বারা পৃথক করা হয়। দুর্দান্ত প্রকাশ এবং প্রাণবন্ততার সাথে তারা পরিস্থিতি এবং মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি জানায়। বিমূর্ততার চেতনা পটভূমিতে ফিরে আসে। আমাদের

দেশের জার্মান কবি হিসাবে একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ হিসাবে, ফ্রাঞ্জ পেট্রোভিচ শিলার যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন, 'বুদ্ধিমান নাট্যকারের হাতটি সমস্ত লোকের মধ্যে অনুভূত হয়' এমনটা অনুভব করা সহজ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। শিলার তার আদর্শগত বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বিপরীতমুখী, 'বেলজ অফ বেল' (দাস লাইড ভন ডের গ্লোকে, ১৭৯৯) বিখ্যাত কবিতা তৈরি করেছেন। কবিতাটির বিষয়বস্তু হল কবিতাটির কাজের প্রতি ধ্যান, মানুষের সুখ, জীবন পুনর্গঠনের পথে।

ওয়ালেনস্টেইন ট্রিলজি (ওয়ালেনস্টাইন, ১৭৯৭-১৭৯৯) শিলারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। তিনি তাঁর অন্যান্য কাজের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে এতে কাজ করেছিলেন। একটি পরিকল্পনা বহন এবং চিন্তা করার প্রক্রিয়াটি খুব দীর্ঘ ছিল। যাই হোক, এটি আশ্চর্যজনক নয় যে ওয়ালেনস্টাইন নাট্যকারের রচনায় একটি নতুন মঞ্চ খোলেন, যে ট্রিলজিটি মূলত একটি নতুন শৈল্পিক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছিল।

তিরিশ বছর যোদ্ধার ইভেন্টের সাথে যুক্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক পরিকল্পনার জন্য চরিত্রগুলি এবং সেটিংয়ের একটি উদ্দেশ্যমূলক চিত্র অঙ্কন প্রয়োজন। ব্যবসায়ের একটি বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি কেবল পরিকল্পনার ক্ষতি করতে পারে। শিলারের দীর্ঘ ইতিহাস, তাঁর দুর্দান্ত ঐতিহাসিক রচনাগুলি দি নেদারল্যান্ডের প্রস্থানের ইতিহাস (ডাই গেসিচটি দেস অ্যাফেলস ডের ভেরিনিগটেন নিডারল্যান্ডে, ১৭৮৮), তিরিশ বছর যুদ্ধের ইতিহাস (ডাই গেসিচটি দেস ড্রেসিগজাহারিজেন ক্রিজেস, ১৭৯২) ভাল তৈরির জন্য একটি ভাল প্রস্তুতিমূলক স্কুল ছিল। ইতিহাসের ক্লাসগুলি ঘটনাকে সত্যিকারের অনুপ্রেরণা দিয়ে কংক্রিটের সত্যগুলিতে লেগে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলে। জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস। 'মেরি স্টুয়ার্ট' (মারিয়া স্টুয়ার্ট, ১৮০০)—একটি আর্থ-মানসিক ট্র্যাজেডি। এতে কোনও বিস্তৃত সামাজিক চিত্রকর্ম নেই; শিলারের চিত্রিত বিশ্ব প্রধানত আদালতের চেনাশোনাতেই সীমাবদ্ধ।

মরিয়মের ভাগ্য ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেই মুহূর্তে ট্র্যাজেডি শুরু হয়। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। মেরির বেঁচে থাকার জন্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি ছিল।

শিলার ট্র্যাজেডির পরিধি ছাড়িয়ে স্কটিশ রানির পুরো ব্যাকস্টোরি বিচার করেছিলেন কেবল তার চরিত্রের কথা থেকেই আমরা তার উজ্জ্বল, তবে দুর্নামময় অতীত সম্পর্কে শিখি, যখন তিনি তার স্বামীর হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন, যার জন্য তিনি স্কটিশদের সিংহাসন হারিয়েছিলেন।

শিলারের ছবিতে মারিয়া কোনওভাবেই নিরীহ নয়। তার বিবেক নিয়ে অপরাধ আছে। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ধরে একটি ইংরেজি কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন, যেভাবে তিনি বহুভাবে তার অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তিনি অনেক কিছুই সম্পর্কে তার মন পরিবর্তন, সমালোচনা করে তার অতীতে ফিরে তাকান। মেরি উন্নতির জন্য পরিবর্তিত হয়েছে, ভোগ করে তাঁকে নাম দিয়েছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ছাড়া না। তার আন্তরিকতা, আন্তরিকতা রয়েছে, যা এলিজাবেথের এত অভাব রয়েছে।

অরলিন্স মেইডেনের রোমান্টিক ট্র্যাজেডি (ডাই জং-ফ্রেউ ফন অরলিন্স, ১৮০১) হান্ড্রেড ইয়ারস যুদ্ধের সময় বিদেশি হানাদার, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে দেখায়। কৃষক মেয়ে জ্যানি ডিআর্ক এই যুদ্ধের জাতীয় নায়িকা হয়ে ওঠেন। শিলার দেখিয়েছিলেন যে ফ্রান্সের উদ্ধার রাজা ও অভিজাতদের দ্বারা নয়, সাধারণ মানুষ নিয়ে এসেছিল।

জিনে ডিআরকের চিত্রটি বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিল। চর্চামানরা প্রথমে তাকে ঝুঁকির কবলে পরিণত করেছিল এবং পরে সাধু হিসাবে ঘোষণা করেছিল ভোল্টায়ার, চর্চাকারীদের অশ্লীলতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করে অন্য চরম এবং চিত্রিত কেইনকে জোর দিয়েছিল বেহাল বর্ণে।

শিলার জিনকে পুনর্বাসিত করতে, তার কীর্তির সমস্ত মহত্ত্ব, তার দেশপ্রেম দেখানোর জন্য যাত্রা করেছিলেন।

'উইলিয়াম টেল' (উইলহেলম টেল, ১৮০৪)— শেষ সমাপ্ত নাটক, শিলারের ক্যারিয়ার শেষ করার যোগ্য। এতে লেখক তার বহু বছরের প্রতিচ্ছবি সংক্ষিপ্তসার করেছেন মানুষের ভাগ্য, স্বদেশের প্রতিফলন। রচনাটি নাট্যকারের কাছে এক ধরনের কাব্যিক টেস্টামেন্ট ছিল।

'উইলিয়াম টেল' প্রথম থেকেই লোকনাট্য হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল। ১৮৩৩ সালের ১৮ আগস্টের একটি চিঠিতে কবি তাঁর পরিকল্পনার স্বরূপ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন: 'উইলিয়াম টেল' এখন আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ... বিষয়টি সাধারণত থিয়েটারের কাছে খুব আকর্ষণীয় এবং খুব জনপ্রিয়। নাটকের বিষয়বস্তু জনপ্রিয় ছিল, টেল-এর সুদৃঢ় তীরের কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে, যা কিছু ইউরোপীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর সম্পর্কে কিংবদন্তিগুলি প্রায়শই সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্সে পাওয়া যেত।

জীবনের শেষ মাসগুলিতে শিলার রাশিয়ান ইতিহাস 'দেমেট্রিয়াস' (ডেমেট্রিয়াস, ১৮০৫) থেকে একটি ট্র্যাজেডি নিয়ে কাজ করছেন। তিনি প্রথম দুটি আইন লিখতে এবং প্লটের আরও বিকাশের জন্য একটি সাধারণ পরিকল্পনার রূপরেখা পরিচালনা করতে সক্ষম হন। ট্র্যাজেডিটি মিথ্যা দিমিত্রির সংক্ষিপ্ত উত্থান ও পতনের ইতিহাসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। তাঁর ট্র্যাজেডিটি হল তিনি একটি অনৈচ্ছিক প্রতারক হিসাবে কাজ করেন, যিনি প্রথমে আন্তরিকভাবে তাঁর রাজ উৎসকে বিশ্বাস করেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে তিনি ভুল করে অন্যকে প্রতারিত করেছিলেন, আক্রমণকারী হিসাবে রাশিয়ায় আগত বিদেশীদের হাতে একটি উপকরণ হয়েছিলেন।

৪১১.৩.১১.৪ উপসংহার

জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিখ ভন শিলার একজন অসামান্য জার্মান কবি, নাট্যকার, ঐতিহাসিক, জার্মানির আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম নির্মাতা শিল্পকর্ম নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক রচনার লেখক। তিনি ট্র্যাজেডি দ্য আউটলাউস (১৭৮১-৮২), ওয়ালেনস্টেইন (১৮০০), কুনিং অ্যান্ড লাভ (১৭৮৪), ডন কার্লোস, উইলহেলম টেল (১৮০৪) এবং রোমান্টিক ট্র্যাজেডির মতো বিখ্যাত রচনাগুলি রচনা করেছিলেন। অরলিন্স মেডেন (১৮০১)।

শিলারের জীবন সেনাবাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ফ্রিডরিচ ক্রিস্টোফের পিতা ছিলেন জোহান ক্যাস্পার শিলার, তিনি ছিলেন একজন প্যারামেডিক, তিনি ওয়ার্টেমবার্গের ডিউকের অফিসে কর্মরত ছিলেন; লুডভিগসবার্গের একটি লাতিন স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পরে, শিলার একটি সামরিক স্কুলে ভর্তি হন (যেখানে লেখক চিকিৎসা এবং আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন), যা পরে একাডেমির মর্যাদা লাভ করে; ১৭৮০-এর শেষের দিকে, শিলারকে রেজিমেন্টাল ডাক্তার পদে স্টুটগার্টে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

শিলারকে লিখতে নিষেধ করেছিলেন। একটি রেজিমেন্ট থেকে ম্যানহাইমে রওনা হয়ে তাঁর প্রথম ট্র্যাজেডি 'ডাকাতদের' উপস্থাপনের জন্য শিলারকে মেডিকেল বিষয়ে রচনা ছাড়া অন্য কিছু লেখার নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে অনুরূপ আক্রমণ শিলারকে সেই জার্মানির অন্যান্য দেশগুলিতে ডিউকের সম্পত্তি পছন্দ করতে বাধ্য করেছিল।

শিলার বিশেষ করে প্রেক্ষাগৃহগুলির জন্য নাটক রচনা করেছিলেন। ১৭৮৩ সালের গ্রীষ্মে, ম্যানহাইম থিয়েটারের কোয়ার্টার মাস্টার শিলারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, যার মতে নাট্যকারকে ম্যানহিম মঞ্চে মঞ্চায়নের জন্য বিশেষভাবে নাটক রচনা করতে হবে। এই নাট্য চুক্তির সমাপ্তির আগে মঞ্চস্থ হয়েছিল

নাটক ‘কুনিং অ্যান্ড লাভ’ এবং ‘জেনোয়াতে ফিয়েসকো ষড়যন্ত্র’। তাদের পরে, শিলারের সাথে চুক্তি, ‘কৌতুক এবং প্রেম’ এর দুর্দান্ত সাফল্য সত্ত্বেও পুনর্নবীকরণ হয়নি।

শিলার ইতিহাসের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৭৮৭ সালে শিলার ওয়েমারে চলে আসেন এবং ১৭৮৮ সালে তিনি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস সম্পাদনা করেন, যা সমাজের বিভিন্ন ঐতিহাসিক অশান্তির জন্য উৎসর্গীকৃত কয়েকটি বই ছিল। তাঁর কাজের অংশ হিসাবে শিলার স্পেনীয় শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনকারী নেদারল্যান্ডসের স্ব-সংকল্পের বিষয়টি প্রকাশ করেছিলেন। ১৭৯৩ সালে, লেখক তিরিশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও, তাঁর সমস্ত বিচিত্র নাটক ঐতিহাসিক থিমগুলি সহ পুনরায় পূরণ করে। শিলার জোয়ান অফ আর্ক এবং মেরি স্টুয়ার্ট উভয়ের সম্পর্কে লিখেছেন; তিনি কিংবদন্তি সুইস নায়ক উইলিয়াম টেল এবং আরও অনেককে উপেক্ষা করেন না।

শিলার গোথের সাথে পরিচিত ছিলেন। জার্মান সাহিত্যের দুটি ক্লাসিকের মিলন ১৭৮৮ সালে হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে ১৭৮৯ সালে গোথ শিলারের সহায়তায় তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হন। পরবর্তীকালে, লেখকরা একে অপরকে সাহিত্য ও নান্দনিক প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং জেনিয়া উপাখ্যানগুলির সিরিজটিতে সহ-রচনা করেছিলেন। গোথের সাথে বন্ধুত্ব শিলারকে দ্য গ্লোভ, পলিক্রাটোভ রিং, আইভিকোভে ক্রেনসের মতো বিখ্যাত লিরিক রচনা তৈরি করতে উৎসাহিত করেছিল।

শিলার উৎসাহের সাথে মহান ফরাসি বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের বিষয়ে লেখকের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও শিলার ফ্রান্সে যা ঘটেছিল তা নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন: লুই দ্বাদশকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এবং জ্যাকবিন স্বৈরশাসনের মাথা উঁচু করে তোলা পছন্দ করেন না তিনি।

শিলারকে মুকুট রাজকুমার অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও শিলারের আয় অত্যন্ত সামান্য, এমনকি প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য পর্যাপ্ত অর্থও ছিল না। ক্রাউন প্রিন্স ভন শ্লেসভিগ-হলস্টাইন- সন্ডারবার্গ-অগাস্টেনবুর্গ কবিকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তিন বছর ধরে (১৭৯১ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত) তাঁকে বৃত্তি প্রদান করেছিলেন। ১৭৯৯ সাল থেকে এটি দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

জীবনের জন্য, শিলার অনেকবার প্রেমে পড়েছিলেন। তাঁর যৌবনে, কবিটির আদর্শ ছিলেন লরা পেটারারচ এবং ফ্রান্সিস ফন হোহেনগেই, উইথেমবার্গ ডিউকের মেট্রেস, পরে কার্লের স্ত্রী এবং নতুন দুচেসে। সতেরো বছর বয়সী শিলার মনোমুগ্ধকর এবং মহৎ ফ্রান্সিসকে নিয়ে আনন্দিত হয়েছিল, এতে তিনি সমস্ত গুণাবলীর ঘনত্ব দেখেছিলেন এবং তিনিই লেডি মিলফোর্ড নামে তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘কুনিং অ্যান্ড লাভ’ প্রকাশ করেছিলেন। পরে, শিলার প্রকৃত মহিলাদের প্রতি অনুভূতি বয়ে যেতে শুরু করেছিলেন, যাদের সাথে তিনি বিবাহের মাধ্যমে নিজেকে ভালভাবে বেঁধে রাখতে পারেন, তবে বেশ কয়েকটি কারণে তিনি তা করেননি। হেনরিটা ভলজোজেনের এস্টেটে, যেখানে কবি ডিউকের অত্যাচার থেকে লুকিয়ে ছিলেন, তিনি যে মহিলার আশ্রয় করেছিলেন তার মেয়েটির সাথে তার প্রেমে পড়েছিল—শার্লোট, কিন্তু মেয়ে বা তার মা দুজনেই শিলারের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ দেখায়নি; মেয়েটি অন্য একজনকে ভালবাসত, এবং তার মা সমাজে কাব্যিক অবস্থান পছন্দ করতেন না। শিলারের জীবন ও সাহিত্যের ক্রিয়াকলাপের অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল অন্য শার্লোট—তার স্বামী কাল্বের পরে মার্শাল্ক ভন ওস্টিম নামে এক বিবাহিত মহিলা তবে শার্লোটের ভালবাসা শিলারকে অন্য নারীদের সাথে জড়িত হতে বাধা দেয়নি যেমন তার নাটকগুলিতে রচিত নাটকগুলিতে অভিনয় করা অভিনেত্রীরা,

বা সাহিত্যের এবং শিল্পকে ভালবাসেন এমন সুন্দরী মেয়েরা। শেষের একজন—মার্গারিটা শোয়ান, শিলার প্রায় বিয়ে করেছিলেন। কবিকে এই বিশ্বাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যে তিনি শার্লোটকেও বিয়ে করতে চান, এবং মার্গারিটার বাবা তার বিয়েতে সম্মতি দেননি। শার্লোটের সঙ্গে সম্পর্কগুলি খুব প্রাসঙ্গিকভাবে শেষ হয়েছিল—কবি এমন কোনও মহিলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন যে তার স্বামীর জন্য তার স্বামীকে তালাক দেওয়ার সাহস করেনি। শিলারের স্ত্রী ছিলেন শার্লোট ভন ল্যাংফেল্ড, যাকে কবি ম্যানহাইমে ১৭৮৮ সালে সাক্ষাৎ করেছিলেন, কিন্তু তিন বছর পরেই সত্যই তাঁর দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। মজার বিষয় হল, শার্লটের ভালবাসা কিছু সময়ের জন্য শিলারের সাথে তার বড় বোন ক্যারোলিনার প্রেমের সাথে সীমানা ফেলেছিল, যিনি, তার বোন এবং প্রিয় ফ্রেডেরিকের সুখের জন্য একজন প্রেমহীন ব্যক্তিকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাদের পথ ছেড়ে চলে গেছেন। শিলারের বিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০ সালে হয়েছিল।

শিলারের পরিপক্ক কাজের মধ্যে শিক্ষাগত আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটে। এক্ষেত্রে সর্বাধিক উদ্ঘাটিত হল ১৭৯৫ সালের 'আদর্শ ও জীবন' কবিতা, পাশাপাশি জার্মান নাট্যকারের দেরী ট্র্যাজেডিস, যেখানে একটি মুক্ত বিশ্বব্যবস্থার সমস্যাটি জনজীবনের কঠোরতার ক্ষেত্রে ভয়াবহতার পটভূমির বিপরীতে দাঁড়িয়েছে।

শিলার ছিলেন আভিজাত্য। আভিজাত্যটি শিলারকে ১৮০২ সালে জার্মান রাষ্ট্র দ্বিতীয় ফ্রান্সিস দ্বিতীয়ের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ দেওয়া হয়েছিল।

শিলারের স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। প্রায় তাঁর পুরো জীবন জুড়ে, কবি প্রায়শই অসুস্থ ছিলেন। জীবনের শেষদিকে শিলার যক্ষ্মা রোগের বিকাশ করেছিলেন। এই লেখক ওয়েইমারে ৯ মে ১৮০৫ সালে মারা যান।

রাশিয়ায় শিলারের কাজের প্রশংসা হয়েছিল। রাশিয়ান সাহিত্যে শিলারের শাস্ত্রীয় অনুবাদগুলি ঝুকভস্কির অনুবাদ। এছাড়াও শিলারের রচনাগুলি ডারজাভিন, পুশকিন, লের্মোনটোভ, তিউতুচেভ এবং ফেট অনুবাদ করেছিলেন। জার্মান নাট্যকার তুরগেনেভ, লিও টলস্টয়, দস্তয়েভস্কির সৃজনশীলতা প্রশংসিত হয়েছিল।

৪১১.৩.১১.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. শিলার কে?
২. শিলারের পুরো নাম কী?
৩. শিলারের রচনাসমূহের উল্লেখ করে সাহিত্যে তাঁর অবদান বর্ণনা করো।
৪. নন্দনতাত্ত্বিক শিলারের দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করো।

৪১১.৩.১১.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সৌন্দর্যতত্ত্ব—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
২. রসসমীক্ষা—রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
৩. নন্দনতত্ত্বের সূত্র—অরুণ ভট্টাচার্য
৪. Illusion and Reality—Christopher Caudwell
৫. Asthetics—Benedetto Croce

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক ১২
হোরেস

বিন্যাসক্রম

৪১১.৩.১২.১ ভূমিকা
৪১১.৩.১২.২ কাব্যনির্মাণ ভাবনায় হোরেস
৪১১.৩.১২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৪১১.৩.১২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.৩.১২.১ ভূমিকা

রোমান কবি ছিলেন হোরেস। পুরো নাম কুইন্টাস হোরাটিয়াস ফ্লাক্কাস। তিনি গ্রিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু সারা পৃথিবীতে তিনি হোরেস হিসেবেই পরিচিত। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের পরেই হোরেসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মূলত নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে। অ্যারিস্টটল লিখেছিলেন 'পোয়েটিকস' (Poetics)। আর হোরেস 'আর্স পোয়েটিকা' (Ars Poetica)। অ্যারিস্টটল কাব্যতাত্ত্বিক হলেও কখনও কবিতা লেখেননি। কিন্তু হোরেস কবিতা লিখেছেন, আবার কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন ধারণাও দিয়েছেন। তাই বলা যায় তাঁর 'কাব্যনির্মাণতত্ত্ব' নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের ভাবনা থেকে স্বতন্ত্র।

তাঁর জন্ম ইতালিতে। খ্রিঃ পূঃ ৫৬ অব্দে। পারিবারিক অবস্থা একদমই ভালো ছিল না তাঁদের। কারণ তাঁর বাবা ছিলেন মুক্ত ক্রীতদাস। তবুও পুত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য এথেন্সে পাঠিয়েছিলেন। লাতিন ও গ্রিক ভাষায় পারদর্শী এই কবি বহু কবিতা লিখেছেন। বলা যায় তিনি ছিলেন লাতিন ভাষার সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর যেসব গ্রন্থ পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'এপোডেস' (Epodes), 'স্যাটায়ার্স' (Satires, 1st & 2nd part), 'ওডস' (Odes, 1st, 2nd, 3rd & 4th part), 'এপিস্টলস' (Epistiles, 1st & 2nd part), 'হাজার বছরের গান' (Carmen Saeculare)। উল্লেখ্য, 'এপিস্টলস'-এর শেষ অংশটি 'আর্স পোয়েটিকা' নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত।

তিনি ছিলেন ভার্জিলের বন্ধু। ভার্জিলের পর হোরেসই ছিলেন রোমের শ্রেষ্ঠ কবি। বলা যায় তিনিই রোমের প্রথম পেশাদার লেখক। তিনি মূলত তিরিশ বছর কাব্য সাধনা করেছেন। 'ওডস' কাব্যই ছিল তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তির মূলে। কিন্তু কাব্যসাধনার শেষ পর্বে তিনি যে 'আর্স পোয়েটিকা' লিখেছিলেন তাতেই তাঁর সৃজনী শক্তির চরম প্রকাশ ঘটেছিল।

৪১১.৩.১২.২ কাব্যনির্মাণ ভাবনায় হোরেস

হোরেসের লেখা 'আর্স পোয়েটিকা'কে অনেকে পত্রকাব্য বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ কাব্যটি পত্রের আকারে কাব্যিক ছন্দে লেখা। যদিও কাব্যটি ছোট, তবুও এখানেই তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের মূল সুর লিপিবদ্ধ। এই কাব্যের মোট চরণ ৪৬৭ (চারশো সাতষট্টি)। এর রচনাকাল খ্রিঃ পূঃ ১২-০৮ অব্দ। 'আর্স পোয়েটিকা' এই নামটি কিন্তু হোরেস নিজে রাখেননি। রেখেছিলেন কয়েনতিলিয়াস। এই কাব্যের আসল নাম ছিল 'এপিসটুলা এড পিসোনেস' (Epistula ad Pisones)। প্রচলিত আছে পিসো ও তাঁর দুই পুত্রকে এক সময়ে নাকি হোরেস কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন এবং সেটি ছিল ছন্দোবদ্ধ ভাষায়। তাই গ্রন্থটির নামকরণের সঙ্গে পিসোনেস শব্দটি যুক্ত হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। অনেকে আবার এই কাব্যটিকে 'লিবার ডি আর্টে পোয়েটিকা' (Liber de arte Poetica) নামেও জানে। একাধিক নামে গ্রন্থটি পরিচিত হলেও সারা বিশ্বে এটি কিন্তু 'আর্স পোয়েটিকা' নামেই বিখ্যাত। এই গ্রন্থের কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব রচনা পদ্ধতির অনেকটাই মিল আছে। অ্যারিস্টটলের মতো হোরেসও শিক্ষার্থীদের পড়ানো বা উপদেশ দেওয়ার নিরিখেই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তাঁর পদ্ধতিও ছিল গ্রিক ভাবনাপ্রসূত। তিনি মনে করেছিলেন শুধু প্রতিভা থাকলেই হবে না, সাহিত্য ভাবনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিভার সঙ্গে শৈল্পিক সাধনার যোগ দরকার। আর শ্রেষ্ঠ রচনার ক্ষেত্রে তিনি একাধিকবার কোনও বিষয়কে লেখার কথা বলেছেন। এবং সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার আগে তা যেন অবশ্যই সমালোচকদের দৃষ্টিগোচর করানো হয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হোরেস শুধু কবিদের উদ্দেশ্যেই সাবধান বাণী করেননি, তিনি সমালোচকদের প্রসঙ্গও এনেছেন। তাঁদের কার্যকলাপ, পাঠপদ্ধতি সব কিছুই উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁর মন্তব্যটি একবার যাচাই করা সঠিক কাজ হবে—

> "If, after two or three vain trials, you said you could not do better, he would bid you blot it out and return the ill shaped verses to the anvil. If you preferred defending your mistake to amending it, he would waste not a word more, would spent no fruitless toil, to prevent your loving yourself and your work alone without a rival."

তাঁর 'আর্স পোয়েটিকা' পড়লে কাব্য নির্মাণ বিষয়ক অনেক তথ্য চোখে পড়ে। কিন্তু পাশাপাশি চোখে পড়ে এই পত্রকাব্যের প্রাপকদের প্রসঙ্গও। হোরেসের 'আর্স পোয়েটিকা'র অনুবাদক হিসেবে বিখ্যাত ফেয়ারক্লক। তিনি লিখেছেন—

> "There are a father and two sons of the Piso family, but nobody knows with certainty what particular Pisos and there are many on recor—they are."

যাই হোক পত্র প্রাপকদের পরিচয় জানানো এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁর কাব্যতত্ত্ব নির্মাণ সম্পর্কে কিছু জানা। ফেয়ারক্লকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী হোরেসের ভাবনাকে এইভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

১. প্রথম পর্ব (দেড়শো চরণ): এই পর্বের আলোচনা কাব্য বিষয় ও তার উপস্থাপনা বিষয়ক ঐক্যসাধন।

২. দ্বিতীয় পর্ব (পরের দেড়শো চরণ): নাটকের চরিত্র নির্মাণ ও তার যথাযথ উপস্থাপনা।

৩. তৃতীয় পর্ব (পরের পৌনে দুশো চরণ): কাব্য প্রতিভা ও জীবন জগৎ সম্পর্কে কবির পারঙ্গমতা বোধ।

৪. হোরেস তাঁর কাব্যতত্ত্বে মানব জীবনের রূপ-বৈচিত্র্যকেই অনুকরণ বা সৃজনের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ঐতিহ্য প্রসঙ্গ। আর বারবারই কাব্য বিষয় উপস্থাপন প্রসঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে এসেছে গতানুগতিকতার বাইরে লেখা ভাবানুবাদ ও মূল বিষয়ক অনুকরণ তথা সৃজনের প্রসঙ্গ।

'আর্স পোয়েটিকা'য় হোরেসের আলোচনা অভিনবত্বের দাবি রাখে। তিনি এখানে মূলত কবিতা সৃজন, ভালো লেখার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রসঙ্গই বলেছেন। সাধারণভাবে 'আর্স পোয়েটিকা' গ্রন্থটিকে ধরে ধরে বিশ্লেষণ করলে সাতটি গুরুত্বের কথা মনে পড়ে। সেগুলি এইরকম:

এক. কাব্যের ঐক্য

দুই. কাব্যের বিষয়

তিন. কাব্য রচনারীতি ও শব্দসৃজন

চার. কাব্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পাঁচ. কবির প্রতিভা ও তার চর্চা

ছয়. কাব্য নৈপুণ্য

সাত. কাব্য সমালোচনা

আট. অন্যান্য

প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মতো হোরেসের ভাবনাতেও এসেছে আদি, মধ্য, অন্ত্য যুক্ত কাহিনি ও তার ঐক্য প্রসঙ্গ। কাব্য-ঐক্য সাধন করাই কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং এটি তাঁকে করতে হবে খুবই দক্ষতার সঙ্গে। কোনও আনকোরা নতুন কাহিনি কাব্যে বিষয় হিসেবে আনলে তা যেন হয় আদ্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সামঞ্জস্যতাই কাব্য ঐক্যের মূল সুর। বারবারই তিনি 'Unity of Plot'-এর কথা বলেছেন। তার অর্থ মূল কাহিনি বা ঘটনার কোনও কিছুই বাদ দেওয়ার বিপক্ষে তিনি। সৃজনী শক্তির মাধ্যমেই কবি সত্য ও কল্পনার মধ্যে ঐক্যসাধন করবেন দক্ষতার সঙ্গে।

অ্যারিস্টটলের কাব্য বিষয় ছিল মানবজীবনের রূপবৈচিত্র্য। অর্থাৎ মানুষ যেমন ঠিক তেমনভাবে না এঁকে উন্নত বা অনুন্নতরূপে আঁকারই পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। হোরেসের ভাবনা এই বিষয়ে ছিল আরও উন্নত। তিনি কাব্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনের গভীর সম্পৃক্ততার কথা বলেছেন। যে কাব্য জীবনভাবনার গভীরতর দিক স্পর্শ করে না তাকে তিনি একদমই গুরুত্ব দেননি। ফলে তাঁর ভাবনার বিষয় হিসেবে এসেছে সমাজের দায়দায়িত্বের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ চরিত্র অঙ্কনে তিনি স্পষ্টতই বলতে চেয়েছেন সেইসব চরিত্র যাঁরা দেশ, মানুষ, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির প্রতি কতটা দায়িত্বশীল। অথবা বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কতটা কর্তব্যপরায়ণ, সে সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। বলা যায়, চোখে দেখা বাস্তব জীবনটাকেই তিনি কাব্যের বিষয় হিসেবে সিদ্ধান্ত করেছেন। কবিদের বাহ্য-আড়ম্বর ও দেখনদারিকে তিনি সবসময় অপছন্দ করতেন। পরিবর্তে কবিদের আত্মমূল্যায়ন ও সাধারণ জ্ঞানের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি যা বুঝবেন সেই অনুযায়ী কাব্যের বিষয় বা আঙ্গিককে নির্বাচন করতে বলেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—

> "Take a subject, ye writers, equal to your strength; and ponder long what your shoulders refuse, and what they are able to bear, whoever shall choose a theme within his range, neither speech will fail him, nor clearness of order."

কাব্যের মূল কথা হল ‘প্রকাশ’ (Expression)। আধুনিক যুগে ইতালির আর এক দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে প্রকাশবাদের কথা বলেছেন। কিন্তু প্রকাশবাদের স্রষ্টা নিঃসন্দেহে হোরেস। আর প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ভাষারীতি ও শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ। তিনি কাব্যের রচনারীতি প্রসঙ্গে ভাষা ও শব্দের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। যথার্থ কাব্যনির্মাণ তখনই সম্ভব হয় যখন শব্দ ব্যবহার, ছন্দ সৃজন ইত্যাদির যথার্থ প্রকাশ ঘটে। তাঁর মনে হচ্ছে কাব্য আসলে একটি গাছ। আর কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী সেই গাছের পাতাসমূহ। গাছ ঠিকই থাকে কিন্তু পাতা বছরে বছরে নতুন হয়। যে কবি শব্দ ব্যবহারে অভিনবত্ব দেখাতে পারবেন তাঁর কাব্যও দিনে দিনে নবরূপ পাবে। অর্থাৎ কাব্যের রচনারীতিতে শব্দ ব্যবহারের মুন্সিয়ানার কথা তিনি বারবার বলেছেন। সুতরাং তাঁর আলোচনায় বারবারই ফিরে এসেছে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্যের কথা। যেমন তিনি বলেছেন, ‘তুমি যদি আমাকে কাঁদাতে চাও তাহলে তোমাকেই আগে দুঃখে ভারাক্রান্ত হতে হবে।’ অর্থাৎ, দুঃখ, আনন্দ, রাগ বা যে কোনও ধরনের ভাষাকেই কবি প্রকাশ করেন। আর ভাষার কাজ কবির জীবন সত্যকে পাঠকের মনে প্রবেশ করানো। এর মূলেই রয়েছে শব্দ ব্যবহারের মুন্সিয়ানা। শব্দের মাধ্যমেই কবিরা তাঁদের কবিতায় কাব্যসুষমা সৃষ্টি করেন এবং সেই শব্দ ব্যবহার হবে বিষয়কেন্দ্রিক। শব্দ ব্যবহারের মুন্সিয়ানার উপরেই নির্ভর করে কবির শৈলী আর শৈলীই নির্দেশ দেয় রচনার উৎকর্ষতাকে। আলোচনায় দেখা গেছে এই যে শব্দ প্রকরণের বিষয়টি, কবিতায় এর যৌক্তিকতা বা ব্যবহারের গুরুত্ব প্রথম বুঝেছিলেন হোরেস। পরবর্তীকালে পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় এর প্রভাব লক্ষ করা গেছে। আসলে এটি সম্ভব হয়েছিল হোরেস নিজেই কবি ছিলেন এই জন্যে। তিনি কবির মন নিয়ে কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। অ্যারিস্টটল করেছিলেন পাঠকের দৃষ্টিতে। তাই বলা যায় কাব্যে রচনারীতি ও শব্দ সৃজনের বিষয়টি হোরেসের একদমই নিজস্ব।

কাব্যের উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কেও হোরেস মন্তব্য করেছেন ‘আর্স পোয়েটিকা’ গ্রন্থে। তাঁর মতে কাব্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল যথার্থ কাব্য সৃজন। এখানে তিনি কবিতার বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল স্বাভাবিকতা, স্পষ্টতা, বাস্তবধর্মিতা ইত্যাদি। কাব্যে অস্বাভাবিক কিছু সৃষ্টির বিরোধিতা করেছেন তিনি। যা যথাযথ, যা স্বাভাবিক তার কথাই তিনি বারবার বলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

> "Be brief, so that what is quickly said the mind may rapidly grasp and faithfully hold: every word in excess flows away from the full mind. Fictions meant to please should be close to the real, so that your play must no ask for belief in anything it choses."

এই স্বাভাবিকতা বা যথাযথতার মধ্যে পড়ে বাক্‌বিস্তারের সংক্ষিপ্ততা ও সম্পূর্ণ কাব্য বিষয়ের বাস্তবতা। তবে এটা ঠিক কোনও বিষয়কে অহেতুক সংক্ষিপ্ত করে তাকে যেন অস্পষ্ট করা না হয়, এ কথাও তিনি বারবার বলেছেন।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টতাও তাঁর মতে একটি বড় কাব্য বৈশিষ্ট্য। তাতে কাব্য হয় দীপ্তিমান, ঔজ্জ্বল্যময়। কাব্য ভাবনাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি যেমন অতিসংক্ষিপ্ততার বিরোধী ছিলেন, তেমনই বিরোধী স্ফীতকায়তারও। আলাদা করে তাঁর আলোচনায় চলে আসে বাস্তবতার প্রসঙ্গ। তিনি বারবারই কাব্যে বাস্তব জীবন ভাবনার কথা বলেছেন। এর সঙ্গে কবির মাত্রাজ্ঞান ও ঔচিত্যবোধের যোগ লক্ষণীয়। যেসব কবির এই গুণ নেই তাঁরা কখনও বড় শিল্পী হতে পারেন না। সুতরাং কবিকে সার্থক কাব্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সঠিক পথে এগোতে হবে। প্রথম থেকেই তাঁদেরকে আধিদৈবিকতা মুক্ত হতে হবে। অনেক সময় হোরেস কথিত বাস্তবতার সঙ্গে আধুনিক

রিয়ালিজমকে গুলিয়ে ফেলেন অনেকেই। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো হোরেসের বাস্তবতা আসলে কাব্যে উপস্থাপিত কোনও বিষয়কে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার বাস্তবতা। অর্থাৎ বিষয়টি যদি ঠিকঠাক ভাবে পাঠকের মনে দাগ না কাটে তবে কাব্যে বিশ্বাসযোগ্যতা আসে না। অর্থাৎ বলা যায় হোরেস কাব্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মূলত সর্বগুণান্বিত সার্থক শিল্প সৃজনের কথাই বলেছেন।

এবারে কবির প্রতিভা ও তাঁর চর্চা সম্পর্কিত আলোচনা। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে হোরেস প্রতিভা ও তার চর্চার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কবিকে শুধু প্রতিভাবান হলেই হবে না, তাঁকে যথাযথভাবে কাব্যের চর্চাও করে যেতে হবে। অর্থাৎ প্রতিভা ও চর্চার মিলনেই সৃষ্টি হয় উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন যেমন জরুরি তেমনই জরুরি সেই বিষয়ের ওপর নিরন্তর অনুশীলন। প্রতিভা যেমন কোনও বিষয়কে কাব্যগুণে শ্রেষ্ঠ করতে পারে, তেমনই কিন্তু প্রতিভাহীনতা গুরুত্বপূর্ণ ভাব বা বিষয়কে কাব্যহীন করতে পারে। সুতরাং প্রতিভার সঙ্গে চর্চার একটা গভীর যোগ তিনি লক্ষ করেছেন। চর্চা আছে, প্রতিভা নেই আবার প্রতিভা আছে, চর্চা নেই এই ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। একে অন্যের পরিপূরক এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। বলা যায় শুধু প্রতিভা বা শুধু চর্চা নয়, উভয়ের যথার্থ মিলনেই গড়ে ওঠে যথার্থ শিল্প। তাহলে বলা যায় প্রতিভাবান মাত্রই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পাবেন এইরকম ধারণা ঠিক নয়। হোরেস বলেছেন যে, প্রতিভাবানদের কাব্য মূলত যুগোত্তীর্ণ হতে পারে যদি সেটা মানুষের মনোরঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তা জীবনকে আনন্দ দেয়। পাশাপাশি জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে হোরেসের মন্তব্য আরও একবার মনে করা যেতে পারে—

> "Poets aim either to benefit, or to amuse or to utter words at once both pleasing and helpful to life."

কাব্য নৈপুণ্যের প্রসঙ্গে হোরেস বলতে চেয়েছেন কবির কাব্যপ্রতিভার কথা। ক্রীড়াবিদ বা সঙ্গীতজ্ঞরা যেমনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করে মাঠে বা আসরে নামেন, ঠিক সেইভাবেই সবদিক থেকে উপযুক্ত হয়ে কবিদের রচনা করতে নামা উচিত। কবিতা লেখার পর একাধিকবার সংশোধন করা উচিত। তিনি 'কাব্যনির্মাণভাবনায়' নবীন কবিদের সম্পর্কে কিছু সতর্কবাণী রেখেছেন। সেটার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় এইরকম—

> "তোমরা কখনও যদি কিছু লেখ, তাহলে তা সমালোচক মাইসিয়াসকে, তোমার বাবাকে এবং আমাকে শোনাবে। তারপর কাগজগুলোকে নয় বছরের জন্য দূরে সরিয়ে রাখ। যা প্রকাশ করনি তা নষ্ট করতে পারবে যে কোনো সময়, কিন্তু একবার প্রকাশিত হলে তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

কবির কাব্য নৈপুণ্য নির্ভর করে কবি প্রতিভা, চিন্তা-চেতনা, বিষয় নির্বাচন, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদির উপর। কবিকে সবসময়েই ধীরস্থির হয়ে কাব্যচর্চার কথা বলেছেন হোরেস। একটা কবিতা যতক্ষণ না যথার্থ রূপ পাবে ততক্ষণ তা প্রকাশের বিরুদ্ধেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মননকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মননের গভীরতাই উন্নত রচনার মূল অবলম্বন। যথার্থ মনন ছাড়া কখনওই শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা হতে পারে না। আর এই মনন ফুটিয়ে তুলতে কবির প্রয়োজন নিজস্ব স্টাইল। যে কাব্য যতটা শিল্পগুণ নির্ভর সেলই কাব্য ততটাই অভিজাত, ততটাই সূক্ষ্ম, ততটাই বিখ্যাত।

এবারে কাব্য সমালোচনার প্রসঙ্গ। তাঁর মনে হয়েছে যথার্থ সমালোচকেরও একটা দায় আছে। যিনি প্রকৃত সমালোচক তিনি সবসময়েই নিরপেক্ষ থাকবেন। তাঁর কাজ কবিকে আক্রমণ করা নয়। তাঁর কাজ কবিকে অহেতুক স্তাবকতা করাও নয়। তাঁর একমাত্র কাজ কবির ভুল যথার্থ ভাবে ধরিয়ে দেওয়া। কোনটা সঠিক,

কোনটা বেঠিক সে সম্পর্কে কবিকে সচেতন করা। অর্থাৎ কবির সত্যনিষ্ঠায় সহমত পোষণ করা। কাব্য অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি বারবারই যথার্থ নিরপেক্ষ সমালোচকের কথা বলেছেন। সমালোচকের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যকে যদি বাংলায় লেখা হয় তবে তা এইরকম হবে—

> ‘‘আমি শান পাথরের ভূমিকা পালন করবো, যা নিজে কাটতে পারে না, কিন্তু অস্ত্রকে ধারালো করতে পারে ঠিকই। যদিও আমি নিজে কিছু লিখি না, তবুও আমি কবিকে তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেবো। আমি তাকে বলবো, তার উপকরণ কোথায় পাওয়া যাবে, কি-ই বা তাঁর কবিত্ব শক্তিকে সমৃদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করবে; তাঁর করণীয় কাজে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে, কোনটি পাবে সঠিক পথ, সে পথ তাঁকে কোথায় নিয়ে যেতে পারবে, আর বেঠিক পথই বা নেবে কোথায় ইত্যাদি।”

হোরেসের বলা এই কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আদর্শ সমালোচকের কাজ সংশোধন করা। ছবিকে সামনে থেকে লক্ষ করলে বিভিন্ন রং, রেখা, তুলির টান ইত্যাদি দেখা যায়, কিন্তু দূর থেকে দেখা যায় ছবির সমগ্রতা। সমালোচকরাও প্রথমে কাব্যের অংশবিশেষ, পরে অবশ্য সমগ্রতার বিচার করবেন। অনেকে মনে করতে পারেন, এসব বোধ হয় ‘হোরেসীয় সমালোচনা ধারা’, কিন্তু বলা যায় হোরেস কোনও ধারার সৃষ্টি করেননি। এ সবই তাঁর দৃষ্টিতে কাব্য আদর্শ কাব্য সমালোচনার বৈশিষ্ট্য।

হোরেসের কাব্য ভাবনার অন্য দিকগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন পঞ্চাঙ্ক নাটকে পরিমাপ, মঞ্চে কোরাসের ভূমিকা, তিনাধিক চরিত্র না রাখার নির্দেশ ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি অনেক কথা বলেছেন। পাঠক বা দর্শকের কাছে পৃথিবীর যে কোনও কবি বা শিল্পীর প্রতিষ্ঠা মূলত সমীচীনতার জোরে। ‘আর্স পোয়েটিকা’র মূল সুর শৈল্পিক সমীচীনতার সূত্রে বহুরূপের উন্মোচন। এই প্রসঙ্গ ‘আর্স পোয়েটিকা’-র অনুবাদক ফেয়ারক্লফের বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়—

> "Both painter and poet are used to impress upon readers the lesson that in poetry as in other arts the main principle to be followed is propriety. The idea of literary propriety, which runs through the whole epistle, is illustrated in many ways, and may be said to give 'Ars Poetica' an artistic unity."

একটা কথা ভেবে অনেকেই আশ্চর্য হবেন, হোরেসের ‘আর্স পোয়েটিকা’ পত্রকাব্য শেষ হবার আকস্মিকতায়। এর শেষটা কোনও এক কবির অদ্ভুত আচরণে সম্পূর্ণ। আসলে যারা উপর উপর কবি কবি ভাব প্রকাশ করে কিন্তু কবিত্বে অভাব যাদের মধ্যে, তাদের প্রতিই কবি হোরেসের এই ধিক্কার, এই প্রত্যাখ্যান। আর এর মধ্যেই রয়েছে তাঁর কাব্যনির্মাণভাবনার মূল সুর।

৪১১.৩.১২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. কাব্যনির্মাণ ভাবনায় হোরেসের অবদান লিপিবদ্ধ করো।

২. হোরেসের লেখা 'Ars Poetica' গ্রন্থের সঙ্গে অ্যারিস্টটল রচিত 'Poetics' গ্রন্থের সম্পর্ক নিরুপণ করো।

৪১১.৩.১২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. নন্দনতত্ত্ব—ড. সুধীর কুমার নন্দী

২. পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা—নবেন্দু সেন সম্পাদিত

৩. সাহিত্য বিবেক—বিমল মুখোপাধ্যায়

৪. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

৫. নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য—সুখেন বিশ্বাস

৬. ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব—প্লেটো অ্যারিস্টটল : সুখেন বিশ্বাস

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক ১৩
টলস্টয়

বিন্যাসক্রম

৪১১.৪.১৩.১ ভূমিকা
৪১১.৪.১৩.২ শিল্প ভাবনায় টলস্টয়
৪১১.৪.১৩.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৪১১.৪.১৩.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.৪.১৩.১ ভূমিকা

লিও টলস্টয় বিশ্বসাহিত্যে জীবনশিল্পী হিসাবে পরিচিত। কারণ তাঁর কাছে জীবন মানেই শিল্প, শিল্প মানেই জীবন। অর্থাৎ তিনি নিজের জীবন অভিজ্ঞতাকে শিল্পের কাজে লাগিয়েছেন। রাশিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকের সামাজিক ও মানসিক অবস্থান, তাঁকে নব শিল্পবোধে উন্নীত করেছিল। তাঁর জীবন সাধনায় যেমন শান্তির বাণী ছিল, সেইরকম ভাবে শিল্পভাবনায়ও সেই বাণী ঝংকৃত। আসলে টলস্টয়ের শিল্পভাবনার মূলেই আছে বিচিত্র জীবনবোধ, জীবনপিপাসা ইত্যাদি। জার্মান দার্শনিক গ্যেটে একসময় বলেছিলেন, সত্যের শাশ্বত সন্ধানই মানুষকে করে তোলে মহান, সুন্দর। গ্যেটের মতো টলস্টয়ও সত্যকে দেখেছিলেন মুক্ত ভাবে। তাই তাঁর শিল্পচিন্তায় মোহমুক্ত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

তাঁর জন্ম ১৮২৮ সালে। রাশিয়ার ইয়াসানায়া অঞ্চলে। তিনি অভিজাত কাউন্ট পরিবারের সদস্য ছিলেন। সত্যই ছিল তাঁর জীবনে জিজ্ঞাসার প্রধান শর্ত। তাঁর জীবন মূলত দুটি পর্বে বিভাজিত। প্রথম পর্বে সত্যের সন্ধানে তিনি নানা স্থানে ঘুরেছেন। কখনও জুয়োর আড্ডায়, কখনও পতিতালয়ে, কখনও ধর্মস্থানে, কখনও কৃষিক্ষেত্রে, কখনও অভিজাত সমাজে, কখনও শ্মশানে বা যুদ্ধক্ষেত্রে। দ্বিতীয় পর্বে এইসব ছেড়ে তিনি চলে গেলেন খ্যাতি-প্রতিপত্তির শীর্ষে। এখানে সত্য ধরা দিয়েছিল অন্যভাবে। অর্থাৎ সব ছেড়ে এক আদর্শ রাজ্যে উত্তরণ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Kingdom of God'। প্রথম জীবনে যে নগ্ন সত্যের সন্ধানে তিনি বেরিয়েছিলেন, দ্বিতীয় জীবনে মহত্তর সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছেন। এই পর্বেই লিখেছেন শিল্প সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ ও কিছু প্রবন্ধ। যেমন—

১. 'On Art' (1895-97)

২. 'What is Art' (1898)

মূলত এই দুটি গ্রন্থেই তাঁর শিল্প সম্পর্কিত ভাবনা নবরূপ পেয়েছে। তবে এটা ঠিক তাঁর চিন্তা-ভাবনা যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ছিল, একথা বলা যায় না। তবে শিল্পের সত্য, মঙ্গল, সুন্দর ইত্যাদি সম্পর্কে যে সব ধারণা তিনি লিখে গেছেন, তা এখনও অনেকটাই প্রাসঙ্গিক। কারণ সব ধারণাই তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাজাত।

৪১১.৪.১৩.২ শিল্পভাবনায় টলস্টয়

টলস্টয় মনে করেছেন শিল্প কোনও মতেই মানবজীবন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। সমাজের শ্রমিক-কৃষক-মজুর প্রতিনিয়ত যে শ্রমের মাধ্যমে শিল্প গড়ে তুলছে তারাই রয়েছে অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে। ফলে শিল্প হয়ে উঠছে ধনিক শ্রেণির বিলাসিতার অবলম্বন। কিন্তু যারা নিজেদের শ্রম, সময় ব্যয় করছে তারা কী পাচ্ছে? শিল্পচিন্তায় টলস্টয়ের এই সুর গভীরভাবে ব্যঞ্জিত। এদের জন্য তিনি সহমর্মিতাও প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ শিল্প সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা-চিন্তা, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাই তিনি মনে করেছেন বর্তমানে অর্থাৎ সমানাধিকারের যুগে শুধুমাত্র দরিদ্র শ্রেণির অনিচ্ছুক মানুষকে শিল্পের কাজে লাগানো ঠিক নয়।—

> "It is impossible to constrain people to labour unwillingly for art, without first deciding the question whether it is true that art is so good and so important an affair as to redeem this evil."

তিনি শিল্পের নামে বিলাসীদের অকারণ আনন্দ-উল্লাস, হই-হট্টগোল একদমই পছন্দ করেননি।

শিল্পের অকৃত্রিমতা ও শিল্প সৃজন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিশেষভাবে গ্রহণীয়। কারণ তিনি চিন্তা-বিজ্ঞান-ধর্ম-শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রগুলি মানুষের অগ্রগতি ও সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে একত্রিত করেই দেখেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ছিল এইরকম—

> "যেহেতু চিন্তার ফসলকে একমাত্র তখনই অকৃত্রিম বলা যায়, যখন তা পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের অনুবৃত্তি না করে নতুন ধারণা ও চিন্তা সঞ্চারিত করে, তেমনি শিল্প সৃষ্টি একমাত্র তখনই অকৃত্রিম বিবেচনার যোগ্য—যখন তা মানুষের জীবনপ্রবাহে নতুন অনুভূতি (তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন) আনয়ন করে।"

টলস্টয় শিল্প বা শিল্পতত্ত্ব বোঝাতে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মতে শিল্প যেহেতু সামাজিক উদ্দেশ্যমুখী তাই বিজ্ঞানকেও তিনি এর আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। ফলে যে সমস্ত বিষয় সমাজে ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে, যেমন—শিশুমৃত্যু, বেশ্যাবৃত্তি, উপদংশরোগ সেগুলিকে নির্মূল করাই বিজ্ঞানের কাজ বলে তিনি মনে করেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, সমাজে নতুন জীবনরীতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করাই কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ নয়, এটি বিজ্ঞানের ভুল পথ। তাঁর মনে হয়েছিল বিজ্ঞান উদ্দেশ্যহীনভাবে যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে সেটি যথার্থ নয়। এর থেকে সহজেই বলা যায় সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর শিল্পভাবনা এবং বিজ্ঞানভাবনা একাকার হয়ে গিয়েছিল। টলস্টয় বিজ্ঞান ও শিল্পকে বস্তুগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর শিল্পভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পের সংজ্ঞায় তাই তিনি বলেছেন যে, যুগে যুগে নতুন নতুন উন্মেষশালী আবেগ মানবজীবনকে সঞ্জীবিত করে আসছে। বাক্‌শক্তির মতোই শিল্প গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রসারিত। এখানে যেহেতু বাক্‌শক্তির প্রসঙ্গ আছে, তাই উদাহরণ চলে আসে ভাষার। কারণ মানুষ কথা বলে ভাষার সাহায্যেই। এটাকেও তিনি সামাজিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে—

"মানবিক চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চারক ভাষাই মানুষের মধ্যে এই মিলন সূত্র রচনা করে। শিল্পও সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করে। শেষোক্ত মানব সম্পর্ক বিধায়ক উপায়টির বৈশিষ্ট্য শাব্দিক যোগসূত্রের উপায় থেকে পৃথক। সে বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ এই ভাষার সাহায্যে মানুষ নিজের চিন্তাসম্পদকে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, অপর পক্ষে শিল্পের মাধ্যমে সে নিজ অনুভূতিকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে।"

টলস্টয় মনে করেছেন সমাজের সব জায়গায় অবিশ্রান্তভাবে যুগ যুগ ধরে শিল্পধারা প্রবাহিত। কিন্তু অনেকেই সেটি মানতে চায় না। কেউ এই ধারাকে সমর্থন করে, আবার কেউ দমিয়ে রাখে। সুতরাং শিল্প যে সবসময় মানুষের গোচরে আসে, একথা তিনি কখনওই স্বীকার করেননি। গোচরেই থাকুক বা অগোচরেই থাকুক শিল্প যুগ যুগ ধরে চির প্রবাহিত। যা দেখতে সুন্দর তাকে অনেকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন, আর যা অসুন্দর তাকে দেননি, এই বিষয়ের বিরোধিতা করেছেন তিনি। অর্থাৎ শিল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ, প্রগতিশীল ও সম্প্রসারিত। এটা ঠিক, শোষক সমর্থিত কোনও শিল্পকেই তিনি সমর্থন করেননি। শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে কোনও শিল্পেই অনুভূতি বিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অকরুণ, অনাবশ্যক অনুভূতির জায়গায় অধিকতর দয়ার্দ্র ও আবশ্যক অনুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রূপান্তরের কারণ হিসাবে তিনি মানুষের মঙ্গল ভাবনারই জয়জয়কার করেছেন।

শিল্পে থাকে এক ধরনের চেতনা। যে চেতনা প্রগতিশীল সেটাই শিল্পে সমাদর পায়। আর যে চেতনা নিষ্প্রাণ, শিল্পে তার কোনও প্রয়োজন নেই। টলস্টয়ের বিশ্বাস সব যুগেই যে শিল্পের একটি নির্দিষ্ট ধারা গ্রহণীয় হবে, তার কোনও মানে নেই। যুগে যুগে এটি পরিবর্তিত হতে পারে। আর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই শিল্প নবরূপ পায়। এই প্রসঙ্গেই তাঁর এই উদ্ধৃতিটি একেবারেই প্রাসঙ্গিক—

"যে তত্ত্বটি দু'হাজার বৎসর পূর্বের একটি ক্ষুদ্র, অর্ধবর্বর, দাস নিয়োগকারী জনগোষ্ঠীর জীবনাদর্শ থেকে গৃহীত যে গোষ্ঠীর মানুষ নগ্ন মানবদেহের চমৎকার অনুকরণ এবং নয়ন সুখকর হর্ম্য নির্মাণ করতে পারত। অর্থাৎ উনিশ শত বৎসর কালব্যাপী খ্রীষ্টবাণী প্রচারের পরেও য়ুরোপী জাতিসমূহের কাছে এর চাইতে উচ্চতর কোনও আদর্শ নেই।"

টলস্টয়ের শিল্পভাবনা তাঁর দীর্ঘ জ্ঞান অভিজ্ঞতার ফসল। 'What is Art' গ্রন্থে তো তিনি জীবন ও শিল্পকে এক করে দেখেছেন। মানুষে-মানুষে যে সম্পর্ক, সেটা ভালোলাগা-ভালোবাসা-আন্তরিকতা যাই হোক না কেন, তার ওপরেই শিল্প নির্ভরশীল। এ কথা তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেছেন। তিনি শিল্পের বিভিন্ন অনুকরণ ও উপায়কে এক করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিকতা যত বাড়বে, ততটাই ভবিষ্যতের সামাজিক অস্তিত্ব বৃদ্ধি পাবে। শিল্পকে এরই সঙ্গে যুক্ত করে তিনি দেখিয়েছেন। তাই মনে হয়েছে মানুষের হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে ভাবানুভূতির সঞ্চার ঘটানোই শিল্পের কাজ। একে তিনি বলেছেন সঞ্চারবাদ। উল্লেখ্য শিল্প সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থেই একই কথা বলেছেন তিনি। প্রথমে 'On Art' গ্রন্থের কথা। এখানে বলেছেন—

"A work of art is then finished when it has been brought to such clearness that it communicates itself to others and evokes in them the same feeling that the artist experienced while creating it."

এবারে 'What is Art' গ্রন্থের কথা—

"Art is a human activity consisting in this, that one man consciously by means of certain external signs, hands on to other's feelings he has lived through, and that others are infected by these feelings and also experience them."

টলস্টয় মনে করতেন শিল্প হবে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। তার কারণ যে শিল্প যত সহজ-সরল হবে, সেই শিল্পের অনুভূতি ততটাই অন্যের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে। শিল্প যেহেতু একটি মানবিক ক্রিয়া, তাই একটি মানুষের মন থেকে সহজেই অন্য একটি মানুষের মনে পাঠানো সম্ভব। একজন শিল্পী শিল্পের মাধ্যমেই নিজ মনের অনুভূতিকে শিল্পরসিকের মনে সঞ্চারিত করেন। একে সঞ্চারবাদ নামে ব্যাখ্যা করা যায়। শিল্প সম্পর্কিত ধারণা বিষয়ে টলস্টয়ের এই দিকটাই উঠে আসে। এটি অবশ্যই মানবজীবনকেন্দ্রিক। তিনি মনে করেছিলেন শিল্প মানবপ্রীতির বন্ধনকে ক্রমশ সুদৃঢ় করে। শিল্প মানুষের হৃদয়ের প্রসার ঘটায়। কোনও শিল্প বা সাহিত্য যদি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারে, তবে কোনও মূল্য নেই। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শিল্পানুভূতির সংক্রমণটাকে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এটাই আসলে সঞ্চারবাদ। এটাই তাঁর শিল্পভাবনার মানদণ্ড। তবে সব মানবিক ক্রিয়াকেই তিনি কিন্তু শিল্পের পর্যায়ে ফেলেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টই বলেছেন—

"We do not mean all human activity transmitting feelings but only that part which we, for some reason, select from it and to which attach special importance."

শিল্পের সহজতা, সরলতাকে গ্রহণ করার জন্যেই তিনি মনে করেছিলেন, যে সব শিল্প দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট সেগুলিকে শিল্পভাণ্ডার থেকে তাড়াতে হবে। এর পাশাপাশি তিনি শিল্পের মহানুভবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেই মহানুভবতা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কখনওই সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। অর্থাৎ যে শিল্প ব্যক্তিসুখ দেয়, কিন্তু সমগ্র মানবজীবনে তা উপকারে লাগে না, তাকে তিনি মোটেই গুরুত্ব দেননি। শিল্প সম্পর্কে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সংগ্রামী মানবজীবনের রূপবৈচিত্র্যকে তুলে ধরা। কিন্তু তা যেন বৃহত্তর মানুষের কাজে লাগে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাঁর মতে কৃষক-শ্রমিক-মজুর ইত্যাদি। এই শিল্প যদি তারাই বুঝতে না পারে, তবে সেই শিল্পের কোনও মূল্য নেই। তাই এখান থেকে তাঁর 'Universal Art' (সর্বজনীন শিল্প) ধারণাটি স্পষ্ট হয়েছে।

সমকালীন শিল্প সম্পর্কে টলস্টয়ের বক্তব্যটা খুবই বিরক্তিকর। কারণ বহুমূল্যে বিক্রীত শিল্পে কখনওই স্রষ্টা বা পরিবেশক আনন্দ পান না। কারণ হিসাবে তাঁর বক্তব্য, ধনিক বা অভিজাত শ্রেণির মানুষরা ওইসব শিল্পবস্তু কেনে বলে এগুলি হয়ে ওঠে শুধুমাত্র উপভোগের সামগ্রী। ধনীরা যেহেতু বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে যোগহীন, তাই সেখান থেকে কোনও সর্বজনীন আবেগ সঞ্চারিত হয় না। শিল্পবস্তুটাই ক্রমশ তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। তাদের কাছে যৌনচর্চা, উত্তেজনা, অহংকার এগুলিই বড়, শিল্প বা শিল্পী নয়। এটি সমকালীন শিল্পের একটি সংকট বলে মনে করেছিলেন টলস্টয়। অনেকে ধনিক শ্রেণির জীবনযাত্রাকে বৈচিত্রপূর্ণ মনে করলেও টলস্টয়ের মতে তারা মাত্র তিনটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ সরল অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন—আত্মগরিমা, যৌন আকাঙ্ক্ষা ও জীবনাবসাদের অনুভূতি। শিক্ষিত বা নন্দনতাত্ত্বিকরা শ্রমিক কৃষকের জীবনকে বৈচিত্রহীন বললেও টলস্টয় বলেছেন জীবন অভিজ্ঞতায় এরাই বৈচিত্রপূর্ণ। কারণ শ্রমজীবী মানুষই সভ্যতার ধারক ও বাহক। তাদের নিরবিচ্ছিন্ন কর্মধারা সমাজ সভ্যতাকে টিঁকিয়ে রেখেছে। পৃথিবীর বিচিত্র কাজ এরা করে থাকে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ধনিক শ্রেণির মানুষ সাধারণত মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রম ছড়ায় শিল্পবস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে। শিল্প যে ক্রমশ বিকৃতি লাভ করেছে, তার কারণ হিসেবে টলস্টয় মনে করেছেন এটি সম্ভব হয়েছে ধনিক সম্প্রদায়ের

উপভোগের আগ্রহের ফলে। কারণ এরা সেই পুরাতন ও পুনরাবৃত্তিমূলক ধারণাকে এখনও আঁকড়ে আছে। যান্ত্রিক প্রবৃত্তি এদের জীবনে মুখ্য বলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুভূতি এদেরকে স্পর্শ করেনি।

শিল্প শুধু ধনিক সম্প্রদায়ের হাতেই বিকৃতি লাভ করেনি। যারা বড় বড় মাধ্যমের পেশাদারী সমালোচক তাদের দ্বারাও শিল্প বর্তমানে বিকৃত। কুসংস্কার, যৌন প্রবৃত্তিকে সমর্থন করায় শিল্প ক্রমশ বিষয়গত দিক থেকে সরে গিয়ে বিষয়বস্তুতে বিকৃত হয়েছে, উপস্থাপন ও প্রকরণগত দিক থেকেও।

শিল্প ভাবনায় সমকাল নিয়ে যেমন টলস্টয় আলোচনা করেছিলেন, তেমনি ভাবীকালের শিল্পের কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর মতে প্রগতিশীল শিল্প মানেই সেটি সর্বজনীন। সেটি ভবিষ্যতের হতে পারে, আবার বর্তমানেরও। এই ধরনের শিল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে টলস্টয় বলেছেন বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আত্মদান, আত্ম-অনুশোচনা ইত্যাদি। কিন্তু অনেক শিল্পীই তো স্বতন্ত্রভাবে প্রতিনিয়ত শিল্প সৃজন করে চলেছেন, তার বেলায় তিনি কী বললেন? এ ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট কোনও বক্তব্য রাখেননি। তবে গতানুগতিক ও অভ্যাস নিয়ন্ত্রিত শিল্পকে তিনি মোটেই চাননি। যে শিল্পের মধ্যে কদর্যতা, বিকৃতি ইত্যাদি আছে, তাকে তিনি শিল্প হিসাবে মানেননি। তিনি মনে করেছেন যেভাবে সমকালে শিল্পভাবনা চলছে, এইভাবেই যদি শিল্পীরা অভিজাত ধনিক সম্প্রদায়ের ভাবনা চিন্তা, জীবনযাত্রা প্রণালীকে অনুসরণ করে, তবে তা হবে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।

তবে কবি মাত্রেই তো আশাবাদী। টলস্টয়ও এখানে আশা ছাড়েননি। তিনি মনে করেছেন আগামী দিনের শিল্প ও শিল্পীরা বৈচিত্রময় প্রাণবন্ত হবেন। কৃষক-শ্রমিকের দাবি ফুটে উঠবে তাঁদের শিল্প ভাবনায়। শিল্পীরা সকলেই শ্রম ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হবেন আর শিল্পী নির্দিষ্ট শিল্পসমাজকে সুসংহত করে প্রগতিশীলতার দিকে নিয়ে যাবে।

টলস্টয়ের শিল্পভাবনায় জীবনবোধ ও বাস্তববোধ ও বাস্তবতার আধিক্যই লক্ষণীয়। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। কিন্তু শেষ দিকে শিল্প বিচারের বেলায় প্রাধান্য দিয়েছেন জীবনবোধ ও বাস্তবতাকে। এখানেই তাঁর প্রশ্ন সুন্দর আসলে কী? তার স্বরূপই বা কিরকম? উত্তর অবশ্য তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে সৌন্দর্য আসলে এক ধরনের প্রহেলিকা, যা মানুষের মনের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। রুশ ভাষায় একটা শব্দ আছে 'Krasota'। এই শব্দের মাধ্যমেই সৌন্দর্যের ধারণা কিছুটা হলেও অনুভব করেছিলেন রুশবাসীরা। অর্থাৎ যে বস্তু বা বিষয় দেখে চোখে লাগে তৃপ্তির স্পর্শ সেটাই সুন্দর। কিন্তু বিভিন্ন মানুষের চোখে বিভিন্ন জিনিস তৃপ্তির স্পর্শ দেয়, সেই সবকিছুই নিশ্চয় সর্বজনীন রূপে সুন্দর হতে পারে না। তাই টলস্টয় দার্শনিকদের দেওয়া সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন শিল্প বা সৌন্দর্যের কি কোনও সর্বজনীন সংজ্ঞা হতে পারে? পৃথিবীর প্রায় সকল দার্শনিকই এর উত্তরে না বলেছেন। টলস্টয় সৌন্দর্য সম্পর্কে দুটি ধারণার কথা বলেছেন। প্রথমত সৌন্দর্য স্বতন্ত্র, এর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের উর্ধ্বে সৌন্দর্যের অবস্থান, নিশ্চিতরূপেই এটি আনন্দদায়ক। টলস্টয় কথিত প্রথম ধারণাটি নিশ্চয়ই স্বীকার্য, কিন্তু রহস্যে মোড়া। এর সঙ্গে বিষয়ের যোগ লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মতটির মধ্যে কোনও রহস্যময়তা নেই। বিষয়টি সকলেরই বোধগম্য। এর সঙ্গে ব্যক্তির যোগ লক্ষণীয়। পাশ্চাত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পতত্ত্ববিদ যেমন—শেলিং, হেগেল প্রমুখ শিল্প, ধর্ম, দর্শনের প্রতিটি স্তরেই সৌন্দর্যের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে টলস্টয়ের মতো পূর্বোক্তদের ধারণাও যথার্থ নয়। কারণ এইসব ধারণার মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই। টলস্টয়ের প্রশ্ন সবকিছুর মধ্যেই যেহেতু সৌন্দর্যের

উপস্থিতি লক্ষ করেছেন নন্দনতাত্ত্বিকরা, তাহলে আর সৌন্দর্যের বিশেষত্ব থাকল কোথায়? ফলস্বরূপ তিনি নিজেই সৌন্দর্যের একটা ধারণা প্রস্তুত করেছেন। সেটা এইরকম—

ক. In its objective aspect we call beauty something absolutely perfect.

খ. In its subjective aspect, we call beauty that which supplies us with a particular kind of pleasure.

টলস্টয় কথিত প্রথম ধারণা থেকে বলা যায়, এখানে সৌন্দর্য নির্ভরশীল বস্তুগত দিক থেকে। দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে বস্তুকে বাইরের দিক থেকে নিখুঁত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে হয় সেটাই আসলে সুন্দর। আবার ভিতরের দিক থেকে তিনি বলতে চেয়েছেন যা আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত করে, আনন্দ দেয় সেটাই সুন্দর।

অ্যারিস্টটল, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ দার্শনিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গল, কল্যাণ ইত্যাদির একাত্মতা লক্ষ করেছিলেন। অর্থাৎ মঙ্গল-কল্যাণ সৌন্দর্য সমার্থক। কিন্তু টলস্টয় দার্শনিকদের এই ধারণার বিরুদ্ধতা করেছেন। শিল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা প্রেরণা যে সুন্দরের আরাধনা এ কথাও মানেননি তিনি। এ ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন ধর্মীয় চেতনার কথা। যা সমাজের মঙ্গলভাবনাকে নির্দেশ করে। দক্ষ শিল্পীদের জীবনভাবনা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়—

> "A really artistic production can not be made to order, for a true work of art is the revelation (by law beyond our grasp) of a new conception of life arising in the artist's soul, which, when expressed, lights up the path along which the humanity progress."

সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের কামনা-বাসনাকে এক করে দেখেছেন টলস্টয়। তাঁর মনে হয়েছে কাম ভাবনা ও বিলাসিতা থেকেই সৃষ্টি হয় সৌন্দর্য। তবে যদি কামবোধ জয় করে সৌন্দর্যকে খোঁজা যায়, তবেই মঙ্গলের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এবারে টলস্টয়ের সৌন্দর্য ভাবনাকে এই ভাবে বিচার করা যেতে পারে—

প্রথমত: সৌন্দর্যের কোনও সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের ভোগ প্রবণতা, কামনা বাসনা, চটুল স্বার্থপরতা, স্বৈরাচারিতার যোগ লক্ষণীয়। তিনি চান এসব থেকে শিল্পকে মুক্ত করতে। যেহেতু তিনি সমাজ জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগ খুঁজেছেন, শিল্প যেহেতু মানবিকতার সঙ্গে যুক্ত, তাই তাঁর সিদ্ধান্ত শিল্প একটি মানবিক ক্রিয়া।

দ্বিতীয়ত: সৌন্দর্যের উৎস হিসাবে টলস্টয়ের ধারণা এইরকম, অন্যের শ্রমকে নিজের করে যাঁরা ভোগবিলাসিতায় জীবন কাটায়, তাঁরাই তো আত্মিক সংকট থেকে বাঁচতে একসময় শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন।

তৃতীয়ত: শিল্প বিষয়ে তিনি দুটি ধারণার প্রবক্তা। তা হল সর্বজনীন শিল্প ও সঞ্চারবাদ। প্রথমটিকে তিনি সেই শিল্পই বলেছেন, যার আবেদন পৃথিবীর সকল কৃষক-শ্রমিক-মজুরের কাছে। দ্বিতীয়টিতে শিল্পের সার্থকতা বোঝাতে সঞ্চারবাদের প্রসঙ্গ এনেছেন। অর্থাৎ সৌন্দর্য ভাবনাকে মানুষের মনে সঞ্চারিত করাই হল আসল শিল্প। যে শিল্পে সমাজ অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তাকে তিনি গুরুত্ব দেননি।

টলস্টয়ের শিল্প ভাবনা সম্পর্কে লেনিন তাঁর 'On Literature and Art' গ্রন্থে যথার্থই মূল্যায়ন করেছেন—

> "Leo Tolstoy is dead. His universal significance as an artist and universal fame

as a thinker and preacher reflect, each in its own way the universal significance of the Russian revolution."

৪১১.৪.১৩.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. টলস্টয়ের শিল্পভাবনা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।
২. 'What is Art' গ্রন্থে টলস্টয় শিল্প ও জীবনকে এক করে দেখিয়েছেন, বিষয়টি লিপিবদ্ধ করো।
৩. 'On Art' গ্রন্থে টলস্টয় শিল্পের যে ধারণা দিয়েছেন তা বুঝিয়ে দাও।

৪১১.৪.১৩.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. নন্দনতত্ত্ব—ড. সুধীর কুমার নন্দী
২. পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা—নবেন্দু সেন সম্পাদিত
৩. সাহিত্য বিবেক—বিমল মুখোপাধ্যায়
৪. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
৫. নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য—সুখেন বিশ্বাস
৬. ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব—প্লেটো অ্যারিস্টটল : সুখেন বিশ্বাস

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক ১৪
জাঁ-পল সার্ত্র

বিন্যাসক্রম

৪১১.৪.১৪.১ ভূমিকা
৪১১.৪.১৪.২ সাহিত্য চিন্তায় জাঁ-পল সার্ত্র
৪১১.৪.১৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৪১১.৪.১৪.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.৪.১৪.১ ভূমিকা

জাঁ-পল সার্ত্রের পরিচিতি অস্তিবাদী দার্শনিক হিসাবে ভুবনজোড়া। গতানুগতিক ভাবনাকে এড়িয়ে সার্ত্র তাঁর নান্দনিক ভাবনায় এনেছিলেন অস্তিবাদী ভাবনা। চিন্তার সঙ্গে জীবনের একাত্মতা সৃজনে সার্ত্র অসাধারণ শিল্পী। সাধারণত লেখক শিল্পীরা বাস করে থাকেন নিঃশব্দ দর্শনের জগতে, সেখানে বাস করেও সার্ত্র কখনও ভুলে যাননি মাটির পৃথিবীর কথা। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল তাঁর শিল্পী জীবনের অনন্য দিক। বাস্তব পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাই তিনি মানুষের মুক্তি চেয়েছেন। স্বদেশ বা বিদেশ পৃথিবীর যেখানেই মানুষ নির্যাতিত হয়েছে, সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন তিনি। সবরকম প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। তাই তো খুব সহজেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন 'লিজিয়ন-অব-অনার'-সহ 'নোবেল' পুরস্কারও।

সার্ত্রের জন্ম ১৯০৫ সালে। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে। জন্মের এক বছরের মধ্যে পিতার মৃত্যু হলেও, পরবর্তীকালে তিনি স্বীকার করেছেন এই মৃত্যু ছিল তাঁর জীবনে আশীর্বাদের মতো। নাটক, উপন্যাস, গল্পের পাশাপাশি তিনি লিখেছিলেন দর্শন সম্পর্কিত একাধিক গ্রন্থ।

১. উপন্যাস: 'নসিয়া' (১৯৩৮), 'দি ওয়েজ অফ্ ফ্রিডম' (চার খণ্ডে সমাপ্ত, ১৯৪৫) প্রভৃতি।
২. নাটক: 'দ্য ফ্লাইজ' (১৯৪৩), 'নো এক্সিট' (১৯৪৪), 'ডার্টি হ্যান্ডস' (১৯৪৮), 'লুজার উইনস' (১৯৬০) ইত্যাদি।
৩. সমালোচনামূলক গ্রন্থ: 'বোদলেয়ার' (১৯৪৭), 'সাঁ জেনে এক্টর অ্যান্ড মার্টার' (১৯৫২), 'ফ্লবেয়র' (১৯৭১) প্রভৃতি।
৪. দার্শনিক গ্রন্থ: 'ক্রিটিক অব দ্য ডায়ালেকটিক্যাল রিজন' (১৯৬০) ইত্যাদি।
৫. আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ: 'দ্য প্রাইম অব লাইফ' (১৯৬২) ও 'দ্য ওয়ার্ডস' (১৯৬৩)।

৬. নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়ক গ্রন্থ: ‘হোয়াট ইজ লিটারেচার’ (১৯৫০) ও ‘দ্য ওয়ার্ডস’ (১৯৬৩)।

এর মধ্যে 'The Words' ও 'What is Literature' গ্রন্থ দুটিতে তাঁর নান্দনিক ভাবনার পরিচয় স্পষ্ট। আলোচনা শুরু করা যেতে পারে 'The Words' এর একটি উক্তি দিয়ে—

> "I had armed myself to defend humanity against terrible dangers and everyone assured me that it was advancing gently towards perfection."

৪১১.৪.১৪.২ সাহিত্য চিন্তায় জাঁ-পল সার্ত্র

সার্ত্র বলতে চেয়েছেন শুধু লেখার জন্যেই লেখা নয়, মানুষের জন্যেই তাঁর লেখা। মানুষের মুক্তির জন্যই তো তিনি কলম ধরেছিলেন। প্রথম থেকে শেষ অবধি এই জন্যেই তিনি তাঁর কলমটাকে ব্যবহার করেছিলেন তরবারির মতো করে। অর্থাৎ তাঁর ভাবনা ও চিন্তা চেতনায় ছিল সমাজকেন্দ্রিক শিল্পীজনোচিত মানসিকতা। তাই তিনি বলতে পারেন, 'for a long while I treated my pen as a sword'। উল্লেখ্য তাঁর 'The Words' গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত। সেটি হল 'Reading' ও 'Writing'। 'Reading' পর্বে শব্দগুলি পড়ার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হয়েছে। আর 'Writing' পর্বে লেখার শৈলীগত দিক বিশ্লেষিত। তাঁর মতে শব্দই লেখনীর মুখ্য অবলম্বন। শব্দের অপার ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। শব্দের সাহায্যেই তো যে কোনও লেখক খুব সহজ ভাবেই মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। বারবারই তিনি শব্দশক্তির কথা বলেছেন। একজন চিত্রকর বর্ণরেখার সাহায্যে ছবি তৈরি করে থাকেন। ওই ছবির মধ্যেই শিল্পীর ভাবনা পরিস্ফুট থাকে। এতে দর্শক বা শিল্পরসিক সহজেই উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু সেইসময় চিত্রকর থাকেন একেবারে নির্বাক হয়ে। শিল্পরসিকদের আনন্দ দানেই তাঁর সার্থকতা। ঠিক সেইরকমভাবে লেখকও শব্দের সাহায্যে লিখিত ভাবনাকে পাঠকমনে অনুভূতির সৃষ্টি, আবার ঘৃণামিশ্রিত রাগও ফুটিয়ে তুলতে পারেন। সার্ত্রের মতে শব্দশক্তিই এই কার্যকারণের মূলে। তিনি বলেছেন, 'I saw words as the quintessence of thinks.'

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন, কাব্যভাষার শব্দ আর গদ্যভাষার শব্দ কী একই রকম? উত্তরে বলা যায়, কাব্যভাষার মাধ্যমে একজন কবি খুব সহজেই পরিচিত জগৎটা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন। আর গদ্যভাষায় পরিচিত জগৎটা বাইরে ছড়িয়ে যায়। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন পদ্য আসলে একটা বস্তু আর গদ্য কার্য সম্বন্ধীয়। পদ্যে একেকটি শব্দ বস্তুর মতো তৈরি হয়। গদ্যে সেটা হয়ে যায় কার্য সম্বন্ধীয়। কবিতায় শব্দের সাহায্যে বিশ্ব গড়ে ওঠে। আর গদ্যে বিশ্ব প্রসারিত হয়। একজন চিত্রকর রং তুলির সাহায্যে ছবি আঁকেন। কবিও ছবি তৈরি করেন শব্দ সম্ভারে। সার্ত্র বলতে চেয়েছেন কাব্যের ক্ষেত্রে আগে আসে বাক্যের ধারণা। সেই বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট করতে শব্দ বসাতে হয়। এই শব্দগুলিই অনুভূতি থেকে জাত। গদ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যরকম। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোই গদ্য ভাষার মূল সুর। গদ্যে শব্দের উপযোগিতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যেরই মূল লক্ষ্য পাঠকের কাছে শিল্পীর বক্তব্যকে পৌঁছে দেওয়া। আর তার মূলে আছে শব্দ। শব্দের উৎসেই আছে নৈশরংজনিত আঁধার। একজন সাহিত্যিক শব্দ দিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করেন। পাঠক তার থেকে বুঝে যায় সেই বাড়ির মর্মার্থ। সেই মর্মার্থ, সার্ত্রের ভাষায় এইরকম—

> "One of the chief motives of artistic creation is certainly the need of feeling that we are essential in relationship to the world."

যেহেতু সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে শব্দ ব্যবহারের একটা গভীর যোগ আছে, তাই সার্ত্র মনে করেন কোনও শব্দের ইঙ্গিতবাহী ব্যঞ্জনায় প্রবল গতি সৃষ্টি হয়। 'The Words' গ্রন্থেই শব্দের তত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সার্ত্র বলেছেন, 'Poets are men who refuses to utilized language'. এখানে বলা যায় তিনি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেই ভাব প্রকাশে ভাষা ব্যবহারের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। কবিরা শব্দকে কখনই ধ্বংস করেন না। অনেকে অনেক সময় বলে থাকেন ছন্দের প্রয়োজনে নাকি শব্দ ধ্বংস হয়ে যায়। কবিরা শব্দের মাধ্যমে সেই কথাই বলেন যা গতানুগতিক জীবনের ভাষা থেকে অনেকটা আলাদা। যেটাকে নীরবতার অনেক উঁচুতেই তিনি ঠাঁই দিয়েছেন। সুতরাং কবিতায় বা গদ্যে শব্দ শুধু চিহ্ন নয়, কডওয়েলের সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায়, কাব্য অবশ্যই শব্দ দ্বারা গঠিত। তবে সেই শব্দ মূর্ত, অপ্রতীকধর্মী। সার্ত্রের মতেও, শব্দ অপ্রতীকধর্মী। তিনি একে চিহ্ন হিসাবে দেখেননি। বিষয়বস্তুকে ভাবের উপযোগী করার জন্যে কবিকে বাইরে থেকে শব্দ নির্বাচন করতে হয়। এই শব্দই কবিতায় ইমেজ বা চিত্রকল্প তৈরি করে। বাস্তব জগৎ শব্দের দ্বারা অনুভূতিকে রূপ দেয়। কবিতার মধ্যে ইমেজ তৈরির ক্ষেত্রে শব্দের ভূমিকা অত্যাশ্চর্য। বাইরে থেকে সেই সব শব্দের আলাদা করে যাদু বোঝা যায় না। কিন্তু কাব্যের মধ্যে থেকে শব্দ যে চিত্রকল্প তৈরি করে, তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখে শুনে অনুভূতির ধারা বুঝে নিতে হয়। কবি শব্দ ব্যবহার করেন অনেক গুঢ়ার্থ ভেবে। সার্ত্র লিখেছেন—

> "Is senority, its length, its masculine or feminine endings, its visual aspect compose for him (sic) a fact of flesh which represents rather than express meaning. Inversely, as the meaning is realized, the physical aspect of the word is reflected within it, and it, in turn, functions as an image of the verbal body."

সার্ত্র যেমন শব্দের প্রসঙ্গে বলেছেন, তেমনি শব্দার্থ নিয়েও তাঁর আলোচনা আছে। কারণ শব্দার্থই কাব্যে প্রকৃত জগতের উপস্থাপন করে। একে 'প্রতিবিম্বন তত্ত্ব' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। কবিতার ক্ষেত্রে সার্ত্র আদর্শ শিল্পকর্মের উপস্থাপনে শব্দের যথাযথ ব্যবহারকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সিগমুন্ড ফ্রয়েড সার্ত্রের এই ভাবনাকে সামনে রেখে বলেছেন—

> "শব্দকে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় বিষয়ের মর্যাদা দিয়েছেন এবং ভাষাকে বিশ্বজনীন এক মাত্রা দিতে চেয়েছেন।"

সার্ত্রের আরও একটি গ্রন্থে নান্দনিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। সেটি 'What is Literature'-এর বাংলা তর্জমা 'সাহিত্য কী'। এই গ্রন্থটি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। সেগুলি হল—

ক. লেখা কী?

খ. কেন লেখা?

গ. কার জন্যে লেখা?

ঘ. ১৯৪৭-এ লেখকের অবস্থা।

ঙ. নিজের সময়ের জন্যে লেখা। (পরিশিষ্ট)

পাঁচটি পরিচ্ছেদের মধ্যে চতুর্থটাই সব থেকে আয়তনে বড়। পঞ্চমটা সবচেয়ে ছোট। তবে পাঁচটি লেখারই মূল সুর স্বাধীনতার কাছে কমিটমেন্ট। আমরা জানি অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির তত্ত্বে 'Pity and Fear'-এর

কথা বলেছেন। ঠিক সেইরকম ভাবে এই গ্রন্থেও তিনি বলতে চেয়েছেন উপন্যাস, নাটক ও চরিত্রের উপর পাঠকরাই হল 'Confers objects perspectives and horizon'।

এই গ্রন্থে সাহিত্যে দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর দায়বদ্ধতার বিষয়টি অস্তিত্ববাদী শিল্পতত্ত্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাধারণত শিল্পকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, অস্তিত্ববাদীদের পক্ষে সেইভাবে হয় না। 'What is Literature' গ্রন্থে সার্ত্র শিল্পের জন্যেই শিল্প নয়, মানুষের জন্যেই শিল্প—এরই জয়ধ্বনি করেছেন। অর্থাৎ এখানে নান্দনিক মূল্যবোধের বিশেষ গুরুত্ব নেই। পরিবর্তে সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কথাই স্পষ্ট। তাঁর মনে হয়েছে শিল্প সৃষ্টি করতে গেলে সবসময় শিল্পী রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। করলে তাঁর চারিত্রিক অখণ্ডতায় ভাঙন ধরে। নিজস্ব বাস্তব সত্য বোধ থেকে তিনি চ্যুত হন। তিনি এই গ্রন্থের প্রতিটি জায়গায় এই তত্ত্বকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ সাহিত্যের ব্যবহারিক দিক, ঐতিহাসিক দিক সব কিছুর মধ্যে দায়বদ্ধতার ঐক্য বর্তমান। ফলে তিনি মনে করেছেন, পৃথিবীর সমস্ত শিল্পই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সৃষ্টি হয়েছে।

এই গ্রন্থে মানবতাবাদের ব্যাপারটাও খুবই স্পষ্ট। তিনি মনে করেছেন বাস্তব জীবন বা সংসার রীতিমতো সংকুল। তার থেকে শিল্পীকে আলাদা করে সাহিত্য রচনায় প্রেরণা দেওয়া নিশ্চিতরূপেই ষড়যন্ত্রের মতো। সুতরাং যে শিল্প বা সাহিত্যে মানবতার সুর বর্জিত, মনুষ্য সমাজের উন্নতির প্রসঙ্গ অবহেলিত, সেই শিষ্য মিথ্যা। কলম দ্বারা সাহিত্য স্রষ্টার যে নিরন্তর প্রচেষ্টা তা হওয়া উচিত পরিবর্তনকামী। লেখককুল শিল্পের মাধ্যমে পরিবর্তন আনবেন সমাজের, পাঠকের। সাহিত্য মূলত পাঠকের মুক্তির কথা ভেবেই রচিত হওয়া উচিত। সার্ত্রের সাহিত্য ভাবনায় পাঠকদের গুরুত্ব সর্বাধিক। যথার্থ পাঠক না পেলে পুরো সাহিত্য কর্মটাই মাটি হয়ে যাবে। ‘পুনরাবিষ্কার’ তত্ত্বে সার্ত্র বলেছেন যে, লেখকের রচিত সাহিত্য পাঠক পড়ে। পাঠকদের রুচিই সেই সাহিত্যকে গ্রহণ বা বর্জন করে থাকে। লেখকের মনোভাবনা যদি পাঠকের মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তবেই সেই সাহিত্যের সার্থকতা। লেখক ও পাঠকদের সংযুক্তিকরণ, মনন প্রক্রিয়াকেই সার্ত্র বলতে চেয়েছেন পুনরাবিষ্কার। অর্থাৎ—

লেখকের নির্দেশিত ধারা + পাঠকের গ্রহণীয়তা = পাঠকের পুনর্জন্ম

সাহিত্যের সার্থকতা বলতে তিনি পাঠকদের অনুভূতির মধ্যে শিল্পীর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন।

যাঁরা কলাকৈবল্যবাদী তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কারণ এঁরা সবসময়ই নিজেদের সুখ চান। কখনওই অন্যের জন্যে নিজেদের কলমকে ব্যবহার করেন না বলে সার্ত্রের অভিযোগ। তাই 'Art for Arts Sake' যাঁরা বলেন, তাঁদেরকে ধিক্কার দিয়ে সার্ত্রে বলেছেন—

> "For, the moment I feel that my freedom is indissolubly linked with that of all other men. It cannot be demanded of me that I use it to approve the enslavement of a part of these men. Thus ... the writer a free man addressing free man, has only one object–freedom."

সার্ত্রে বস্তুজগৎ ও তার মানবতাকেই মানব মুক্তি ও সৌন্দর্যের উৎস রূপে মনে করেছেন। মানুষের সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর যে সম্পর্ক তার স্বরূপ নির্ণয়ই সাহিত্য শিল্পের উদ্দেশ্য। একেই তিনি বলেছেন ‘পুনর্নির্মাণ তত্ত্ব’। অর্থাৎ অর্থহীন জগৎকে অর্থপূর্ণ করে তোলে শিল্প সাহিত্য। শিল্পীর শিল্পসাহিত্যে বাস্তব জগৎ পুনর্গঠিত হয়, তাতেই মুক্তি পায় মনুষ্যসমাজ।

সার্ত্রে লক্ষ করেছেন বাস্তবের সঙ্গে কাব্যকল্পনার কতটা তফাৎ। এটি নির্মূল করা তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সহাবস্থান হবে। কিন্তু বর্তমানে সেটির বড্ড অভাব। একের সঙ্গে অপরের সংঘর্ষ-আঘাত লেগেই আছে। কার্ল মার্কসকে বিরোধিতার মধ্যে তাঁর এই ব্যাপারটিই উঠে এসেছে। তিনি মনে করেছেন লেখকরা একাকী, নিঃসঙ্গ। কিন্তু তবুও ওঁদের কাজ করে যাওয়া উচিত, সমকালের মানুষকে সংগ্রাম ও মুক্তির পথ দেখাতে। বিশুদ্ধ সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, তাকে গুরুত্ব দেননি তিনি। বিশুদ্ধ সাহিত্যের সম্ভাষণ করার অর্থই হল জনসাধারণের দৈনন্দিন সমাজ জীবন থেকে সরে দাঁড়ানো। এটা এক ধরনের দায়িত্ব এড়ানো। এর বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন যে, এ সব করা মানেই পাঠকদের বিচারসত্তাকে নির্বাসন দেওয়া। তাই ন্যাচারালিস্ট, সুররিয়ালিস্ট লেখকদের তিনি কখনই সমর্থন করেননি।

যদি কোনও শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে অন্যায় বা অবিচারকে সমর্থন জানায় তবে কখনওই শিল্প যথার্থ রূপ পাবে না। এ ক্ষেত্রে পাঠক-লেখকের চুক্তি ভঙ্গ হবে। যদি কোনও সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষের উপর অত্যাচার ও নিগ্রো পীড়নকে সমর্থন করা হয় তবে তা সাধারণ মানুষের কাছে হবে অগ্রহণীয়। কোনও মতেই এই ধরনের সাহিত্য সার্থকতা লাভ করবে না। সমালোচকরা এটাকেই সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ বলেছেন। এটাকেই বলেছেন সমাজতান্ত্রিক দিক। যা স্বাভাবিক, যা বাস্তব সেটাই সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ। অর্থাৎ সাহিত্য শিল্পে অন্যায় অবিচারকে প্রশ্রয় না দেওয়া।

সাহিত্যকে সমাজের ব্যক্তিসত্তা বলে উত্থাপন করেছেন তিনি। এই ব্যক্তিসত্তার গতি অবিরাম। যা সমাজ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। ক্রমশই পরিবর্তন করছে। তাই সাহিত্যের দ্বারা জগৎকে বদলানোর কথা বলেছেন তিনি। শুধু ব্যাখ্যা বা তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই সার্ত্রের ভাবনাটা ছিল পরিবর্তনকামী। তবুও বের্গসঁ-এর গতিতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর পরিবর্তনটা এইখানে লক্ষণীয়। সার্ত্রের পরিবর্তনকামিতা ছিল ব্যক্তিচৈতন্য ও মানবকেন্দ্রিক, কিন্তু বের্গসঁ সম্পূর্ণ জগৎ জীবনের পরিবর্তনের উপরই জোর দিয়েছিলেন।

তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধেও এইসব নিয়ে আলোচনা আছে। যেমন "Writing for one's age" প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, শিল্পীকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বর্তমান অবস্থা টিকিয়ে রাখতে বা বদল করতে হবে। অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন যে, শিল্পীর কাজই হল দেশের বৃহত্তম জনগণের কাছে নিজেকে প্রসারিত করা। এটাই হবে পাঠক বা জনগণের কাছে লেখকের যথার্থ আনুকূল্য প্রকাশ। আবার তিনি 'The Psychology of Imagination' প্রবন্ধে কিন্তু পাঠকের কল্পনার জয়জয়কার করেছেন। পাঠক-লেখক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল এইরকম—

ক. The writer appeals to the reader's freedom to collaborate in the production of his work.

খ. None of them make a free decision.

উল্লেখ্য ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ (যেমন অভিনবগুপ্ত, কুন্তক প্রমুখ) এই সব কথা কিন্তু সার্ত্রর অনেক আগেই বলেছিলেন। শিল্পী ও পাঠকের সম্পর্ক মানবিক বলেই মানুষেরা শিল্পের মাধ্যমে আনন্দ পেয়ে থাকেন।

'What is Literature' বুঝতে গেলে সেই সময়ের ফরাসি রাজনীতিকে একটু জেনে নিতে হবে। কারণ সেইসময় কমিউনিস্টরা সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার কথা বলেছিলেন, আবার দায়বদ্ধদের গালাগালিও করেছেন। সাহিত্যে দায়বদ্ধতার প্রশ্নে সার্ত্রের বক্তব্য, শুধু লেখক নন, সমাজও এ ব্যাপারে দায়বদ্ধ। সৃজনশীল

সাহিত্যকে যেমন সমাজ স্বীকৃতি দেবে, তেমনি লেখকও তার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবে। সার্ত্রের সাহিত্যিক দায়বদ্ধতা আসলে 'সৃজনশীলতার অন্তর্নিহিত সত্য' (এম্বার্কি)। তবুও কিন্তু 'অংশগ্রহণ' ও 'দায়বদ্ধতা'র প্রশ্নে তাঁর স্ববিরোধটি লক্ষণীয়। তবে সার্ত্রের সমস্ত আলোচনা থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট, সেটা হল শিল্পীর স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। তিনি যেহেতু অস্তিত্ববাদী, তাই মানুষের স্বাধীনতাকে তিনি সবার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ব্যাপারে কখনওই তিনি আপত্তি করেননি। সার্ত্রের লেখা 'What is Literature' গ্রন্থে যে পাঁচটি পরিচ্ছেদ আছে তার সারমর্ম হিসাবে David Caute যা বলেছেন তা হল—

> "Here three modes of consciousness are proposed: 'Being-in-itself', 'Being-for-itself' and 'Being-for-others'."

আসলে ডেভিড তাঁর বক্তব্যের মধ্যে স্বাধীনতার কাছে 'Committment'-কেই সারমর্ম হিসাবে পেয়েছিলেন। কারণ এই গ্রন্থটা লেখার সময়ই সার্ত্র মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যেখানে সামাজিক মানুষের উপর শোষণ-নির্যাতন কিছুই ছিল না। এখন প্রশ্ন দর্শন, সমাজনীতি, নাটক, উপন্যাসের পাশাপাশি কেন তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল 'What is Literature' গ্রন্থটি লেখার। বিরুদ্ধ সমালোচকরা একাধিকবার সার্ত্রকে আক্রমণ করেছেন 'সাহিত্যের খুনী'—এই অপবাদে। ওঁদের মধ্যে কিন্তু সাহিত্য কি, সাহিত্যের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, স্বরূপ সম্পর্কে কেউই আলোকপাত করেননি। তারই জবাবে সার্ত্র লিখেছিলেন 'What is Literature' নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি সবিস্তারে সবকিছুর ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্প সাহিত্যের জগৎ মানুষের কাঙ্ক্ষিত জগৎ। সার্ত্রের সাহিত্যলোক-কল্পনার বাস্তব রূপ এখানে উল্লিখিত। তার শিল্প ভাবনা থেকে যে বিষয়টা উঠে এসেছে সেটা এইরকম:

ক. শুধুমাত্র তাত্ত্বিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে শিল্পের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর দায়বদ্ধ মন পাঠকের জীবনভাবনাকে পরিবর্তন করার পক্ষে ছিল। জীবন অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর পরিবর্তনকামী মনের প্রতিফলন। সমস্ত মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শিল্পরূপ দেওয়াই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ মানবজগৎকে মুক্তি দেওয়া।

খ. সার্ত্রের মতে, সাহিত্য শিল্পের সার্থকতা নির্ভর করে শিল্পী-শিল্পরসিকের যুগপৎ প্রচেষ্টার উপর। সাহিত্যের সৌন্দর্য কোনও কল্পলোক বা রোমান্সে ভেসে যাওয়া নয়, মানব হৃদয়ে অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সাহিত্যে অন্যায়কে সমর্থন না করা।

গ. সাহিত্য শিল্পের কাজ পাঠকদের স্বাধীনতা দেওয়া। একদল মানুষের উপর অন্যদল মানুষের অত্যাচারের ঘটনাকে লেখকের সমর্থন না করাই হল পাঠকদের স্বাধীনতা। সার্ত্রের মতে, পাঠকদের স্বাধীনতা দেওয়াই তার সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য।

সার্ত্রে বিংশ শতকের একজন বড় মাপের লেখক, গবেষক, দার্শনিক, শিল্পতত্ত্ববিদ। 'What is Literature' এবং 'The Words' গ্রন্থে তিনি সাহিত্য শিল্প সম্পর্কে যে সব বক্তব্য রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনব। কিন্তু যদি বিষয়টা একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে তাঁর বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে স্ববিরোধিতাও লক্ষণীয়। সেগুলি নিম্নরূপ:

এক. সার্ত্রের সাহিত্য ভাবনায় ইতিবাচকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও বর্তমান। সাহিত্যগত দিক থেকে অবক্ষয়িত সমাজ ভাবনার স্থিতাবস্থাকে মেনে না নেওয়া, এটা ইতিবাচক দিক। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র থেকে সাহিত্যের ধারাকে সরিয়ে ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য নেতিবাচক দিক।

দুই. ‘ইনভল্‌ভমেন্ট’ আর ‘কমিটমেন্ট’ বোঝাতেও তিনি স্ববিরোধী হয়েছেন। সামাজিক বিষয়ে শিল্পীর অংশগ্রহণ সচেতন বা ইতিবাচক হলে হয় দায়বদ্ধতা। এখানে কি সার্ত্রে ভেবেছিলেন জনগণ বা সমাজ নিষ্ক্রিয়? আসলে জনগণের ঐক্য ও সংগ্রাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সার্ত্রের ছিল না বলেই তিনি এটা বলতে পেরেছিলেন।

তিন. দায়বদ্ধতার প্রশ্নেও তো সার্ত্রে 'What is Literature' গ্রন্থে দুটি পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন—কেন লেখেন এবং কার জন্যে লেখেন? কিন্তু 'The Words' গ্রন্থে আগের বক্তব্য অনেকটাই খণ্ডন করেছেন।

চার. সার্ত্রে সামাজিক কাজের সঙ্গে সাহিত্য রচনাকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। তাই বলেছিলেন সাহিত্যের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ঐক্য ঘটিয়ে সমাজকে বদলাতে হবে। কিন্তু 'The Words' গ্রন্থে বলেছেন ভাষাই জনগণের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। এখানে প্রশ্ন কার ভাষা? বিষয়বস্তু কিরকম? দায়িত্ববোধই বা কোথায় গেল। সুতরাং এই আলোচনাও স্ববিরোধী।

পাঁচ. সার্ত্রের মতে সাহিত্য রচনা সামাজিক কাজ। অর্থাৎ 'the social function par excelence'. সাহিত্যের উদ্দেশ্য দুনিয়াকে বদলানো, এই কথা বলার মধ্যে দিয়ে সার্ত্রের দার্শনিক ভাবনা ও সাহিত্য ভাবনা একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু এটা ঠিক, সাহিত্য বা দর্শন কখনও সমাজকে বদলাতে পারে না। বদলানোর উপযোগী মানুষের মন তৈরি করতে পারে মাত্র।

ছয়. প্রথমে তিনি বলেছিলেন যে সাহিত্যিকরাই সমাজকে বদলে দেবে। পরে তাঁর মনে হয়েছিল কলমের দ্বারা কখনও সমাজকে বদলে দেওয়া যায় না। দায়বদ্ধতার করুণ সুর তাঁর লেখা 'The Words' গ্রন্থে পরিলক্ষিত—'I have given up the priesthood of Literature, but not the frock.' সার্ত্রে একসময় সংগ্রামের জন্য সাহিত্য ও দর্শনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শেষে তিনিই কিন্তু 'The Words' গ্রন্থে বলেছিলেন যে, তাঁর চিন্তায় দুনিয়া বদলে যাবে এটা ঠিক নয়। মোটেও ঠিক নয়।

৪১১.৪.১৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. 'The Words' অবলম্বনে জাঁ-পল-সার্ত্রের নন্দনভাবনা আলোকপাত করো।
২. 'What is Literature' গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলোর বর্ণনা দাও। এই গ্রন্থ অবলম্বনে সার্ত্রের শিল্পভাবনা বুঝিয়ে দাও।

৪১১.৪.১৪.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. নন্দনতত্ত্ব—ড. সুধীর কুমার নন্দী
২. পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা—নবেন্দু সেন সম্পাদিত
৩. সাহিত্য বিবেক—বিমল মুখোপাধ্যায়
৪. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
৫. নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য—সুখেন বিশ্বাস
৬. ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব—প্লেটো অ্যারিস্টটল : সুখেন বিশ্বাস

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক ১৫
কডওয়েল – ইল্যুশন অ্যান্ড রিয়ালিটি

বিন্যাসক্রম

৪১১.৪.১৫.১ ক্রিস্টোফার কডওয়েলের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

৪১১.৪.১৫.২ কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

৪১১.৪.১৫.৩ মানবজীবনে কবিতার প্রভাব

৪১১.৪.১৫.৪ আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য

৪১১.৪.১৫.৫ শিল্পকলা সংগঠন

৪১১.৪.১৫.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪১১.৪.১৫.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪১১.৪.১৫.১ ক্রিস্টোফার কডওয়েলের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

সাহিত্যের মরমী বোদ্ধা ও সমালোচক হিসাবে ক্রিস্টোফার কডওয়েলের নাম পৃথিবী খ্যাত। বিশ শতকের চল্লিশ থেকে ষাটের দশকে কলকাতায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে কডওয়েল চর্চা হত ভীষণভাবে। মার্কসবাদী ভাবুক ও চিন্তাবিদ হিসাবে কডওয়েল সকলের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিলেন। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির জগৎকে তুলে ধরেছিলেন সকলের সামনে।

লন্ডন শহরের কাছে এক মফঃস্বল শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারে কডওয়েলের বড় হয়ে ওঠা। আসল নাম ছিল ক্রিস্টোফার সেন্ট জন স্প্রিগ। স্কুলের পড়া শেষ না করেই মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি চাকরি নেন 'ইয়র্কশায়ার অবজার্ভার' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে। তারপর লন্ডনে ফিরে এসে প্রকাশনা সংস্থায় যোগ দেন। এরোনটিক্স সম্পর্কিত বই, গোয়েন্দা কাহিনি, ছোটগল্প, কবিতা—এমনকি একখানি উপন্যাসও লিখেছেন কডওয়েল। মার্কস-এঙ্গেলস-এর রচনা পড়ে তিনি সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির পপুলার শাখায় যোগদান করেন। সক্রিয় রাজনীতির সূত্রে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান। এমনকি অ্যাম্বুলেন্স চালিয়ে ফ্রান্স থেকে চলে গেছেন স্পেনে। Illusion and Reality, Studies in a Dying Culture, The Crisis of Physics, Further Studies in Dying Culture ইত্যাদি বই লিখে সাড়া ফেলেন বুদ্ধিজীবী মহলে। একসময় ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। এবং শত্রু-পক্ষের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

আমাদের দেশে সমালোচক মহলে কডওয়েল অত্যন্ত পরিচিত ও আলোচিত হলেও ইউরোপে তাকে

নিয়ে এমন কিছু আলোচনা হয়নি। রেমন্ড উইলিয়াম ও আরও দু-এক জনের লেখায় কডওয়েল প্রসঙ্গ সামান্য উল্লিখিত।

কডওয়েল শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাস করতেন। সাম্যবাদ বিশ্বাস করতেন। সাম্যবাদ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা আছে। তাঁর মতে, আদর্শ সমাজ কখনওই ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করে না, বরঞ্চ ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করে। বুর্জোয়া সমাজ যা ব্যক্তির আত্মোন্মচনে বাধার সৃষ্টি করে, কণ্ঠরোধ করে প্রতি পদে, সেই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে আদর্শ সমাজের অবস্থান। এই আদর্শ সমাজ গঠনই সাম্যবাদের লক্ষ্য। এখানেই উল্লেখ্য, সমাজ বিবর্তনে ইতিহাসের ধারাটি। এই ইতিহাস সম্পর্কে কডওয়েলের ধারণা খুবই পরিষ্কার। ইতিহাস হল নিরবচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলন ও ঘটনাপ্রবাহ যা বুর্জোয়াতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিবিকাশের অন্তরায়গুলিকে বারবার উচ্ছেদ করতে চায়। আপাতদৃষ্টিতে কডওয়েলের ভাবনাকে রক্ষণশীল মার্কসবাদ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সামাজিক বিধান প্রভৃতি সম্পর্কে কডওয়েলের বোধ এবং বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ।

মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকে বিচার করেছেন তিনি। সম্পূর্ণ গোঁড়ামিমুক্ত, স্পষ্টবাদী ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ী কডওয়েলের বক্তব্যের সাথে সকলে একমত না হলেও কেউ তাঁকে অস্বীকার করতে পারেন না। কডওয়েল মনে করতেন বুর্জোয়া যুগের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার নিখুঁত চিত্রকর ছিলেন শেকস্‌পীয়র। পরবর্তী সময়ে অগাস্টান যুগের লেখকদের স্বকীয়তা এবং তারও পরে রোমান্টিক যুগের লেখকদের বাস্তব জীবন-বিমুখতা কোনও কিছুই কডওয়েলের দৃষ্টি এড়ায়নি। আধুনিক লেখকদের মধ্যে এক বিষণ্ণতাবোধ, বিপন্নতাবোধ, একাকিত্বের সুর লক্ষ করেছিলেন তিনি।

কডওয়েলের মতে, টি. ই. লরেন্স সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁর কোনো ইতিবাচক ভাবনা ও আস্থা ছিল না। যদিও কডওয়েল লরেন্স-এর ব্যক্তিগত সাহসিকতাব্যঞ্জক শক্তিকে সমর্থন করে গেছেন। বুর্জোয়া সমাজের গরিমা ও গ্লানির বিরুদ্ধে ডি. এইচ. লরেন্স-এর বলিষ্ঠ বক্তব্যকে প্রশংসা করেছেন কডওয়েল। কিন্তু ডি. এইচ. লরেন্সের সব বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেননি। লরেন্সের বিশ্বাস—'মানুষ তার সামাজিক সম্পর্কের ভিতর দিয়ে নয়, তা থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে যায় ব্যক্তি মুক্তির পথে' ('That man is free not though but in spite of his social relation')। কিন্তু পাশাপাশি কডওয়েলের ধারণায় মানুষ ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এগোয়। সে কারণে সামাজিক সম্পর্কগুলি অবশ্যই এমনভাবে বদলাতে হবে যার ফলে মানুষ কেবল বিজ্ঞতর হয়ে ওঠে না। সেই সঙ্গে আরও বেশি ইমোশনে পূর্ণ হয়ে ওঠে ('Social relation must be changed so that love returns to earth and man is not only wiser but more full of emotion.')। কডওয়েল মনে করেন মানবসভ্যতার ধারায় প্রতিটি সমাজব্যবস্থা তার পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থার চেয়ে বেশি স্বাধীনতা পেয়েছে এবং তার জন্য নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। বিবর্তনের ধারায় মানুষ আত্মবিকাশের জন্য তুলনায় বেশি সুযোগ পেয়েছে।

কডওয়েল সম্পর্কে ইওরোপীয়, বিশেষত ইংরেজ মার্কসবাদী আলোচক মহলে কিছু পরস্পরবিরোধী ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন—তিনি মার্কসবাদী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিমানুষের ইমোশনে পূর্ণ আস্থা রাখেন। এটা অনেকেই ঠিকমতো মিলিয়ে নিতে চান না। তবুও ব্যক্তিমানুষের সার্বিক উৎকার্ষকে তিনি শ্রদ্ধা করেন এবং সর্বোত্তম বিকাশে বিশ্বাস করেন বলেই কডওয়েল তাঁর চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং মানবতাবাদী। আবার কেউ কেউ বলেন কডওয়েল নানা তত্ত্ব ও ভাবের আলোচনা যতটা করেছেন, ইংরেজি সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে

ততটা বিস্তৃত কিছু লেখেননি। এ প্রসঙ্গে বলা চলে কডওয়েল যা ভেবেছেন, যা লিখেছেন তাতেই তাঁর ভাবনা রাজ্যের মৌলিকতা ধরা পড়েছে।

কডওয়েল মানুষের সমাজে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শিল্পীর মধ্যে শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াকেও যথাযথ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরাট কোনও পার্থক্য তো নয়ই, বরং পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। শিল্পী আর বিজ্ঞানী দুটি পৃথক জগতের অধিবাসী হলেও তাদের ব্রত কিন্তু একই। শিল্পী তার হৃদয়রাজ্যের গভীরে নিত্য অনুসন্ধান করেন অজ্ঞাত সৌন্দর্য আর ইমোশনকে। ঐতিহ্য আর অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে গড়ে তোলেন নব নব সৃষ্টি। বিজ্ঞানীও নতুন নতুন আবিষ্কারে ব্রতী হন বহিঃবাস্তবতার দাবি মেনে। শিল্পীর আবিষ্কার মানুষের অন্তরেন্দ্রিয়ে সাড়া জাগায়। আর বিজ্ঞানীর আবিষ্কার মানুষের বাস্তব বেঁচে থাকাকে মসৃণ ও সুন্দর করে।

মার্কসবাদী চিন্তক হওয়া সত্ত্বেও কডওয়েল অনেক ক্ষেত্রেই মার্কসীয় তত্ত্ব ও ধারণার পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই কডওয়েল ইওরোপে এবং আমাদের দেশেও অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। তিনি তাঁর 'Illusion and Reality' গ্রন্থের ১২টি অধ্যায়ে আধুনিক কাব্যের নানা মনোজ্ঞ আলোচনার অবতারণা করেছেন—

১. The birth of Poetry.
২. The death of mythology.
৩. The development of modern Poetry.
৪. English Poets: (i) Primutive Accumulation.
৫. English Poets: (ii) The Industrial Revolution.
৬. English Poets: (iii) Decline of Capitalism.
৭. The Characteristics of Poetry.
৮. The World and the 'I'.
৯. The Psyche and Shantary.
১০. Poetry's Dream—Work.
১১. The Organisation of the Arts.
১২. The future of Poetry.

৪১১.৪.১৫.২ কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথম দিকে কিছু ছোটগল্প, উপন্যাস রচনা করলেও তাঁর পরিচিতি নন্দনতত্ত্ববিদ হিসাবেই। তিনি মূলত মার্কসীয় চিন্তাভাবনায় নন্দনতত্ত্বকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। পৃথিবীর যে কয়জন খ্যাতনামা মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী সাহিত্য সমালোচকের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য। মূলত যে দুটি বই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কাছে ভীষণভাবে গ্রহণীয়, তা হল— ১। Illusion of Reality ২। Studies in a dying culture। এ দুটি বই থেকেই জানা যায় কবিতার উৎস ও মানব জীবনে তার প্রভাব।

কডওয়েল কবিতা বলতে আধুনিক কবিতাকেই বুঝিয়েছেন। কবিতার শরীরে জন্মলগ্ন থেকেই তিনি লক্ষ করেছেন ঐতিহাসিক বিবর্তনের ছাপ। তিনি মনে করেন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গেই কবিতার জন্ম ও বিকাশ। কডওয়েলের মতে মানুষের আদিমতম নান্দনিক ক্রিয়াকর্মই হল কবিতা। সভ্যতার আদি লগ্নে সাহিত্য বলতে কবিতাকেই বুঝানো হত। উল্লেখ্য—সেই সময় কাব্য সাহিত্যে ইতিহাসে, ধর্ম, ইন্দ্রজাল, আইন সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুধু ভারতীয় সভ্যতাই নয়, পৃথিবীর যে-কোনও উন্নত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি রচিত হয়েছিল ছন্দ, কবিতায়।

কাব্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সেই আদিকাল থেকেই। আদিম মানুষেরাও অনুন্নত কাব্য সাধনায় জীবনকে যুক্ত করেছিল। আদিম মানুষেরা নিজেদের অনুভূতিকে বোঝাতে গিয়ে নানান অঙ্গভঙ্গি, লাফ-ঝাঁপ, শব্দ, ছবি এবং নানান উপকরণের আশ্রয় নিত। আর এ থেকেই শিল্প সৃষ্টি। শিল্প সৃষ্টির তিনটি মূল মাধ্যম হল—(১) নৃত্য (২) সংগীত (৩) কাব্য।

কডওয়েলের কবিতা ঊনবিংশ বিংশ শতকের আধুনিক কবিতা বলে পরিচিত, যার সূত্রপাত হয়েছিল পাশ্চাত্যে, উৎসধারায় কাব্যের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অর্থনীতি ও উৎপাদন (Economics and Production)। প্রতিদিনের জীবনের ক্রিয়াকর্ম চালাতে জীবিকার ভাবনা থেকে আসে অর্থনীতি, আর তার থেকেই আসে উৎপাদন ব্যবস্থা। প্রাচীন সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর। তাই অর্থনীতির কাঠামো কৃষিনির্ভর করেই গড়ে ওঠে। কৃষির উন্নতির সাথে সাথেই পাহাড়ের গায়ে গাছের পাতা ও শিলাফলকে শুরু হল পদ্য লেখা, যদিও কবিতা তখনও কবিতা শিল্পে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তারই হাত ধরে সমাজজীবনে রাজনীতি, ইতিহাস, যুদ্ধনীতি, আশা-ভালবাসার কথা লেখায় প্রতিফলিত হয়। আর এভাবেই আদিম যুগে কবিতার জন্ম। কডওয়েল পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর বিকাশ বোঝাতে গিয়ে জৈবিক বিবর্তনের কথা বলেছেন, কিন্তু মানবজীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুঝিয়েছেন। আর এর ফলেই সমাজব্যবস্থা, যন্ত্র-প্রযুক্তি, সংস্কৃতির উন্নতি ঘটেছে। যদিও এর মধ্যে সংস্কৃতি তথা কবিতাকে অর্থনৈতিক সমাজ গঠন থেকে আলাদা করা যায় না। আমরা যদি শ্রম-বিভাজনের দিকে দৃষ্টি দিই, তবে দেখায়—পৃথিবীতে শ্রম-বিভাজন যত জটিল হয়েছে, কবিতাও তত বিকশিত হয়েছে। বিকশিত মান (Collective mind)। সমাজসচেতনতা (Social Consciousness), সামাজিক শ্রম (Social labour)-এর থেকেই শ্রম বিভাজন ও কবিতার জন্ম।

আগে আদিম মানুষের প্রবৃত্তি ছিল জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ বা বহিঃশত্রু থেকে নিজেকে রক্ষা করা। এটাই ছিল তাদের সামাজিক কাজ যদিও এর থেকে কোনও কবিতার জন্ম হয়নি। পরবর্তীকালে এই প্রবৃত্তি রূপান্তরিত হয়ে অপ্রত্যক্ষ অথচ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আর এই প্রয়োজন বোধ থেকেই জন্ম নেয় কবিতার। সুতরাং এই প্রবৃত্তিই রূপান্তর ঘটে কৃষিকাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থায়। এতদিন যা ছিল গোষ্ঠীর উৎস, এখন তা কবিতার উৎসে পরিণত হল। মানুষের উৎপাদনে আগ্রহ, তার থেকেই সুর, তাল, ছন্দ প্রভৃতির জন্ম। আর এই প্রবৃত্তি জাতীয় শক্তি রূপ নিল কবিতায়।

কডওয়েলের মতে আদি যুগের কবিতা বিশুদ্ধ কবিতা নয়। এই কবিতাকে তিনি বলেছেন সাধারণ ভাষার এক উন্নততর প্রকাশ ভঙ্গি। এতে ছন্দ-লয়, অনুপ্রাস, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি উপাদান ব্যবহার সাধারণ ভাষা ভঙ্গি থেকে আলাদা করেছে। আর পুনরুক্তি, রূপক, বিরোধাভাস, এই সব আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের জন্যেই ছন্দ রচনার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন—ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য, কমেডি, ট্র্যাজেডি ইত্যাদি। মানুষের সাহিত্য ক্রমবিবর্তনের ফলে এবং শিল্পান্দোলনের ফলে সচেতনতার সাথে সাথে কবিতা শাখা সাহিত্য থেকে আলাদা হয়েছে।

৪১১.৪.১৫.৩ মানবজীবনে কবিতার প্রভাব

- মানুষের শ্রমেই কবিতার জন্ম শ্রমকেই সহজ, সরল, আনন্দদায়ক করে তোলার পিছনে কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাচীনকালে কৃষিকাজ করার সময় আদিম মানুষেরা ছন্দোবদ্ধ সুরে কথা বলত, তার ফলে তার মনের মধ্যে যে কল্পনার জগৎ সৃষ্টি হত তাতে শ্রম অনেক লাঘব হত। কবিতায় বাস্তব জগতের শ্রম থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তাতে মানুষ আনন্দ পেয়েছে এবং কল্পনার জগৎ মানুষের কাছে অধিকতর বাস্তব বলে মনে হয়েছে।
- বর্তমানে শ্রমবিভাজন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কাব্য মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে কডওয়েল মনে করেছিলেন। সেক্ষেত্রে কবিতা যেন অবকাশের সৃষ্টি। কবি যেন এক নিঃসঙ্গ একক ব্যক্তি। কডওয়েলের মতে শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত না হওয়া অবধি এই সমস্যার সমাধান নেই। এতে শিল্পের অন্তর্নিহিত সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

  (ক) নিঃসঙ্গ কবি সমষ্টির মনে অনুভূতি আনার জন্যে এই কবিতা লেখেন।

  (খ) সমষ্টি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কবির কবিতা রচনা মূলত মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছানোর জন্যে।
- যুগ যুগ ধরে প্রেম, বসন্ত, সূর্যাস্ত, পাখির গান, গোলাপের মাধুর্য মানবজাতি দ্বারা অনুভূত, আস্বাদিত। উল্লেখ্য ওইগুলিই মানুষের মনে অনুভবের জগৎ তৈরি করেছে। তাই মানুষের কাছে কবিতার জগৎ সামাজিক অনুভবের জগৎ, মানুষের জীবন অভিজ্ঞতা ও হৃদয়ের জগৎ। তাই বলা যায় কবিতার শরীরের ক্রমবর্ধমান জটিলতা সামাজিক জীবনের বিস্তৃতিকেই প্রতিফলিত করেছে।
- কবিতা মানুষকে এমন এক কাল্পনিক জগতে স্থাপন করে যা তার বাস্তব জগৎ (Present Reality) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই কাল্পনিক জগতের বাস্তবতা এখনও মানুষের বোধগম্য হয়নি। এই বোধগম্যতার জন্যে কেবল কবিতারই প্রয়োজন। কবিতাই সেই জগতের পূর্ণরূপকে আগাম দেখিয়ে দিতে পারে।
- কবিতা শুধু তার কথাই বলে আমরা এখনও যার গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ নিতে পারিনি। যদি কাব্যিক চিকিৎসা (Poetic treatment) না থাকত তবে কল্পনায়ককে বাস্তবে রূপান্তরিত করা যেত না। কবিতা আছে বলেই আমরা মাঝেমধ্যে কল্পনার জগতে ভেসে গিয়ে ক্ষণিকের অবকাশ পাই।

  মানবসভ্যতার যত অগ্রগতি হচ্ছে ততই মানুষ জটিল হচ্ছে। এই জটিলতা কাব্যের উপরেও প্রভাব ফেলেছে। ফলে পাঁচালীর ঢঙে সহজ, সরল ছন্দের জায়গা নিয়েছে গদ্য ছন্দ। কাব্যে এসেছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, কাব্য এক নতুন সত্যের জগৎকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে। তাই এখন কবিতার সত্য, আর বিমূর্ত সত্য নয়। কডওয়েলের মতে কবিতার সত্য দ্রুত পরিবর্তনশীল মানবমনের সামাজিক আবেগের মতো।

৪১১.৪.১৫.৪ আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য

(ক) Poetry is Rhythmic (কাব্য ছন্দময়) : কাব্য কবিতা যে ভাষায় লেখা হোক না কেন, তার

একটা নিজস্ব ছন্দ আছে। কবিতা লেখার সময় সে ভাষা থেকে একটা নতুন ছন্দ তৈরি করা হয়। কবিতা কলাবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি ছন্দে লেখা হয়ে থাকে। মানব জীবনের সাধারণ ভাষা থেকে কবিতার ছন্দ নেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের কথ্য ভাষার যে ছন্দ, আর যে ভাষায় লেখা কবিতা ছন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা হলে বাংলা কবিতার ছন্দ আলাদা হয়। আমাদের মাতৃভাষা যেহেতু বাংলা সেহেতু এই ছন্দের প্রতি আকর্ষণও বেশি আর এটাই আমাদের জৈবিক প্রবৃত্তি। এই জৈবিক প্রবৃত্তিই জন্মের পর থেকেই ছন্দের সাথে একত্রিত হয়ে যায়। কডওয়েলের মতে এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কবিতার ছন্দের সঙ্গে মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির সম্পর্ক আছে, কিন্তু জৈবিক প্রবৃত্তির সাথে ছন্দের শিক্ষাগত দিকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মোটের উপর বলা যায় কাব্য-ছন্দের সাথে মানুষের জৈবিক ছন্দের একটা বিরোধ আছে। অর্থাৎ কবিতার ছন্দ সম্পূর্ণ আলাদা, তবুও মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তি ও কবিতার ছন্দ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

(খ) Poetry is difficult to translate (কবিতা অনুবাদ করা কঠিন) : কডওয়েলের মতে কবিতা লেখার সময় একজন কবির মনে যে বোধ, অনুভূতি ও দার্শনিকতার জাগরণ ঘটে, তাকে সঠিক অনুবাদ করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন অনুবাদকের আগে কবির দেশ, কালকে অনুভব করতে হবে। বুঝতে হবে কবির মানসিক অবস্থার কথা। যদিও বাংলা ভাষায় অনেক কবিতা অনূদিত হচ্ছে, কিন্তু আসল ভাবটা কোনো কবি যথার্থ অনুবাদ করতে পারেন না। যেমন বলা যেতে পারে—'marvellous' বা ‘অনুপম’ কথাটি। এই শব্দটির গভীরতা অনেক। কেউ আকাশের দিকে, কেউ পাহাড়ের দিকে, কেউ সাগরের দিকে তাকিয়ে অনুপম কথাটি বলেন। কিন্তু অনুবাদক জানতে পারেন না কী দেখে কবি ‘অনুপম’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের ব্যাপারটা উপন্যাস, মহাকাব্য, গল্প, নাটকে লক্ষ করা যায়। কারণ তার বিস্তার অনেক বড়। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তা ঘটে না।

(গ) Poetry is Non-Symbolic (কাব্য অপ্রতীকধর্মী) : আমরা সাধারণত কবিতাকে প্রতীকধর্মী বলি। কিন্তু কডওয়েলের মতে কবিতা অপ্রতীকধর্মী। কারণ যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে কবিতায়—আবেগ অনুভূতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই তো কবিতা যুক্তিনিরপেক্ষ। তিনি মনে করেন চিন্তা দ্বারা গণিতের ভাষা বোঝানো যায় কিন্তু কবিতাকে নয়। কারণ গণিত আর কবিতা এক জিনিস নয়। গণিতের ভাষা Symbolic, Mathemetics is Symbolic, But poetry is not symbolic, কবিতায় আবেগ অনুভূতি থাকে। তাই তো একজন আবেগ-অনুভূতিকে অনুবাদ করতে পারে না। একইভাবে আমরা ভাবের জিনিসকে প্রতীকে ধরতে পারি না। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় ঘ্রাণ, শিশির, নক্ষত্রের যে অর্থ ব্যবহার করেছেন, অন কেউ তা অনুবাদ করতে পারে না। এক্ষেত্রে বলা যায় অর্থগত অনুবাদ হলেও ভাবগত অনুবাদ সম্ভব নয়। প্রতীককেই একমাত্র সম্পূর্ণভাবে অনুবাদ করা যায়। কবিরা বাস্তব জগৎ থেকে বিষয় গ্রহণ করে ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। কবিতা হল কোনও কবির প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের আবেগজনিত প্রতিফলন।

(ঘ) Poetry is Concrete (কবিতা মূর্ত) : আমরা কবিতাকে মূর্ত শিল্পরূপে বিচার করব। কারণ কবির আমিত্ববোধ কবিতায় বিশেষের বাস্তব জগৎকে মিলিয়ে দেয়। Abstract-কে concrete করে। যেমন—"My love is like a red, red rose." এটাই কবির নিজস্ব অনুভূতি। অন্য কেউ এটা লিখতে পারে কি?

"My love is like a white, white rose".

ব্যক্তিবিশেষে আবেগ, অনুভূতি ভিন্ন হয়। তাই পাঠকের কাছেও তা ভিন্নভাবে ধরা দেয়। বিশেষ কালের মুহূর্তের অনুভূতিকে কবি প্রকাশ করেন বলে কবিতা মূর্ত। আর কবিতায় আমিত্বের প্রকাশ ঘটে বলে কবিতা সর্বজনীন।

(ঙ) Poetry is characterised by condensed affects (কবিতা ঘনীভূত আবেগ উদ্দীপক) : আবেগ অনুভূতি থাকলেই কবিতা সৃষ্ট হয় না। সাধারণ আবেগ কখনোই কবিতা সৃষ্টি করতে পারে না। কারও বন্ধুর বিয়োগ, ব্যথাবেদনা, সুখ-দুঃখ যেভাবে অনুভূত হয়, তা অন্য কারও থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং তা কবিতা হতে পারে না। অর্থাৎ কবিতা পাঠ করার পর শ্রোতার মনে দাগ কাটলেই কবিতার আসল সার্থকতা, তখনই কবিতা পাঠককে সর্বজনীন-বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ করে। তাই তো আমরা এদেশে বসেই Shakespeare-এর কবিতার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারি। কারণ তাঁর অনুভূতি আমাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করে।

(চ) Poetry is composed of Words (কবিতা শব্দ দিয়ে গঠিত) : আমরা জানি আবেগকে প্রকাশ করতে হলে প্রকৃতি দরকার। নান্দনিকতা, সৌন্দর্য, আবেগ কখনও আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করা যায় না। ভাষা বা শব্দ দিয়েই পড়তে হয়। সেখানে শৈলী গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয়। কাব্যের ক্ষেত্রে কবিরা বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারাই মনের ভাবগভীরতা প্রকাশ করেন।

(ছ) Poetry is Irrational (কবিতা যুক্তি নিরপেক্ষ) : যুক্তি, বুদ্ধি দ্বারা কখনোই কবিতার ভাবকে বোঝানো যায় না। বৈজ্ঞানিক বা সমালোচকের মতো কবি কখনও যুক্তিবাদী হতে পারেন না। কডওয়েলের মতে যুক্তি দিয়ে কখনোই কবিতার সার্থকতা খোঁজা হয় না। সৌন্দর্য না থাকলে কবিতায় নান্দনিকতা ফুটে ওঠে না, তার ফলে মানুষ বড় জগতে, মূলত উপলব্ধির জগতে পৌঁছয়।

পরিশেষে বলা যায় কডওয়েল বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'Illusion and Reality'-তে আধুনিক কবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে কাব্য কবিতা হল ছন্দবদ্ধ, অনুবাদের অযোগ্য, যুক্তিনিরপেক্ষ, অপ্রতীকধর্মী এবং ঘনীভূত নান্দনিক আবেগ উদ্দীপক দ্বারা প্রাপ্ত।

৪১১.৪.১৫.৫ শিল্পকলা সংগঠন

শব্দের সাহায্যে শিল্পসম্মত সংগঠন তৈরি করাকে বলে গল্প। গল্পে অপেক্ষাকৃত বাস্তবহীন চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, মূলত কৌশলগত পার্থক্যে। পাঠক কবির সঙ্গে একাসনে মিশে যান। উপন্যাসের বাস্তবের এক নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা দেখা যায়। ঔপন্যাসিক ও পাঠক তার বাইরে নয়। কাব্যের পাঠকের মতো উপন্যাসের পাঠকরা তখনই নিজেকে একাত্ম করতে পারেন না। কবিতার পাঠক আবেগকে অনুভব করে। কিন্তু গল্পের পাঠক তার মধ্যে বাস করে না। কবিতা ও গল্পে আবেগ উদ্দীপকগত ধ্বনির ব্যবহার থাকে। সংগীতের কেন্দ্রে ধ্বনিগুলি উল্লেখ করে না। সেটা নিজেরই বোঝার বিষয়। কবিতায় আবেগ ভাষার গঠনের দ্বারা সংগঠিত হয়। এই গঠন নিজের অর্থের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বহির্বাস্তবের উপর নির্ভর করে। সংগীতের গঠন স্বয়ম্ভর। যেট তর্কশাস্ত্রসম্মত বহির্বাস্তবের উল্লেখ করে না। বাইরে থেকে তর্কশাস্ত্র দেখা যায় স্বরাগম ও স্বরসংগতির কঠোরতা দেখা যায়। এই মানেই সংগীত কবিতা, উপন্যাস ও ধ্বনির তিন ধরনের ভূমিকা দেখা যায়। তর্কশাস্ত্রে সংগীতের নিয়মগুলি ছন্দযুক্তসম্মত হলেও সামাজিক স্বীকৃত ছন্দ বিষয়গত ও কাব্যের দ্বারা বিকৃত হয়। কিন্তু উপন্যাসে তা হয় না, উপন্যাসে বাস্তবের স্থানে কালকে বিবৃত করে। স্থান কালের সীমার মধ্যেই সংগীতের জগৎ অস্তিত্বশীল কাল হল গুণের উদ্ভব। অর্থাৎ কালকে স্থানের পরিভাষায় বর্ণনা করে।

মানুষ যখন ছন্দ উদ্ভাবন করেছিল, তখন সেটা ছিল তার নবজাত আত্মসচেতনার প্রকাশ। ছন্দ হল মানুষের অনুভূতি। Melody মানবের অনুভূতি। হারমোনি হল বস্তু মানুষের অনুভূতি। সংগীতে ছন্দ শরীর

বৃত্তিগত এবং বিষয়কে নিজের ছক অনুযায়ী নিজে শরীরের দিকে টেনে আনে। সংগীতের জগৎ যেহেতু যুক্তিভিত্তিক গঠন। পর্যায় তেমনি বহিঃবাস্তব ও অভ্যন্তরীণ বাস্তব তথ্য ও অনুভূতি উভয়কেই প্রকাশ করে। ভাষা কাজ করে প্রতীকের সাহায্যে। সংগীতে যুক্তিভিত্তিক ম্যানিফোল্ডটি হল সংগীতের রূপ বা গঠনগত উপাদান। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন ব্যাকরণগত বা বাক্য গঠন রীতি উপাদানটির অন্তর্ভুক্ত হল স্বরে বস্তুত্ব। প্রথা, নিয়ম, স্বরগ্রাম, অনুমোদিত কর্ড ও সাংগীতিক তত্ত্বের উপকরণগত সীমাবদ্ধতা। এটি হল সংগীতের নৈর্ব্যক্তিক ও বাহ্যিক উপাদান। যুক্তিভিত্তিক ম্যানিফোল্ডের মধ্যে মানুষকে বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশ করতে পারে না। শিল্প সংগীত কার্য ও উপন্যাস সেটাকেই আবেগ উদ্দীপক ম্যানিফোল্ডের মধ্যে প্রকাশ পায়। মোটের উপর বলা যায়—

(ক) বিষয়গত উৎস থেকে আহরিত পর্যায়ভিত্তিক আবেগোদ্দীপক বিন্যাসকে সংগীতে ব্যবহার করে। অভ্যন্তরীণ বাস্তবের সঙ্গে যাতে মিল পাওয়া যায়, এমনভাবে বিবৃত করা হয়।

(খ) বিষয়ীগত উৎস থেকে পর্যায়ভিত্তিক স্থানিক বিন্যাসকে গণিত ব্যবহার করে। এই পর্যায়ভিত্তিক বৃত্তিগুলিকে বিবৃত করা হয়, যাতে বহিঃবাস্তবের সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়।

(গ) কাব্যে আবেগোদ্দীপকগত ছন্দ হল যুক্তি—স্থানিক, আবেগোদ্দীপক কালিক নয়, গণিতের মূলগত ছন্দের সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য পরিবেশের লয়ের বিপরীতে শরীরের লয়কে এটি প্রদান করে তোলে।

(ঘ) সংগীত ভাষা, গণিত এগুলি সবই ধ্বনি মাত্র। তা সত্ত্বেও তারা সমগ্র বিশ্বকে প্রতিফলিত করতে এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তব ও বহিঃবাস্তবের সক্রিয় সম্পর্কে প্রকাশ করতে সক্ষম।

ধ্বনি প্রতীক শিল্পগুলি ছাড়াও রয়েছে দৃশ্য বা নমনীয় শিল্পগুলি, যেমন চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য। আমরা যখন বাইরের জগতের একটা দৃশ্য গড়ে তুলি, বা একটি অঙ্কিত নকশা বা অঙ্কন করি তখন গোটা বহিঃবাস্তব জগৎই প্রতীক নয়। সেগুলি কেবলমাত্র প্রতীক এবং সেই কারণেই তা প্রথাসম্মত।

অঙ্কন ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বাইরের বাস্তব জগতের অংশগুলিকে একটি নকল জগতে গড়ে তোলা হল। যেমন একটা সুন্দর ছবির কথা বলা যায়। ছবিটি বাইরের জগতের থেকে আঁকা হয়। তার সঙ্গে চিত্রের একটা মিল থাকে। সেটা নিজের ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

চিত্রকল্প ভাস্কর্যের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য টানা প্রয়োজন। কারণ, সংগীত, কাব্য ও গল্পের মতো হয় না, শিল্পের ক্ষেত্রে মাত্রা, কালও অবর্তমান ভিন্ন নিকাশের, মিকেলাঞ্জেলোয় ও ক্রোনভাচ্ প্রমুখ শিল্পীর আঁকা ছবি বাইরের জগৎ থেকে বেশি বর্তমান। যেমন কোনো গল্পে তা কবিতা থেকে বেশি বর্তমান। বিশেষ করে বিষয়ভিত্তির উপর মহত্ত্ব নির্ভর করে। সংগীত বা কাব্যের ক্ষেত্রে চিত্রকলাতেও বাস্তবের সমাধান ও গভীরতা বোঝা যায়। যে নমনীয় শিল্পগুলি প্রতিনিধিত্বমূলক, সেগুলি কাব্য ও গণিতের সগোত্র বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলিরও সর্বজনিক শিক্ষাগুলির সমগোত্র, এক সর্বজনীন তীব্র আবেগ ও অন্তর্দৃষ্টিকে প্রকাশ করে উপজাতীয়-র মাধ্যম, কাব্য ও চিত্রকলা ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের মাধ্যম। চিত্রকল্প, কাব্য ও সুর কিছুই এর মধ্যে এইরূপ নাট্য করা যায়।

প্রথম আবির্ভাবের সময় চিত্রকলা ছিল প্রকৃতির মধ্যে আবেগের সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা। তাই প্রাচীন প্রস্তর যুগে শিল্পে প্রথম আঁকা প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর চিত্রে জীবন সাদৃশ্য দেখতে পাই। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণ ছিল—প্রকৃতি বঙ্গে গণ ও উপজাতি চিত্রশিল্পে প্রথম উত্তরণ ঘটান। আর সর্বাধিক প্রকৃতিবাদী চিত্রশিল্প হল বুর্জোয়া শিল্প। বুর্জোয়া সমাজে অধিকার ক্ষমতা ও উৎপাদন ঘটে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে। তবে প্রকৃতিবাদকে বাস্তববাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আসলে বুর্জোয়া ফ্লেমিস চিত্রকলায় বাস্তববাদ চিত্রকলা কাব্যের

উপন্যাসের মতো নয়। প্রকৃতিবাদ বাস্তব জগৎ চিহ্নিত করবে, প্রকৃতিবাদের বাস্তব জগতে ঘটে না। বুর্জোয়া সমাজ অহং থেকে এক স্বপ্নের জগতে মুক্ত হয়। তা একান্ত ব্যক্তিগত অচেতনতা। এটাই হল সুররিয়ালিজম। যেখানে বাস্তবের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়, এই বাস্তব যদিও কাল্পনিক, অর্থাৎ তা হল এক ব্যক্তিগত জগতে পদার্পণ।

নমনীয় শিল্পগুলি স্থির। সময়ের সাথে সাথে দৃশ্যগত শিল্প নৃত্যে, নাটকে এবং চলচ্চিত্রে দেখা যায়। নৃত্য হল প্রাচীন শিল্প। কাব্যের মতো চিত্রকলার গুণও বর্তমান। দৃশ্যগত শিল্প সময়ের মধ্যে চলে। নৃত্যের মধ্যে প্রেম নিবেদন, মঞ্চের উপর হত্যা, চলচ্চিত্র দাঙ্গা সংগঠিত হয়। শিল্পের বাস্তব সংগঠনের মধ্যে বিশেষত অভিব্যক্তিধর্মী, দৃশ্যধর্মী, তত্ত্বের উদ্ভব করা যায়। ব্যক্তির জীবন অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হলে প্রাকৃতিক পটভূমি সৃষ্টি করে। মঞ্চে নাটকের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শক্তির উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন পথ দেখা যায়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নাটক এমন একটি সমাজের সৃষ্টি করে, সেই সমাজ যৌথ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থানে পৌঁছায়।

ভাষা ও সংগীতের সঙ্গে নৃত্য, নাটক ও চলচ্চিত্রে পার্থক্য হল মিশ্র। সংগীতের ধ্বনিগুলি যেমন বাইরের বস্তু তেমনি নৃত্যরত বা অভিনয়রত মানুষের প্রকৃতি বস্তু। সুতরাং অভিনয় ও নৃত্যের একটা সংগীতগত, অপ্রতীকধর্মী উপাদান থাকে অভিনয় ও লেখকের মধ্যে। চলচ্চিত্রের ভাল প্রয়োজনের হাত ক্যামেরার যান্ত্রিক নমনীয়তা ভূমি কাল্পনিকে এমনি করে তোলা বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে চলচ্চিত্রের এই বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি কাজে লাগানো যায় না। নর্তক বা অভিনেতা সামগ্রিক হিসাবে কাব্যের জগতের মতো স্থির, তা গতিশীল অবস্থায় থাকে। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে কাব্যময় মুহূর্ত এবং আখ্যানমূলক গতির মধ্যেকার চাপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য।

মহাকাব্য ও নাটকের কিছু অংশ যা কোনো স্থান মুহূর্ত অনেকটাই সংগীতের মতো। শিল্প কখনও কখনও দ্বিত্বভাবে, প্রকাশ করে। যে বিষয়গুলি বর্ণিত হচ্ছে, তা নিজের একটা আবেগও থাকে। এই কারণে কাব্যধর্মী অভিনয় এত শক্ত। কাব্য এবং অভিনয় কবির অহং এবং 'অহং' পরস্পরকে অস্পষ্ট করে তোলে।

নৃত্য ও নাটকের মধ্যে প্রকৃতিও প্রতিফলিত বিষয়ের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্নপ্রস্তর যুগে শিল্প ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মসচেতন এবং তখন তা বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানের মধ্যে। ফলে যথাযথ বিচিত্র প্রকৃতি পদের উদ্ভব ঘটে। এবং প্রস্তর যুগের শিল্পে মৃগয়াজীবী বা ফল আরোহণকারী মাধুর্য থেকে যখন সে শস্য উৎপাদনকারী, পশুপালনকারী উপজাতি হয়ে উঠে। বিষয়কে সমাজ একটু সন্ধান করে না, তাকে পরিবর্তন করে। এইভাবে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে উপজাতি টেনে নেয় আপন বুকের মধ্যে। শিল্প সমাজে নৃত্য পরিণত হয় কাহিনিতে, পরে নাটকে। কোরাসের জটিলতা ত্যাগ করে মঞ্চে উঠে আসে। শুরু হয় অভিনয় ও অ্যাকশন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অবক্ষয় অনমনীয়তা অবশ্য যেন কোনও মুহূর্তে চরিত্রগুলি হয়ে উঠে। চিত্রকলার মতো নাটকও আরও বেশি করে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে থাকে। শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে শ্রেণী সমাজেও তার স্বাতন্ত্র্যের ফলে চারণ কবির উদ্ভব ঘটে। চারণ কবি নিয়ে এলেন মহাকাব্য, কেউ নিয়ে এলেন গীতিধর্মী, প্রেমধর্মী, পত্রধর্মী, ব্যক্তিগত কাব্য। কাব্যগত মুহূর্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের সঙ্গে আলোক পতিত করে, তার মধ্যে যৌথ অহং ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র হয়ে উঠে, বুর্জোয়া কাব্যের সুর করে গাওয়া গীতিকাব্য। পাঠকও কাব্যের সামাজিক অহং থেকে পলায়নে বা সুররিয়ালিজমে দেখা দেয়।

সোনার জগতের কাছে সংগীতের ভূমিকা যে ধরনের দেখা জগতের কাছে স্থাপত্য কলা ফলিত শিল্পের (বয়ন, আসবাব, যন্ত্র, বস্ত্র ইত্যাদি) ভূমিকাও সেই ধরনের। সংগীতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক উপাদান যেমন একটি

রূপগত আদর্শ গঠন এবং তার ছন্দ তর্কসম্মত শাস্ত্রে ক্রিয়া থাকবে, এক্ষেত্রে তা হয় না, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আবির্ভাবের ফলে দেখা দিল শাসকশ্রেণীর পদমর্যাদা ও পবিত্রতা প্রকাশের জন্য আবরণধর্মিতা ও আবেগোদ্দীপক সংগঠিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের ক্ষমতাকে পরিচালিত করে। শিল্পগুলির শাসকশ্রেণীর লক্ষ্য বিপুল বিষাদকরণ ও নান্দনিক উপদেশ দেখা যায়, এই ক্ষেত্রেও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সৃষ্টিগুলিতে সাধারণভাবে সেটাই দেখা যায়। বিভিন্ন শিল্পের সংগঠককে বিভিন্ন ছকে ফেলে দেখলে দেখা যাবে—

শিল্প	**বহির্বাস্তব**
১। ধ্বনিমূলক :	সাংগীতিক গঠনের ছন্দযুক্তিভিত্তিক নিয়মাবলী
সংগীত কাব্য	পর্যায় বাক্যগঠন রীতি গদ্য ও ব্যাকরণ গদ্যের নিয়মাবলী
গল্প	বর্ণিত প্রকৃত বাহ্যিক জগৎ
২। দৃশ্যমূলক :	
চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নৃত্য-নাটক ও চলচ্চিত্র	গঠনগত প্রস্থাপনের প্রক্ষেপগত নিয়মাবলী প্রকৃত মানুষের দ্বারা অনুকৃত প্রকৃত অ্যাকশান
স্থাপত্য, মৃৎশিল্প বা সেরামিক্স, বয়ন শিল্প, আসবাব ইত্যাদি	ব্যবহারোপযোগিতা

৪১১.৪.১৫.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. 'ইল্যুশন অ্যান্ড রিয়ালিটি'— র. না. বি. অনূদিত (পপুলার লাইব্রেরি)
২. সাহিত্য বিবেক—বিমল মুখোপাধ্যায় (দেজ পাবলিশিং)
৩. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (দেজ পাবলিশিং)
৪. নন্দনতত্ত্ব ও মার্কসবাদ—জ্যোতি ভট্টাচার্য (অগ্রণী বুক ক্লাব)

৪১১.৪.১৫.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. কবিতার জন্ম ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর 'ইল্যুশন অ্যান্ড রিয়ালিটি' গ্রন্থে যা বলেছেন বুঝিয়ে দাও।
২. কডওয়েলের মতে কবিতা কি? কবিতা কীভাবে মানব জীবনের উপর প্রভাব ফেলে আলোচনা করো।
৩. আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে কডওয়েল কী বলেছেন উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
৪. 'শিল্পকলা সংগঠন' আসলে কী? কডওয়েল তাঁর 'ইল্যুশন অ্যান্ড রিয়ালিটি' গ্রন্থে কীভাবে শিল্পকলা সংগঠনের ব্যাখ্যা করেছেন আলোচনা করো।

পত্র : বি-কোর – ৪১১
শিরোনাম : নন্দনতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক ১৬
ক্রোচে : এস্থেটিক্‌স্‌

বিন্যাসক্রম

৪১১.৪.১৬.১ নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের প্রক্রিয়া ও শ্রেণীবিভাগ

৪১১.৪.১৬.২ ক্রোচের প্রকাশবাদ ও শিল্প

৪১১.৪.১৬.৩ ক্রোচের প্রকাশবাদের সীমাবদ্ধতা

৪১১.৪.১৬.৪ নান্দনিক ভাবনায় ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা

৪১১.৪.১৬.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪১১.৪.১৬.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৪১১.৪.১৬.১ নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের প্রক্রিয়া ও শ্রেণীবিভাগ

ইংরেজী 'Art' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দই হল 'শিল্প'। ল্যাটিন শব্দ 'Ars' থেকে গ্রিক ভাষায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ইংরেজীতে 'Art' শব্দটি এসেছে। সেই আদিমকালেই 'শিল্প' সৃষ্টি হয়েছে মানুষের অজান্তে। কারণ মানুষ একদিন তার বুদ্ধির জোরে পশুর সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য সূচিত করেছে। ক্রমে ক্রমে তারা সভ্য হয়েছে। যেদিন থেকে মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে, সেদিন থেকেই 'শিল্প' বিষয়টি রূপ লাভ করেছে। কারণ সভ্য হবার আগে মানুষ একমাত্র জীবিকার মধ্যেই নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিল। যেদিন থেকে জীবনধারণের সমস্যা দূর হল সেদিন থেকেই মানুষ জীবন ও জগতের সৌন্দর্য বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠল। চিত্ত বিনোদনের জন্য নাচ গান করা শুরু করল, বাস করবার জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করতে লাগল। এইভাবে জীবন ও জগতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রকাশ করতে গিয়েই সৃষ্টি হল—'শিল্পে'র।

সেই প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষ যেমন শিল্প সৃষ্টি করেছে তেমনি তার 'জিজ্ঞাসা'ও করছে। প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মনেই সর্বপ্রথম শিল্প জিজ্ঞাসার প্রশ্ন দেখা যায়। অ্যারিস্টটল শিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন 'Art is imitation' অর্থাৎ শিল্পের সামান্য ধর্ম হল 'অনুকরণ'। অনুকরণের সামগ্রী হল men in action (জীবনের রূপ বৈচিত্র্য)। রাঙানো এই অনুকরণের মধ্যে থাকে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার সজ্ঞানপ্রক্রিয়া। তাই শিল্পীর শিল্পকর্ম বাস্তব এবং কল্পনার রঙে রাঙানো। প্লেটোর মতে অনুকরণ হল ব্যক্তি বিশেষেরই উপস্থাপনা। অ্যারিস্টটল যাকে বলেছেন 'মাইসেমিস', কান্ট যেখানে বলেছেন 'জিনিয়াস' বা 'জাজমেন্ট'। জাজমেন্ট একধরনের চিন্তা। এই চিন্তার কাজ বস্তুকে অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্যক্তিস্বরূপকে দেখা। ক্রোচে

মাইসেসিসবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'কলা' প্রকৃতির অনুকরণ। প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ শিল্পের বিচারে কল্পনাকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন—শিল্প হল জড়ধর্মের অতিরিক্ত ধর্ম অর্থাৎ আত্মিক ধর্ম।

শিল্পের ক্ষেত্র এত ব্যাপক ও গভীর যে, একটি সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে শিল্পের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। তবুও সাধারণভাবে শিল্প বলতে বোঝায় যার বিকাশ অথবা প্রকাশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই শুধু চালিত নয়, বরং একটি সুকুমারবোধ ও কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিল্পের স্বরূপ সম্পর্কে হার্বার্ট রিড তাঁর 'The Meaning of Art' গ্রন্থে বলেছেন—

> "Art is most simple and most usually defined as an attempt to create pleasing forms". (Page-16)

রিডের দেওয়া এই সংজ্ঞা থেকে শিল্পের তিনটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল—শিল্পস্রষ্টা, শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরসিক। যার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে আনন্দ। এই আনন্দই হল শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রেরণা। শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন রসিকসুজনকে এই আনন্দটুকু দেবার জন্য। আনন্দই শিল্পের অত্যাবশ্যক ধর্ম। এলিয়টের ভাষায় "Superior amusement". যাই হোক, একটি শিল্পের সঙ্গে অন্য শিল্প পার্থক্য হয় তিনটি কারণে—

(ক) মাধ্যম (medium)

(খ) বিষয়বস্তু (objects)

(গ) অনুকরণরীতি/ভঙ্গি বা রীতি (mode of imitation)

যেমন কাব্যসাহিত্যের প্রভাবের মাধ্যমে ভাষা, চিত্রশিল্পের মাধ্যম বর্ণ বা রেখা আবার সঙ্গীতের মাধ্যম সুর বা স্বর। অর্থাৎ ভিন্ন মাধ্যমে শিল্পগুলি পৃথক হয়ে যায়। আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকে বলা যায় শিল্প যদি জীবনের বিরাট দিক উপস্থাপিত করে তবে হয় মহাকাব্য আবার মুহূর্তের বিষয়কে প্রকাশ করলে হয় গীতিকাব্য। এখানে মাধ্যম একটাই—ভাষা। তবুও বিষয়বস্তুর পৃথকের জন্যে শিল্পগুলি পৃথক হয়ে যাচ্ছে। আরও বলা যায়, বিজ্ঞানের ভাষা থাকে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন আর কবি কল্পনার মাধ্যমে জীবনের রূপ প্রকাশ করেন। আবার ইতিহাসে শুধু বিশেষ ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয় কিন্তু কবিরা বিশেষের মধ্যে থেকে সামান্যকে (universal) ব্যক্ত করেন। আবার বিষয় ও মাধ্যম এক হলেও ভঙ্গী পৃথক হলে শিল্প আলাদা হয়ে যায়। যেমন নিজের বিবৃতির দ্বারা বললে সেই শিল্প হয় বিবৃতিমূলক (Narrative)। যার দ্বারা উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা রচনা হয়। চরিত্রে সংলাপের দ্বারা কথাগুলি উপস্থাপিত করলে হয় নাটকীয় ভঙ্গী (Dramatic)। এর দ্বারা শিল্প পৃথক হয়ে যায়। এই ভাবে তিনটি কারণের জন্য শিল্প পৃথক হয়ে যায়।

শিল্প উপাদান ও আবেদনগত পার্থক্যের দিক থেকে কান্ট শিল্পের শ্রেণীবিভাগ করেছেন—

- শিল্প
  - বাকশিল্প
    - কবিতা
    - বাগ্মিতা
  - রূপশিল্প
    - মূর্তিশিল্প
      - ভাস্কর্য
      - স্থাপত্য
    - চিত্র
  - বাহ্যেন্দ্রিয় বেদ্য শিল্প
    - সঙ্গীত
    - বর্ণশিল্প

হেগেল:—

- শিল্প
  - সিম্বলিক
    - স্থাপত্য
  - ক্লাসিকাল
    - ভাস্কর্য
    - চিত্র
  - রোমান্টিক
    - গান
    - কবিতা

কান্ট ও হেগেল কর্তৃক শিল্পের শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা একটি নতুন শ্রেণীবিভাগ করতে পারি—

- শিল্প (Art)
  - ভাস্কর্য (Sculpture)
  - স্থাপত্য (Architecture)
  - চিত্র (Painting)
  - সঙ্গীত (Music)
  - নৃত্য (Dance)
  - সাহিত্য (Literature)

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের আবেদন মানুষের চোখের ও স্পর্শের কাছে। চিত্র শিল্প বর্ণ ও রেখার সাহায্যে বিবিধ বস্তু ও মানুষের রূপ অনুকরণ করে। সংগীত সামান্য লক্ষ্যে সুরকে মাধ্যম করে অনুকরণ বিশেষ। নৃত্য দৈহিক ছন্দে চরিত্র ভাবাবেগ ও ঘটনাকে অনুকরণ করে থাকে। সাহিত্য হচ্ছে ভাষা শিল্প, কারণ ভাষার মাধ্যমে জীবনের রূপকল্পনা করা হয়। কান্ট ও হেগেলের মতে কাব্যই শ্রেষ্ঠ শিল্প। কারণ সাহিত্য সৃষ্টি বা রসগ্রহণে সকলেরই অবাধ প্রবেশ। সাহিত্য অন্য শিল্পকলার ধর্মকে সহজেই আত্মসাৎ করতে পারে। চিত্র সাহিত্যের ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতিদান করে। অর্থাৎ সাহিত্য হল চিত্র, দেহ সঙ্গীত প্রাণ। হ্যাজলিট শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন চিত্রকে। রোজারফ্রাই চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে কাব্যে সাহিত্যের উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। কিন্তু শোপেনহাওয়ার, ওয়ালটার পেটার প্রাধান্য দিয়েছেন সঙ্গীতকে। কারণ সঙ্গীত ব্রহ্মবিদ্যা। তা অন্য শিল্পের ধর্মকে আত্মসাৎ করে এবং মানুষের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথ যে-কোনও শিল্পকে অন্যশিল্পর আতিথ্যদানে অকুণ্ঠিত। কারণ সব শিল্পই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই একাধিক শিল্পগুণ একত্রিত হয়ে শিল্পের স্বাদ বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে শিল্পের শ্রেণীবিভাগ হলেও শ্রেণীদ্বন্দ্ব স্বীকার্য নয়। লোর‍্যাঁর আঁকা ছবি থেকে প্রেরণা পেয়ে জন কিটস লেখেন "Ode on a Grecian

urn"। সকল শিল্পীই অন্য শিল্প থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজের শিল্পকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে পারেন। পরিশেষে তাই বলা যায় শিল্পীর যেমন জাত নেই, শিল্পেরও শ্রেণীদ্বন্দ্ব নেই।

৪১১.৪.১৬.২ ক্রোচের প্রকাশবাদ ও শিল্প

ইতালীয় নন্দনতত্ত্ববিদ বেনিদেত্তো ক্রোচে একাধারে দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। দার্শনিক বলে তাঁর আলোচনায় গভীরতা ও বিধিবদ্ধ তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন লক্ষ করা যায়। ইতিহাসবেত্তা ছিলেন বলে তাঁর আলোচনা মানব-ইতিহাসের বিবর্তনের পর্যবেক্ষণ জনিত গভীর জীবনবীক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচকদের মতো জীবনের শুধু আর্থসামাজিক পটভূমিকার প্রতিক্রিয়ারূপে সাহিত্যকে দেখেননি; কিন্তু ইতিহাসের ধারা পর্যবেক্ষণ থেকে তত্ত্বানুসন্ধানীর জীবনদৃষ্টিতে যে গভীরতা আসে ক্রোচের আলোচনায় সেই গভীরতা দেখা যায়। আর সর্বোপরি তিনি সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি দর্শন বা ইতিহাস রূপে দেখেননি।

তিনি সৌন্দর্যের যে পূর্ণরূপ তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা ঈশ্বরের পূর্ণ-সৌন্দর্যেরই সমতুল্য। তবু তিনি নাস্তিক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর নাস্তিকতা চার্চের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যে সৌন্দর্য রয়েছে তাকে ঈশ্বরের নামটি বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় "a christian outside the church."

ক্রোচের নন্দনতত্ত্বকে এক কথায় বোধি-প্রকাশবাদ বলা যায়। ক্রোচের মতে শিল্পসৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তির কাজ নয়। শিল্প সৃষ্টি হল সহজ জ্ঞান বা বোধি বা স্বজ্ঞার প্রকাশ। এখানে বলা প্রয়োজন ক্রোচে জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—বোধিলব্ধ জ্ঞান (intuition knowledge) ও নৈয়ায়িক জ্ঞান (logical knowledge)। এই দ্বিবিধ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম বা পদ্ধতিও আলাদা। বোধিলব্ধ জ্ঞান কল্পনার সাহায্যে অর্জিত হয়, আর নৈয়ায়িক জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা অর্জিত হয়। বোধিলব্ধ জ্ঞান ব্যক্তিসত্তা বিষয়ক, আর নৈয়ায়িক জ্ঞান বিশ্বসত্তা বিষয়ক। বোধিতে জ্ঞান হল এক একটা জিনিসের সঙ্গে অন্য জিনিসের সম্পর্ক বিষয়ে। যেমন বোধিলব্ধ জ্ঞান হবে রাম, শ্যাম প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে। নৈয়ায়িক জ্ঞান হবে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে যে সম্পর্কের সূত্রে এরা অন্বিত বা মানবতা সম্পর্কে। শিল্প হল (intuition) বা বোধি অর্থাৎ শিল্পে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তার কল্পনার মাধ্যমে লাভ করি। এবং যে জ্ঞান লাভ করি তা ব্যক্তিসত্তা বিষয়ে জ্ঞান। অন্যদিকে দর্শনশাস্ত্রে বা বিজ্ঞানে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা হল নৈয়ায়িক বা যুক্তিলব্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান আসে (intellect) বা বুদ্ধির মাধ্যমে। আর এতে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা সর্বজনীন সত্তা সম্পর্কে। যেমন মানবতা সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান। শিল্পের সৃষ্টি হল ব্যক্তিরূপ সৃষ্টি। সাহিত্যের ও শিল্পের গভীরে অবশ্য বিশ্বসত্যের যে স্পর্শ পাই তার কারণ সমস্ত মহৎ সাহিত্যেই গভীর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ থাকে। বস্তুত ব্যক্তিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ব সত্যের প্রকাশই মহৎ সাহিত্যের পরিচয়, এই বিশ্বসত্যের ব্যাখ্যা ও উদ্‌ঘাটনের কথা ক্রোচে বলেননি।

ক্রোচের মতে intuition বা বোধি যেমন প্রথমে মানবমনের অন্তর্লোকে আপন থেকেই ভেসে উঠে, তেমনি তার প্রকাশরূপও প্রথমে আমাদের মনোলোকেই ফুটে উঠে। অর্থাৎ কাব্য বা চিত্র বা ভাস্কর্য মূর্তিটি প্রথমে আমাদের মনের মধ্যেই রূপ নিয়ে গড়ে উঠে। ক্রোচের মতে সেইটাই শিল্পের আসল প্রকাশ। আর ভাষার সাহায্যে বা বর্ণরেখার সাহায্যে বা প্রস্তর মূর্তির সাহায্যে আমরা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পরূপ গড়ে তুলি সেটা বাহ্য ব্যাপার। কিন্তু ক্রোচে এই বাহ্য প্রকাশকেও বোধির অপরিহার্য অঙ্গ বলেই স্বীকার করেছেন। বোধির বাহ্য প্রকাশ

ছাড়া শিল্পও সম্ভব নয়।

ক্রোচের মতে শিল্প বা কাব্যে আবেগের উত্তেজনা প্রকাশের সুযোগ নেই। প্রতিটি শিল্প সৃষ্টি হল অতুলনীয় কারণ শিল্পের যেটা মূল সেই বোধিই হল অতুলনীয়। জীবনের কোনও অনুভূতি বা আবেগ একবার সংঘটিত হবার পর তাকে পুনর্বার জাগানো যায় না। শিল্প কিন্তু বাস্তবে না হলেও ভাবলোকে সেটাকে পুনর্জাগরিত করে এবং ভাবলোকে এই যে পুনর্জাগরণ ঘটায় এটা স্থান-কালের সীমা ত্যাগ করে শাশ্বতের ও লোকোত্তর জগতের বস্তু হয়ে যায়। ক্রোচের মতে বোধি স্থান-কালের উপরে নির্ভরশীল নয়। এটা একটি স্বয়ং নির্ভর আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। কারণ ক্রোচের মতে শুধু আত্মাই বোধি সৃষ্টি করে বা ধারণ করে "the spirit only intuites in making, forming, expressing."

ক্রোচের মতে বাধিলব্ধ জ্ঞান চিত্রকল্প সৃষ্টি করে আর নৈয়ায়িক বা যুক্তিলব্ধ জ্ঞান ধারণা সৃষ্টি করে। ধারণা হল সাধারণ ধারণা। কোনও বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সংস্পর্শে এলে আমাদের প্রথমে ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগে। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছালে আমাদের মস্তিষ্ক সেগুলির ব্যাখ্যা দেয়। ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের কাছে সেই বস্তুটির জ্ঞান দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ব্যাখ্যা মিলিত হয়ে ওই বিশেষ বস্তুটির যে জ্ঞান দেয় তা হল প্রতীতি। এরকম একই জাতীয় একাধিক বস্তুর প্রতীতির মধ্যে তুলনা করে শ্রেণীগতভাবে ওই জাতীয় বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে তা হল Concept। তা গড়ে তোলার জন্যে এরকম বুদ্ধির ক্রিয়া দরকার। কিন্তু চিত্রকল্প গড়ে তোলার জন্য এরকম বুদ্ধির ক্রিয়া দরকার হয় না। এই কারণে ক্রোচে বলেছেন শিল্পসৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির ভূমিকা নেই। শিল্পসৃষ্টি হল বোধি। বোধির সম্পর্কে ক্রোচে বলেছেন—আমাদের সাধারণ জীবনে আমরা নিত্য বোধির দ্বারা অর্থাৎ সহজ সজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হই। "In ordinary life, constant appeal is made to intuitive knowledge."

ক্রোচে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে মানুষ দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সহজ জ্ঞানের অধিকারী নয়, শুধু অবাস্তব যুক্তিতর্ক করে যায়—রাজনৈতিক নেতারা ঠিকই বলেন—সেই মানুষের দেশের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই। অর্থাৎ সার্থক সফল রাজনৈতিক নেতারাও বাস্তববোধ দিয়ে সহজ জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত হন, শুধু তার্কিক তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত হলে কেউ সফল রাজনৈতিক নেতা হতে পারেন না। ব্যবহারিক জীবনে বোধিলব্ধ জ্ঞান বা সজ্ঞার ভূমিকা খুব বেশি। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে বোধিলব্ধ জ্ঞান বা সজ্ঞার স্বীকৃতি নেই। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার জন্যে একটি সমৃদ্ধ শাস্ত্রই প্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে—তা হল ন্যায়শাস্ত্র বা Logic। কিন্তু বোধিলব্ধ জ্ঞান সেভাবে গুরুত্ব পায়নি, এবং সে বিষয়ে কোনও শাস্ত্র গড়ে ওঠেনি বলে ক্রোচে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বোধিলব্ধ জ্ঞান নিজে নিজেই ঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনেও বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ বোধিলব্ধ জ্ঞানই অব্যর্থ সত্যদ্রষ্টা। যুক্তিবুদ্ধির তার্কিক কচকচিতে হারিয়ে যায় সত্যবস্তু। সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন যুক্তির তার্কিক পথে হতে পারে না।

আবার আর একটি দিক ভেবে দেখবার আছে। যুক্তিসিদ্ধ ধারণার মধ্যেও অনেক সময় বোধিলব্ধ সহজ জ্ঞান মিশে থাকে। এমন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় যে, তখন সেটা যুক্তিসিদ্ধ ধারণাই থাকে না, তখন সহজ জ্ঞান বা বোধির উপাদান হয়ে যায়—ক্রোচের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আমরা সাহিত্য থেকে অনেক উদাহরণ দিতে পারি। যেমন শঙ্করাচার্যের উক্তি—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এতে জগতের নশ্বরতা সম্পর্কে যে ধারণা হয় তা দার্শনিকের নিত্যানিত্য বস্তুবিচার থেকে জাত যুক্তিসিদ্ধ ধারণা। ক্রোচের মতে একটি মুখের ছবিতে যে লাল রং থাকে সেটাকে বলে পদার্থ বিজ্ঞানীর লাল রং, সেটাকে ছবিটার একটি বিশিষ্ট উপাদান রূপে আমরা

দেখি। এখানে ছবিটা বোধি আর লাল রং তার উপাদান। ওই লাল রংটা পদার্থবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে একটা ধারণা (Concept), কিন্তু শিল্পীর কাছে সেটা একটা শিল্পের উপাদান, শিল্পের উত্থাপিত একটা মুখচ্ছবির বৈশিষ্ট্য তাতে দ্যোতিত হচ্ছে, সেটা একটা বোধির অংশ উপাদান। সমগ্র শিল্পটা তার উপাদানের গুণকে নিয়ন্ত্রিত করে "The whole is that which determines the auality of the parts." এজন্য শিল্পকর্মকে অনেক দার্শনিক ধারণা থাকতে পারে। সেসব দার্শনিক ধারণায় অনেক গভীরতাও থাকতে পারে। আবার শৈল্পিক বর্ণনা উপচে পড়তে পারে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় দার্শনিক তত্ত্ব আছে। যেমন—‘‘সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর’’, কিংবা ‘‘নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই’’ ইত্যাদি। কিন্তু সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথের সেইসব রচনা দার্শনিক গ্রন্থ হয়ে ওঠেনি। আবার ক্রোচে বলেছেন শোপানহাওয়ার তাঁর দার্শনিক গ্রন্থে অনেক গল্পকাহিনী উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেইসব গল্প ও কাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচনাটি সাহিত্যিক গল্প হয়ে ওঠেনি। কারণ লেখকের উদ্দেশ্য সেখানে গল্পের রস সৃষ্টি করা নয় তত্ত্বকথা বোঝান। শিল্পীর মূল লক্ষ্যই হল শিল্প বিচারের প্রথম ও চূড়ান্ত মানদণ্ড। আর আবেদন সৃষ্টির সার্থকতাই হল শিল্পের সর্বার্থসিদ্ধি।

প্রকাশ কামনা রয়েছে মানুষের সমস্ত জীবনের কর্মের মধ্যে। প্রকাশই হল আনন্দ। জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে বিজ্ঞানে দর্শনের মধ্যে। কিন্তু ভাবের প্রকাশ ঘটে সাহিত্যের মধ্যে। ক্রোচে তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন ধ্যানলোকে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, এবং তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে, তখনই শিল্পের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ ছাড়া শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

ক্রোচে বলেন শিল্প হচ্ছে অভিজ্ঞতা বা মানব চৈতন্যের জ্ঞানার্জনী বৃত্তির প্রকাশ। এই অভিজ্ঞতার দুটি রূপ—১. জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা ও ২. কর্মমূলক অভিজ্ঞতা। প্রথমটি Intuition, দ্বিতীয়টি Conception thought. তিনি জ্ঞানকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করেন—১. নৈয়ায়িক জ্ঞান ও ২. প্রতিভাসিক জ্ঞান। এই Intuition শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রোচে প্রথমেই তাকে সংবেদন, উপলব্ধি, অনুষঙ্গ থেকে পৃথক করে নিয়েছেন। তিনি বললেন স্বজ্ঞা হল বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ প্রকাশধর্মী জ্ঞানের অবস্থা। প্রকাশ ছাড়া কোনও অস্তিত্ব নেই। আমাদের মানসলোকে অখণ্ড মূর্তিতে যে ইমেজ বা স্বজ্ঞার আবির্ভাব তারই প্রকাশ শিল্প সাহিত্যে। সুতরাং স্বজ্ঞার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় প্রকাশে। অর্থাৎ ক্রোচের কাছে স্বজ্ঞা ও প্রকাশ অভিন্ন। মোট কথা Intuition ও Expression-কে তিনি সমীকৃত করলেন।

ক্রোচে স্বজ্ঞাকে দেখেছেন বাস্তবের উপলব্ধি ও অন্তরের একটি বিশেষ ব্যক্তিরূপে। ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের মূল কথাই হল প্রকাশ। শিল্পে বা কাব্যে আবেগের উত্তেজনা প্রকাশকে পছন্দ করেননি। তাঁর মতে আবেগের সঙ্গে ধ্যানের মিলন হলেই মহৎ কাব্যের জন্ম হয়। তিনি কল্পনা ও প্রকাশকে সমার্থক বলেছেন।

ক্রোচে ‘প্রকাশ’কে অবাচনিক অর্থেও দেখতে চেয়েছেন। রেখা, বর্ণ, শব্দ দ্বার প্রকাশ, মানুষ বক্তারূপে চিত্রকররূপে যেভাবেই ব্যক্ত করুক সব কিছুই প্রকাশ। আর এই প্রকাশই প্রতিভাসের অপরিহার্য অংশ। প্রথমে আমাদের মনে চিত্রের সুস্পষ্ট রূপ মনে পাচ্ছি এবং তা দেখে তাকে বাইরের চিত্ররূপে প্রকাশ করছি। মানুষের আবেগ আত্মার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকিত প্রদেশে আসে।

ক্রোচে বলেন স্বজ্ঞা বা প্রকাশ হল বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ অবস্থা। আর শিল্প হল ইমেজের

প্রকাশ। আর প্রকাশক্রিয়া কখনওই ব্যক্তিগত উপলব্ধি অনুভূতির থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে না। আমাদের জ্ঞানলোক যদি ধ্যানলোক বা অন্তরে সীমাবদ্ধ থাকে তবে সেটাই প্রকাশ। অর্থাৎ অন্তরের প্রকারই প্রকাশ। যদি সেটি মনলোকেও অবস্থান করে সেটাই প্রকাশ। মনলোকে অবস্থান করলেও সেটাই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এর বাচনিক বা সাংকেতিক প্রকাশ না হলেও চলবে। একজন শিল্পী মানুষের চৈতন্যের উৎসই হচ্ছে মূলকথা। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে মানসিক যে ভিত্তিভূমি আছে সেখান থেকে শিল্পের জন্ম হয়।

একজন শিল্পী হবেন মহাজাগতিক বাস্তবের চিত্রকর। কারণ শিল্পের মধ্য দিয়ে 'মহাজাগতিক বাস্তবে'র প্রকাশ ঘটে। তাঁর মতে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার কোন বাহ্যিক রূপ নেই। বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার প্রকাশ মানুষের অন্তরে। এর থেকে ক্রোচের প্রকাশবাদের পরিবর্তিত রূপটি ধরতে পারি। কিন্তু এর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হল। তাঁদের অভিযোগ হল সরাসরি না হলেও শিল্পীর কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে যায়। আর সেটি না স্বীকার করলে তবে হৃদয়ানুভূতির বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটলে পাঠক বা দর্শক কিভাবে তা আস্বাদন করবে। আর এখানেই ক্রোচের সীমাবদ্ধতা। তাঁর Theory of Expression এখানে স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি বলতে চাইলেন যিনি কবিতা বোঝেন তিনি নিজের হৃদয়ে লেখকের হৃদস্পন্দন অনুভব করবেন। পাহাড়ের মৌনতা, সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে ক্রোচের ধ্যানধারণা অনেকটাই মিলে যায়।

শিল্পী হিসেবে টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পের বারবার পরিবর্তন বা পরিমার্জন করেছেন। কিন্তু শিল্পতত্ত্ববিদ হিসাবে ক্রোচে প্রকাশের বাহ্যরূপের মর্যাদা বোঝেননি, এখানেই ক্রোচের ব্যর্থতা। তিনি ভাববাদী দার্শনিকদের মতো বলেছেন—একদৃষ্টি সম্ভূত অখণ্ড উৎসকেই বলেছেন প্রকাশ। ইন্দ্রিয় দিয়ে যার অস্তিত্ব বুঝতে পারছি না তার মূল্য কোথায়? এ জন্যে ফরাসি দার্শনিক 'ইউজেন ভেঁরো' বললেন—"আবেগের বাহ্যরূপই শিল্প"।

৪১১.৪.১৬.৩ ক্রোচের প্রকাশবাদের সীমাবদ্ধতা

মানুষের মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। পদ্মপাতায় পড়া একবিন্দু জলকণার মতো সর্বদা টলমল করে। মানুষ যত পথ হাঁটে, অনুভূতি অভিজ্ঞতা তাড়িত মানুষের মতের ততই পরিবর্তন ঘটে। ক্রোচের ক্ষেত্রেও সেটাই লক্ষণীয়। তিনি প্রথমে প্রকাশের কথা বলেছিলেন, কিন্তু বয়সোচিত একটা অস্থিরতা কেটে যেতেই তাঁর মনে হল বাইরে রূপ না নিলেও কোনও কিছুর গভীর ধ্যান বা মননই প্রকাশ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে ক্রোচে পাঠক বা রসিককে কি অস্বীকার করেছেন? না, তা নয়। সমালোচকের অনুভূতি উদ্দীপিত করার মধ্যেই শিল্পের বাহ্যরূপ সীমাবদ্ধ। সমালোচক তখনই দান্তে বা রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে পারবেন যখন নিজেকে সেই স্তরে নিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু এটা একটা দুরূহ ব্যাপার। আসলে এটাই ছিল ক্রোচের কাম্য। আসলে একজন absolute idealist হিসাবে ক্রোচে তাঁর অভিব্যক্তি তত্ত্বকে পরিণতি দিয়েছিলেন এক রহসম্যয় নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যা সঙ্কুলতায়। আর সে কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশবাদ এক পরিবর্তিত চিন্তাধারায় গভীর মৌনতায় পৌঁছেছে।

এই অভিব্যক্তিতত্ত্বের বা প্রকাশতত্ত্বের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

১। বাস্তব জগতের সঙ্গে শিল্প বা শিল্পীর যোগ আছে বলে ক্রোচে মনে করতেন না, কেননা, শিল্পীকে বাহ্যরূপ নির্মাণের কোনও দায়িত্ব নিতে হয় না। তাহলে শিল্পীর দায়বদ্ধতা সকলের সামনে প্রকাশ পাবে কি করে? এর উত্তর ক্রোচে দিতে পারেননি। আবার তিনিই শিল্পীকে বলেছেন—"যথার্থ বাস্তবের রূপকার" কিন্তু এই অসঙ্গতির কারণ কি? আসলে ক্রোচে এখানে প্রাত্যহিক জীবনের

পঙ্কিলতা মুক্ত ‘মহাজাগতিক বাস্তব’-এর কথা বলেছেন। প্লেটোও শিল্পের মহাবাস্তবের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই মহাজাগতিক বাস্তব আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। যার দ্বারা কোনও শিল্প সৃষ্টি হয় না।

ক্রোচে মনে করেন জগতের সমস্ত কাজে ও ভাবনায় শিল্পীর সংযোগ থাকবে। সে যদি পাপীও হন, তা সত্ত্বেও সাধারণ পাপ পুণ্য সম্পর্কে তাঁর একটা বোধ থাকবে। তাই জীবন ও সাহিত্যকে একসঙ্গে মেলাতে ব্যর্থ হতে হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—‘কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।’

২। ক্রোচের শিল্পী অন্তর্নিহিত ভাবরূপ নির্মাণে দক্ষ। তথায় যা বাহ্য রূপ নয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে লেখকের আবেগ অনুভূতি কি করে সর্বজনবোধ্য হয়? তার উত্তরে ক্রোচে বলেন—

> ‘‘যিনি কবিতা বোঝেন তিনি সরাসরি লেখকের হৃদয়ে প্রবেশ করে নিজের অন্তরে লেখকের হৃদস্পন্দন অনুভব করেন।’’

কিন্তু যিনি বাহ্যরূপকে গুরুত্ব দিলেন না বা বিশ্লেষণ করলেন না—কিভাবে পাঠক তার হৃদয়ে কাব্যপাঠের আনন্দ অনুভব করবেন? এখানেই ক্রোচের অভিব্যক্তিবাদের সীমারেখা।

সমালোচক জয়েস কেরি ক্রোচের মতের বিরোধিতা করে বলেছেন—ক্রোচের মতের অনুসরণ করলে দেহ ও আত্মাকে একই বলে মনে হবে। কিন্তু দেহ ও আত্মার ভেদ যদি না থাকত তাহলে ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের কোনও পার্থক্য থাকত না। মানুষ যে আলাদা তার কারণ, দেহকে বাদ দিয়ে আত্মা অর্থাৎ মনের অস্তিত্ব। তাই স্বজ্ঞা ও প্রকাশের মধ্যে একটা পার্থক্য অবশ্যই আছে।

কবি-দার্শনিকদের প্রতি নজর দিলেই স্বজ্ঞা ও প্রকাশে পার্থক্য বোঝা যায় না। যেমন—‘টলস্টয়’ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রকাশকে সুন্দর করতে বারবার নিজের লেখার সংশোধন এবং সংযোজন করেছেন। কিন্তু ক্রোচে তা স্বীকার করেননি। আসলে টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী। আর ক্রোচে ছিলেন শিল্পতত্ত্ববিদ। সেজন্যই ক্রোচের কাছে শিল্পের মূল রহস্যগুলি অবগত রয়ে গিয়েছে।

শিল্প হল বাহ্যরূপের আবেগের প্রকাশ মাধ্যম। যেমন আবেগ গতিকে নৃত্যে পরিণত করে, সুরকে সঙ্গীতে এবং শব্দকে কাব্যে পরিণত করে। অর্থাৎ শিল্পের উপাদান শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, শিল্পের রূপও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

৩। ক্রোচের অভিব্যক্তির আর একটি সীমা সমালোচনা প্রসঙ্গ। যদি শিল্পকর্ম একটি মানসিক ব্যাপার হয় তাহলে সমালোচক কিভাবে এক শিল্পীর সঙ্গে অন্য শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যতা নির্ণয় করবেন? কি করে বাছাই করবেন ভালো শিল্প বা শিল্পী।

৪। শিল্পের সার্থকতার প্রশ্নে, ক্রোচে সুন্দর বলতে বুঝিয়েছেন Perfect-কে, কিন্তু প্রকাশকে কিভাবে perfect করা যায় তার উত্তর ক্রোচে দেননি।

৫। শিল্পের বাহ্য প্রকাশ না ঘটলে একজন শিল্পী মানুষের পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধির কোনও পরিচয় আমরা পাই না। সে যতই জ্ঞানের সাগর হোক না কেন।

৬। শিল্পের বাহ্যরূপ না থাকলে কি করে পাঠক অনুপ্রাণিত হবেন, তার নির্দেশ ক্রোচে দেননি। শিল্পের বাহ্যরূপ নাকি সমালোচকের অনুভূতি উদ্দীপিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর এই সমালোচক যখন ‘দান্তে’ বা ‘রবীন্দ্রনাথ’ পড়বেন তখন তিনি নিজেকে তাঁদের পর্যায়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এটা এক

দুরূহ ব্যাপার। আসলে ক্রোচে তাঁর অভিব্যক্তি তত্ত্বকে পরিণতি দিয়েছেন এক রহস্যময় নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যা সঙ্কুলতায়।

৪১১.৪.১৬.৪ নান্দনিক ভাবনায় ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কয়জন নন্দনতত্ত্ববিদ সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ক্রোচে, এবং ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের জীবৎকাল ও মতাদর্শ বিচার করে বলা যায় এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। তবে নন্দনতত্ত্ব বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়।

১। ত্রোচের নন্দনতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় স্বজ্ঞা বা জ্ঞান ও তার প্রকাশ। স্বজ্ঞাকে তিনি প্রাতিভাসিক জ্ঞান বলেছেন। এ সংবেদন, উপলব্ধি ও অনুষঙ্গ থেকে স্বজ্ঞাকে তিনি পৃথক করেছেন। তিনি বলেছেন স্বজ্ঞা হল বাস্তব ও অবাস্তবের মাঝখান থেকে উঠে আসা প্রকাশধর্মী জ্ঞান। এই স্বজ্ঞা যখন বাহ্যরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তখন শিল্প সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রোচে আবার বলেন—মানসলোকে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার প্রভাবেই সৃষ্টি হয় শিল্প বা কাব্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন—‘প্রকাশই কবিত্ব’, অর্থাৎ তিনি শিল্পের বাহ্য রূপকে স্বীকার করে নিলেন। এখানেই ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের মতের পার্থক্য। ক্রোচে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার উন্মেষে বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ‘বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা’র বাহ্যিক প্রকাশে বিশ্বাসী ছিলেন। ক্রোচে বিষয় ও আঙ্গিককে একই সঙ্গে গ্রহণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

“বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকিলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না।”

২। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ‘টেকনিক’কে স্বীকার করে বলেছেন, সাহিত্যের মহামূল্যবান জিনিস প্রকাশের গুণেই সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্রোচে টেকনিককে গুরুত্ব দেননি।

৩। ক্রোচে বাহ্যপ্রকাশকে স্বীকার না করায় পরোক্ষভাবে তিনি সাহিত্যের রূপভেদকেও অস্বীকার করলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বাহ্যপ্রকাশ ও রূপভেদকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকে স্বীকার করে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শিল্পকে মিলিয়ে দিলেন। ফলে শিল্পের সঙ্গে ক্রেতা, পাঠক, দর্শকদের মেলবন্ধন ঘটল। তিনি বললেন সাহিত্যের কাজ হল মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। যা ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে আমরা পাই না। সত্য ও জ্ঞান দিয়ে কিছু সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু আনন্দ দিয়ে নতুন কিছু সৃজন হয়। আর সৃজন মানেই তার প্রকাশ।

উদ্বৃত্তহীন মানুষ মৃত্যুর সঙ্গেই হারিয়ে যায়। যারা কালজয়ী শিল্পী, স্রষ্টা তাঁরা বেঁচে থাকেন। কারণ তাদের মধ্যে আছে নিজত্ব ও বহুত্ব। বহুত্ব অর্থাৎ শিল্পীর সৃষ্টি তাকে অমরত্ব দান করে। তাই আনন্দই শিল্পের শেষ কথা। আনন্দই শিল্প সৃষ্টি করে। আনন্দ দু প্রকার—

ক. আনন্দ

খ. বিশুদ্ধ আনন্দ

পার্থিব যে আনন্দ তা প্রয়োজনাত্মক। আর পার্থিব ভোগ, বিলাস থেকে মুক্তির আনন্দই বিশুদ্ধ আনন্দ। যা দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যা সকল দেশের সকল মানুষের।

৫। ক্রোচের মতে শিল্প, সত্য, আনন্দ feeling-এর সমার্থক। তিনি আরও বলেন Art : Intuition, Imagination, Expression, Fancy, Beauty সবই সমার্থক। এরপর বলেন যেহেতু Art হল অনুভূতির ফল, তাই তাও হল Non Cognative, কেননা জ্ঞান বা ধারণার দ্বারা বিচার করা যায় না। একথা ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—তথ্যের দ্বারা সত্যের উন্মোচনই হল প্রকাশ। তথ্য বলতে ক্রোচের Cognative-কে বুঝিয়েছেন। আর সত্য বলতে বুঝিয়েছেন Non Cognative-কে। প্রকাশের সঙ্গে তথ্য থাকা দরকার।

সুতরাং বলা যেতে পারে যাতে তথ্য আছে। সত্য আছে সেটা তো জ্ঞান ও ধারণা সংক্রান্ত। তাহলে শিল্প, সাহিত্যকে Non Cognative বলা কেন? রবীন্দ্রনাথ বলেন যাকে আমরা হৃদয় জ্ঞান মনীষা দিয়ে জানি তাই সত্য। তিনি দু রকম সত্যের কথা বলেছেন—1. Truth, 2. Aesthetic Truth. অর্থাৎ নান্দনিক সত্য। এই সত্যই শিল্প বা সাহিত্যের সত্য, যা আমাদের আনন্দ দেয়।

৬। ক্রোচে কখনওই সাহিত্যের রূপরীতিকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে সাহিত্য মানেই মানব মনের বোধের প্রকাশ। তাই কাব্য, নাটক, মহাকাব্য শিল্পের বাহ্যরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের মন বৈচিত্র্যময়। মানুষ পেতে চায় মহাজীবনের স্বাদ তাই তিনি সাহিত্যের রূপরীতিকে স্বীকার করেছেন।

ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনাগত সাদৃশ্যে বলা যায়—

ক. একজন শিল্পীর তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের প্রভাবের অনুসন্ধান ক্রোচে পছন্দ করেননি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে।"

খ. ক্রোচে এবং রবীন্দ্রনাথ মনে করেন শিল্পীরা ঈশ্বরের কারুশালা থেকে রং-রস চুরি করে প্রতিমা গড়েন। সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব হয়েও রসোত্তীর্ণ। ক্রোচের কাছে শিল্প Super World-এর বস্তু।

গ. ক্রোচে সৌন্দর্যকে সত্য বা মিথ্যা বলেননি। তিনি মনের সক্রিয়তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তা স্বীকার করেছেন।

৪১১.৪.১৬.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. ক্রোচের শিল্পতত্ত্ব—সাধনকুমার ভট্টাচার্য অনূদিত (দে'জ পাবলিশিং)

২. নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (দে'জ পাবলিশিং)

৩. সাহিত্য বিবেক—ড. বিমল মুখোপাধ্যায় (দে'জ পাবলিশিং)

৪. আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ—অধ্যাপক রামেশ্বর শ (পুস্তক বিপণি)

৫. কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (পঞ্চম সংখ্যা) : (ক্রোচে ও তার নন্দনতত্ত্ব : অধ্যাপক রামেশ্বর শ)

৬. কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (দ্বিতীয় সংখ্যা) : (সৃষ্টি চৈতন্য বনাম যুগ পরিবেশ: একটি নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যা—অধ্যাপক রামেশ্বর শ)

৪১১.৪.১৬.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের মূল ভাবনার পরিচয় দাও।

২. প্রকাশবাদ কী? ক্রোচের প্রকাশবাদের সীমাবদ্ধতাগুলি আলোচনা করো।

৩. 'আর্ট' বলতে ক্রোচে ঠিক কী বুঝিয়েছেন? নন্দনতত্ত্বের আলোকে বিষয়টি আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪. নান্দনিক ভাবনার দৃষ্টিতে ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করো।